বিভূতিভূষণের
শ্রেষ্ঠ গল্প

বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—সাড়ে চার টাকা—

এই লেখকের—

পথের পাঁচালী
অপরাজিত
অনুবর্ত্তন
অভিযাত্রিক
দৃষ্টি-প্রদীপ
দেবযান
মেঘ-মল্লার
বিপিনের সংসার
যাত্রাবদল
কিন্নর দল
জন্ম ও মৃত্যু
বিধু মাষ্টার
অসাধারণ
আদর্শ হিন্দু হোটেল
নবাগত
উপলখণ্ড
মৌরীফুল
ক্ষণভঙ্গুর
তৃণাঙ্কুর
উর্মিমুখর
উৎকর্ণ
হে অরণ্য কথা কও
বনে পাহাড়ে
কেদার রাজা
অশনি সংকেত
ইছামতী

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রক
পরিচয় প্রেস, ৮বি, দীনবন্ধু লেন কলিকাতা হইতে শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক

বিভূতিভূষণের আবির্ভাব বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে বোধ হয় সব চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ অনেক বড় কিন্তু তাঁর জয়-গৌরবের পূর্ব্বাপর ইতিহাস আছে—সে এমন আকস্মিক নয়। আগে দু-একটি গল্প প্রকাশিত হলেও বিভূতিবাবু ছিলেন পাঠক-সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। একেবারে সবাই চম্‌কে উঠল যখন বিচিত্রাতে তাঁর পথের পাঁচালী ছাপা হ'তে শুরু হ'ল। কোন দলের নয়, কোন গোত্রের নয়—এ সাহিত্যিক কোথা থেকে এল? সকলের মুখেই এই এক প্রশ্ন। এ ভদ্রলোক কে, যিনি চিরাচরিত ধারা লঙ্ঘন করে নিবিড় পল্লীর জঙ্গল ও জলার মধ্যে পাঠকের মনকে এমন জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন? কলকাতা শহরের মধ্যেই এতদিন অধিকাংশ কাহিনী সীমাবদ্ধ ছিল, বড় জোর তা প্রাসাদ ছেড়ে বস্তিতে যেতে শুরু করেছে কিন্তু এ যে তার কোনটাই নয়।…সেই দিনই জনসাধারণ এবং বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা বিভূতিভূষণের ললাটে যে রাজটীকা এঁকে দিল আজও তা ম্লান হয়নি। বিভূতিবাবু সেদিন অনায়াসে বলতে পারতেন 'ভিনি, ভিডি, ভিসি'! এর পর তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলি ঝর্ণাধারার মত একে একে বেরিয়ে আসতে লাগল। 'আরণ্যক' 'দৃষ্টি-প্রদীপ' 'মেঘ-মল্লার' 'অনুবর্ত্তন' 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' 'নবাগত'—আরও কত। আরণ্যক-কে মহাকাব্য বললেও অত্যুক্তি হয় না—যদিচ দৃষ্টি-প্রদীপের মূল্যও কম নয়।… রিপন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে কিছুদিন হরিনাভিতে স্কুল-মাষ্টারী করার পর (প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' এখানেই লেখা) ভাগলপুরের কাছে এক বনের মধ্যে কিছুদিন বাস করেন, কোন জমিদারের ম্যানেজার রূপে। তারপর সেখান থেকে ফিরে কলকাতার এক স্কুলে মাষ্টারী করেন। বর্ত্তমানে যশোর জেলায় নিজের পৈত্রিক ভিটাতে নূতন বাড়ী তৈরী করে বাস করেন। কখনও কখনও ঘাটশিলাতেও থাকেন। যশোর জেলার এই অখ্যাত পল্লীর অপূর্ব্ব শ্যামশোভাই তাঁকে তাঁর সাহিত্যের প্রেরণা জুগিয়েছে, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। বাংলার এই বিশেষ অংশের সরল মানুষগুলিই তাঁর অধিকাংশ কাহিনীর পাত্রপাত্রী। মানুষকে যেমন তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছেন—তেম্‌নি দু চোখ ভ'রে দেখেছেন প্রকৃতিকেও। তাঁর মধ্যে কথাশিল্পী ও কবির এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ই তাঁর অসাধারণ সাফল্যের মূল কারণ।…কিন্তু উপন্যাসই শুধু নয়, তাঁর গল্পগুলিরও একটি অসামান্যতা আছে, তা কোনদিনই গতানুগতিক পথ দিয়ে চলে না। সেইজন্যই বোধ হয় তাঁর ছোট গল্পের বইয়ের চাহিদা এত বেশী। তাঁর এক-একটি গল্প পাঠক সমাজে প্রবাদের মত বিখ্যাত হয়ে আছে। তবু যে সব পাঠকের পক্ষে সব গল্পের বই পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না তাঁদেরই জন্য বাছাই ক'রে নিয়ে এই ক-টি গল্প উপহার দেওয়া গেল। স্থানাভাবে আরও যে ঢের ভাল ভাল গল্প বাদ পড়ল, তার জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রকাশক

সূচী

কিন্নর দল

পাড়াটায় ছ' সাত ঘর ব্রাহ্মণের বাস মোট। সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পরকে ঠকিয়ে পরস্পরের কাছে ধার ধোর করে এরা দিন গুজরান করে। অবিশ্যি কেউ কাউকে খুব ঠকাতে পারে না, কারণ সবাই বেশ হুঁসিয়ার। গরীব বলেই এরা বেশী কুচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, বা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না।

পূর্ব্বেই বলেচি, সকলের অবস্থা খারাপ, এবং খানিকটা তার দরুণ, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারা খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই মুখে, ছোট ছোট ছেলেরা এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং এমন পাকা পাকা কথা বলে যে তাদের আর শিশু বা বালক বলে মনে হয় না। কাব্যে বা উপন্যাসে যে শৈশবকালের কতই প্রশস্তি পাঠ করা যায়, মনে হয় সে সব এদের জন্যে নয়, এরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একেবারে প্রবীণত্বে পা দিয়েছে।

পাড়ায় একঘর গৃহস্থ আছে, তারা এখানে থাকে না, তাদের কোঠাবাড়ীটা চাবি দেওয়া পড়ে আছে আজ দশ বারো বছর। এদের মস্ত বড় সংসার ছিল, এখন প্রায় সবাই মরে হেজে গিয়ে প্রায় পাঁচটি প্রাণীতে দাঁড়িয়েছে। বাড়ীর বড় ছেলে পশ্চিমে চাকুরী করে, মেজ ছেলে কলেজে পড়ে কলকাতায়, ছোট ছেলেটি জন্মবধি কালা ও বোবা—পিসিমার কাছে থেকে অন্ধ-বধির বিদ্যালয়ে পড়ে। বড় ছেলে বিবাহ করেনি, যদিও তার বয়স ত্রিশ বত্রিশ হয়েছে, সে নাকি বিবাহের বিরোধী, শোনা যাচ্ছে যে এমনি ভাবেই জীবন কাটাবে।

পাড়ার মধ্যে এরাই শিক্ষিত ও স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ। সে জন্যে এদের কেউ ভাল চোখে দেখে না, মনে মনে সকলেই এদের হিংসে করে এবং বড়

ছেলে যে বিয়ে করবে না বলছে, সে সংবাদে পাড়ার সবাই পরম সন্তুষ্ট। যখন সবাই ছোট ও গরীব, তখন একঘর লোক কেন এত বাড় বাড়বে? বড়ছেলে বিয়ে করলেই ছেলেমেয়ে হয়ে জাজ্বল্যমান সংসার হবে দু'দিন পরে, সে কেউ সহ্য করতে পারবে না। মেজ ছেলে মোটে কলেজে পড়ছে, এখন সাপ হয় কি ব্যাং হয় তার কিছু ঠিক নেই, তার বিষয়ে দুশ্চিন্তার এখনও কারণ ঘটে নি, তার বয়েসও বেশী নয়।

মজুমদার বাড়ীতে ভাঙ্গা রোয়াকে দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে-গজালি হয়। তাতে রায় গিন্নী, মুখুয্যে গিন্নী, বোস গিন্নী, চক্কত্তি গিন্নী, প্রভৃতি তো থাকেনই, পাড়ার অল্প বয়সী বৌয়েরা ও মেয়েরাও থাকে। সাধারণতঃ যে সব ধরণের চর্চ্চা এ মজলিসে হয়ে থাকে, তা শুনলে নারীজাতি সম্বন্ধে লিখিত নানা সরস প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনার সত্যতার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ যাঁর উপস্থিত না হবে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন খুব বড় ধরণের অপ্‌টিমিষ্ট।

আজ দুপুরে যে বৈঠক বসেছে, তাতে আলোচিত বিষয়গুলি থেকে মোটামুটি প্রতিদিনের আলোচনার ও বিতর্কের প্রকৃতি অনুমান করা যেতে পারে।

বোস গিন্নী বলছিলেন—আর বাপু দিচ্ছি তো রোজই, আমার গাছের কাঁটাল খেয়েই তো মানুষ, আমাদের যখন কাঁটাল পাড়ানো হয়, ছেলেমেয়েগুলো হ্যাংলার মত তলায় দাঁড়িয়ে থাকে—ঘেয়ো কি ভূয়ো এক আধখানা যদি থাকে, তো বলি যা নিয়ে যা। তোদের নেই, যা খেগে যা। তাকি পোড়ার মুখে কোনদিন সুবাক্যি আছে? ওমা, আজ আমার মেয়ে দুটো নেবু তুলতে গিয়েছে ডোবার ধারের গাছে, তো বলে কিনা রোজ রোজ লেবু তুলতে আসে, যেন সরকারী গাছ পড়ে রয়েছে আর কি—চব্বিশ ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিলে মণ্টুর মা। আচ্ছা বলোতো তোমরাই—

মণ্টুর মা—যাঁকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হচ্ছিল, তিনি এদের মজলিসে কেবল আজই অনুপস্থিত আছেন নইলে রোজই এসে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে সবাই তাঁর চালচলন, ধরণ-ধারণ, রীতি-নীতির নানারূপ সমালোচনা করলে।

প্রিয় মুখুজ্যের মেয়ে শান্তি—ষোল সতেরো বছরের কুমারী—তার মায়ের বয়সী মণ্টুর মার সম্বন্ধে অমনি বলে বসলো—ওঃ, সে কথা আর বোলোনা খুড়ীমা, কি ব্যাপক মেয়ে মানুষ ঐ মণ্টুর মা! ঢের ঢের মেয়ে মানুষ দেখেছি,

অমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ক্ষুরে নমস্কার, বাবা বাবা!

ছোট মেয়ের ঐ জ্যাঠামি কথার জন্যে তাকে কেউ বকলে না বা শাসন করলে না বরং কথাটা সকলেই উপভোগ করলে।

তারপর কথাটার স্রোত আরও কতদূর গড়াতো বলা যায় না এমন সময় রায় বাড়ীর বড়বৌ হঠাৎ মনে-পড়ার ভঙ্গীতে বল্লেন—হাঁ, একটা মজার কথা শোননি বুঝি। শ্রীপতি যে বিয়ে করেচে, বট্‌ঠাকুরের কাছে চিঠি এসেচে, শ্রীপতির মামা লিখেচে। সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—শ্রীপতি বিয়ে করেচে!

তারপর সকলেই একসঙ্গে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলো।

—কোথায়, কোথায়?

—কবে চিঠি এল?

—তবে যে শুনলাম শ্রীপতি বিয়ে করবে না বলেচে!

শ্রীপতির বিয়ের খবরে অনেকেই যেন একটু দমে গেল। খবরটা তেমন শুভ নয়। কারো উন্নতির সংবাদ এদের পক্ষে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব। তাদের যখন উন্নতি হলো না তখন অপরের উন্নতি হবে কেন? কিন্তু এর পরেই যখন রায়-বৌ মুখ টিপে হেসে আস্তে আস্তে বল্লেন—বৌটি নাকি বামুনের মেয়ে নয়—তখন সকলে খাড়া হয়ে সটান উঠে বসলো, তাদের মন-মরা ভাবটা এক মুহূর্ত্তে গেল কেটে। একটা বেশ সরস ও মুখরোচক পরনিন্দা ও ঘোঁটের আভাস এরা পেলে, রায় বৌয়ের চাপা ঠোঁটের হাসি থেকে।

শান্তি উৎসুক চোখে চেয়ে হাসিমুখে বল্লে, ভেতরে তাহোলে অনেকখানি কথা আছে!

বোস্ গিন্নী বল্লেন—তাই বল! নইলে এম্‌নি কোথা কিছু নয় শ্রীপতি বিয়ে করলে একি কখনো হয়! কি জাত মেয়েটা? হিঁদু তো?

অর্থাৎ তাহোলে ঝগড়টা আরও জমে।

রায়বৌ বল্লেন, হিঁদুই—মেয়েটা বদ্দির বামুন।

এদেশে বৈদ্যকে বলে থাকে 'বদ্দির বামুন'—এ অঞ্চলের ত্রিসীমানায় বৈদ্যের বাস না থাকায় বৈদ্যজাতির সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারো বিশ্বাস ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্যের সামাজিক স্থান, তারা এক প্রকারের নিম্ন-বর্ণের ব্রাহ্মণ, তার চেয়ে নীচু নয়—আবার কারো বিশ্বাস তাদের স্থান সমাজের নিম্নতর ধাপের দিকে।

শান্তি বল্লে—বৌয়ের বয়েস কত?

—ওঃ তা অনেক। শুনচি চব্বিশ, পঁচিশ—

সকলে সমস্বরে আবার একটা বিস্ময়ের রোল তুল্লে। চব্বিশ, পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত মেয়ে আইবুড়ো থাকে ঘরে! এ আবার কোথাকার ছোট জাত, রামোঃ! ছিঃ—

শান্তির মা বল্লেন, তা হোলে মেয়ে আর নয়, মাগী বল! পাঁড় শসা—বাপ মা বুঝি ঘরে বীজ রেখেছিল!

কে একজন মুখ টিপে হেসে বল্লেন, বিধবা না তো?

চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন, আগের পক্ষের ছেলে মেয়ে কিছু আছে নাকি মাগীর!

এ কথায় শান্তি আগে মুখে আঁচল দিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো—তারপরে বাকি সকলে তার সঙ্গে যোগ দিলে। হ্যাঁ, এটা একটা নূতন ও ভারী মজার খবর বটে, মেয়ে-গজালির কিছুদিনের মত খোরাক সংগ্রহ হোল। আমচুরি কাঁটালচুরির গল্প একটু একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল।

ঠিক পরের দিনই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটলো। শ্রীপতির মেজ ভাই উমাপতি গাঁয়ে এসে বাড়ীর চাবি খুলে লোক লাগিয়ে ঘরদোর পরিস্কার করতে লাগলো। তার দাদা বৌদিদিকে নিয়ে শীগগির আসবে এবং কিছুদিন নাকি গাঁয়েই বাস করবে। বৌদিদি পাড়াগাঁ কখনো দেখেন নি,—গ্রামে আসবার তাঁর খুব আগ্রহ। তার দাদাও কলকাতায় বদলি হবার চেষ্টা করচে।

মেয়ে মজলিসে সবাই তো অবাক। শ্রীপতি কোন্ মুখে অজাতের বউ নিয়ে গাঁয়ে এসে উঠবে! মানুষের একটা লজ্জা সরমও তো থাকে, করেই ফেলেছিস না হয় একটা অকাজ! এ সব কি খিরিষ্টানি কাণ্ড কারখানা, কালে কালে হোল কি! আর সে ধিঙ্গি মাগীটারই বা কি ভরসা যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পাড়ায় বিয়ের বউ সেজে সে কোন্ সাহসেই বা আসবে!

শ্রীপতি অবিশ্যি বৌ নিয়ে পৈত্রিক বাড়ীতে আসার বিষয়ে এঁদের মত জিজ্ঞাসা করে নি। একদিন একখানা নৌকা এসে গ্রামের ঘাটে দুপুরের সময় লাগলো এবং নৌকা থেকে নাম্‌লে শ্রীপতি, তার নব বিবাহিতা বধূ, একটি ছোক্‌রা চাকর ও দুটি ট্রাঙ্ক ও একটা বড় বিছানার মোট, একটা ঝুড়ি বোঝাই টুকিটাকি জিনিষ। ঘাটে দু একজন যারা অত বেলায় স্নান করছিল, তারা তখুনি পাড়ার মধ্যে গিয়ে খবরটা সবাইকে বল্লে। তখন কিন্তু কেউ এল না, অত বেলায় এখন শ্রীপতিদের বাড়ী গেলে তাদের খেতে বলতে হয়। অসময়ে

এখন এসে তারা রান্নাবান্না চড়িয়ে খাবে, সেটা প্রতিবেশী হয়ে হতে দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কিন্তু সে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করবার চেয়ে এখন না যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

কিন্তু রাম্ন চক্কত্তি আর প্রিয় মুখুয্যের বাড়ীর মেয়েরা অত সহজে রেহাই পেলেন না। শ্রীপতি নিজে গিয়ে একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকে বল্লে—ও-পিসিমা, ও-বৌদিদি, আপনারা আপনাদের বৌকে হাত ধরে ঘরে না তুললে কে আর তুলবে? আস্থন সবাই।

বাধ্য হয়ে কাছাকাছির দু'তিন বাড়ীর মেয়েরা শাঁক হাতে, জলের ঘটি হাতে নতুন বৌকে ঘরে তুলতে এলেন—খানিকটা চক্ষুলজ্জায়, খানিকটা কৌতুহলে। মজা দেখবার প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই আছে। ছোটবড় ছেলে-মেয়েরাও এল অনেকে, শান্তি এল, কমলা এল, সরলা এল।

শ্রীপতিদের বাড়ীর উঠোনে লিচুতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূর থেকে মেয়েটির ধপধপে ফর্সা গায়ের রং ও পরণের দামী সিল্কের শাড়ী দেখে সকলে অবাক্ হয়ে গেল। সামনে এসে আরও বিস্মিত হবার কারণ ওদের ঘটলো মেয়েটির অনিন্দ্যস্থন্দর মুখশ্রী দেখে। কি ডাগর ডাগর চোখ! কি স্থকুমার লাবণ্য সারা অঙ্গে! সর্ব্বোপরি মুখশ্রী—অমন ধরণের স্থন্দর মুখ এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনো দেখেনি।

সকলে আশা করেছিল গিয়ে দেখবে কালোকোলো একটা মোটামত মাগী আধ-ঘোমটা দিয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে দেখলে, এক নম্রমুখী স্থন্দরী তরুণী মূর্ত্তি…। মুখখানি এত স্থকুমার যে মনে হয় ষোল সতেরো বছরের বালিকা।

বিকেলে ওপাড়ার নিতাই মুখুয্যের বৌ ঘাটের পথে চক্কত্তি গিন্নীকে জিজ্ঞেস করলেন—

—কি দিদি, শ্রীপতির বৌ দেখলে নাকি? কেমন দেখতে?

চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন—না, দেখতে বেশ ভালই—

চক্কত্তি গিন্নীর সঙ্গে শান্তি ছিল, সে হাজার হোক ছেলেমানুষ, ভাল লাগলে পরের প্রশংসার বেলায় সে এখনও কার্পণ্য করতে শেখেনি, সে উচ্ছ্বসিত স্থরে বলে উঠলো—চমৎকার, খুড়ীমা একবার গিয়ে দেখে আসবেন সত্যিই অদ্ভুত ধরণের ভাল।

নিতাই মুখুয্যের বৌ পরের এতখানি প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না—

বুঝতে পারলেন না শান্তি কথাটা ব্যঙ্গের সুরে বলছে না, সত্যিই বলছে। বল্লেন—কি রকম ভাল?

এবার চক্কত্তি গিন্নী নিজেই বল্লেন—না বৌ, যা ভেবেছিলাম তা নয়। বৌটি সত্যিই দেখতে ভাল। আর কেনই বা হবে না বলো, সহরের মেয়ে, দিনরাত সাবান ঘসছে, পাউডার ঘসছে, তোমার আমার মত রাঁধতে হোত, বাসন মাজতে হোত, তো দেখতাম চেহারার কত জলুস বজায় রাখে।

এই বয়সে তো দূরের কথা, তাঁর বিগত যৌবন দিনেও অজস্র পাউডার সাবান ঘসলেও যে কখনো তিনি শ্রীপতির বৌয়ের পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারতেন না—চক্কত্তি গিন্নীর সম্বন্ধে শান্তির এ কথা মনে হোল। কিন্তু চুপ করে রইল সে।

বিকেলে এপাড়ার ওপাড়ার মেয়েরা দলে দলে বৌ দেখতে এল। অনেকেই বল্লে এমন রূপসী মেয়ে তারা কখন দেখেনি কেবল হরিচরণ রায়ের স্ত্রী বল্লেন, আর বছর তারকেশ্বরে যাবার সময় ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে তিনি একটি বৌ দেখেছিলেন, সেটি এর চেয়েও রূপসী।

মেয়ে-মজ্‌লিসে পরদিন আলোচনার একমাত্র বিষয় দাঁড়ালো শ্রীপতির বৌ। দেখা গেল তার রূপ সম্বন্ধে দু-মত নেই সভ্যাদের মধ্যে, কিন্তু তার চরিত্র সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য অবাধে চলচে।

—ধরণ-ধারণ যেন কেমন কেমন—অত সাজগোজ কেন রে বাপু?

—ভাল ঘরের মেয়ে নয়। দেখলেই বোঝা যায়—

—বাসন মাজতে হোলে ওহাত আর বেশীদিন অত সাদাও থাকবে না, নরমও থাকবে না—ঠ্যালা বুঝবেন পাড়াগাঁয়ের। গলায় লেক্‌লেস ঝুলুতে আমরাও জানি—

—বেশ একটু ঠ্যাকারে। পাড়াগাঁয়ের মাটিতে যেন গুমরে পা পড়ছে না, এমনি ভাব। বামুনের ঘরে বিয়ে হয়ে ভাবছে যেন কি—

—তা তো হবেই, বদ্দির বামুনের মেয়ে, বামুনের ঘরে এয়েছে, ওর সাতপুরুষের সৌভাগ্যি না?

নববধূর সপক্ষে বল্লে, কেবল শান্তি ও কমলা। শান্তি ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লে, তোমরা কারো ভাল দেখতে পার না বাপু! কেন ওসব বলবে একজন ভদ্দরঘরের মেয়ের সম্বন্ধে? কাল বিকেলে আমি গিয়ে কতকক্ষণ ছিলাম নতুন বৌয়ের কাছে। কোনো ঠ্যাকার নাই, অংখার নেই, চমৎকার মেয়ে!

কমলা বল্লে—আমাদের উঠতে দেয় না কিছুতেই—কত গল্প করলে, খাবার খেতে দিলে, চা করলে—আর খুব সাজগোজ কি করে? সাদাসিদে শাড়ী সেমিজ পরে তো ছিল। তবে খুব ফর্সা কাপড়-চোপড়—ময়লা একেবারে দু'চোখে দেখতে পারে না—

শান্তি বল্লে, ঘরগুলো এরই মধ্যে কি চমৎকার সাজিয়েছে! আয়না, পিক্‌চার, দোপাটিফুলের তোড়া বেঁধে ফুলদানিতে রেখে দিয়েছে—শ্রীপতি দা'র বাপের জন্মে কখনো অমন সাজানো ঘরদোরে বাস করেনি—ভারী ফিট্‌ফাট্ গোছালো বৌটি—

দিন দুই পরে ডোবার ঘাটে নববধূকে একরাশ বাসন নিয়ে নামতে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। চারিদিকে বনে ঘেরা ঝুপসি আধ-অন্ধকার ডোবাটা যেন মেয়েটির স্নিগ্ধ রূপের প্রভায় এক মুহূর্ত্তে আলো হয়ে উঠে, একথা যারা তখন ডোবার অন্যান্য ঘাটে ছিল, সবাই মনে মনে স্বীকার করলে। দৃশ্যটাও যেন অভিনব ঠেক্‌লো সকলের কাছে, এমন একটা পচা এঁদো জঙ্গলে ভরা পাড়াগাঁয়ে ডোবার ঘাটে সাধারণতঃ কালোকালো, আধ-ময়লা সাড়ী পরা শ্রীহীনা ঝি-বৌ বা ত্রিকালোত্তীর্ণা প্রৌঢ়া বিধবাদের গামছাপরিহিতা মূর্ত্তিই দেখা যায় বা দেখার আশা করা যায়—সেখানে এমন একটি আধুনিক ছাঁদে খোঁপা বাঁধা, ফর্সা শাড়ী ব্লাউজ-পরা, রূপকথার রাজকুমারীর মত রূপসী, নব-যৌবনা বধূ সজ্‌নেতলার ঘাটে বসে ছাই দিয়ে নিটোল সুগৌর হাতে বাসন মাজচে, এ দৃশ্যটা খাপ খায় না। সকলের কাছেই এটা খাপ ছাড়া বলে মনে হোল। প্রৌঢ়ারাও ভেবে দেখলেন গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি এই ক্ষুদ্র ডোবার ইতিহাসে।

রায় পাড়ায় একটি প্রৌঢ়া বল্লেন—আহা, বৌ তো নয়, যেন পিরতিমে—কিন্তু অত রূপ নিয়ে কি এই ডোবায় নামে বাসন মাজতে! না ওহাতে কখনো ছাই দিয়ে বাসন মাজা অভ্যেস্ আছে! হাত দেখেই বুঝছি।

তারপর থেকে দেখা গেল ঘরসংসারের যা কিছু কাজ শ্রীপতির বৌ সব নিজের হাতে করচে।

ইতিমধ্যে শ্রীপতি কল্‌কাতায় বদ্‌লি হবার খবর আসতে সে চলে গেল বাড়ী থেকে।

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে শান্তি ও কমলা শ্রীপতির বৌয়ের বড় ন্যাওটা

হয়ে পড়লো। সকাল নেই বিকেল নেই, সব সময়েই দেখা যায় শান্তি ও কমলা বসে আছে ওখানে।

পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ে, অমন আদর করে কেউ কখনো রোজ রোজ ওদের লুচি হালুয়া খেতে দেয় নি।

একদিন কমলা বল্লে—বৌদিদি, তোমার ঘরে কাপড় মোড়া ওটা কি?

শ্রীপতির বৌ বল্লে—ওটা এসরাজ—

—বাজাতে জানো বৌদি?

—একটুখানি অমনি জানি ভাই, কিন্তু এ্যাদ্দিন ওকে বার পর্য্যন্ত করিনি কেন জানো, গাঁয়ে-ঘরে কে কি হয়তো মনে করবে।

শান্তি বল্লে—নিজের বাড়ী বসে বাজাবে, কে কি মনে করবে? একটু বাজিয়ে শোনাও না বৌদি?

একটু পরে রায়গিন্নী ঘাটে যাবার পথে শুনতে পেলেন শ্রীপতির বাড়ীর মধ্যে কে বেহালা না কি বাজাচ্ছে, চমৎকার মিষ্টি! কোনো ভিখিরী গান গাচ্ছে বুঝি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুনে তিনি ঘাটে চলে গেলেন।

ঘাটে গিয়ে তিনি মজুমদার বৌকে বল্লেন কথাটা।

—ওই শ্রীপতির বাড়ী কে একজন বোষ্টম এসে বেহালা বাজাচ্ছে শুনে এলাম। কি চমৎকার বাজাচ্ছে দিদি, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে।

দুপুরের মেয়ে মজলিসে শান্তির মা বল্লেন—শ্রীপতির বৌ চমৎকার বাজাতে পারে এসরাজ না কি বলে, একরকম বেহালার মত। শান্তিদের ওবেলা শুনিয়েছিল—

রায় বৌ বল্লেন—ও! তাই ওবেলা নাইতে যাবার সময় শুনলাম বটে! সে যে ভারী চমৎকার বাজনা গো, আমি বলি বুঝি কোন ফকির বোষ্টম ভিক্ষে করতে এসে বাজাচ্ছে!

এমন সময় শান্তি আসতেই তার মা বল্লেন—ওই জিজ্ঞেস কর না শান্তিকে।

শান্তি বল্লে—উঃ সে আর তোমায় কি বলব খুড়ীমা, বৌদিদি যা বাজালে অমন কখনো শুনিনি—শুনবে তোমরা? তা'হোলে এখন বলি বাজাতে—বল্লেই বাজাবে।

শান্তি শ্রীপতিদের বাড়ী চলে যাবার অল্পপরেই শোনা গেল শ্রীপতির বৌয়ের এস্রাজ বাজনা। অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা রইল না।

চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন—আহা, বড় চমৎকার বাজায় তো!

সকলেই স্বীকার করলে শ্রীপতির বৌকে আগে যা ভাবা গিয়েছিল, সে-রকম নয়, মেয়েটি।

এস্রাজ বাজনার মধ্যে দিয়ে পাড়ার সকলের সঙ্গে শ্রীপতির বৌয়ের সহজ ভাবে আলাপ পরিচয় জমে উঠলো। দুপুরে, সন্ধ্যায় প্রায়ই সবাই যায় শ্রীপতিদের বাড়ী বাজনা শুনতে।

তারপর গান শুনলো সবাই একদিন। পূর্ণিমার রাত্রে জোৎস্নাভরা ভেতর বাড়ীর রোয়াকে বসে বৌ এস্রাজ বাজাচ্ছিল, পাড়ার সব মেয়েই এসে জুটেচে। শ্রীপতি বাড়ী নেই।

কমলা বল্লে—আজ বৌদি একটা গান গাইতে হবে—তুমি গাইতে জানো ঠিক—শোনাও আজগে—

বৌটি হেসে বল্লে—কে বলেচে ঠাকুরঝি যে আমি গাইতে জানি?

—না ওসব রাখো—গাও একটা—

সকলেই অনুরোধ করলে। বল্লে—গাও বৌমা, এ পাড়ায় মানুষ নেই, আস্তে আস্তে গাও, কেউ শুনবে না—

শ্রীপতির বৌ একখানা মীরার ভজন গাইলে।

রাণাজি, ম্যয় গিরধর কে ঘর যাঁহু
গিরধর মৃহারা সাচো প্রিতম্ দেখত রূপ লুভাঁউ।

গায়িকার চোখে মুখে কি ভক্তিপূর্ণ তন্ময়তার শোভা ফুটে উঠলো গানখানা গাইতে গাইতে—শান্তি একটা গন্ধরাজ আর টগরের মালা গেঁথে এনেছিল বৌদিকেই পরাবে বলে—গান গাইবার সময়ে সে আবার সেটা বৌয়ের গলায় আল্‌গোছে পরিয়ে দিলে—সেই জ্যোৎস্নায় সাদা সুগন্ধি ফুলের মালা গলায় রূপসী বৌয়ের মুখে ভজন শুনতে শুনতে মণ্টুর মার মনে হলো এই মেয়েটিই সেই মীরাবাই, অনেককাল পরে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে, আবার সবাইকে ভক্তির গান গাইয়ে শোনাচ্ছে।

মণ্টুর মা একটু একটু বাইরের খবর রাখতেন, যাত্রায় একবার মীরাবাই পালা দেখেছিলেন তাঁর বাপের বাড়ীর দেশে।

তারপর আর একখানা হিন্দীগান গাইলে বৌ, এরা অবশ্যি কিছু বুঝলেন না। তবে তন্ময় হয়ে শুনলেন বটে।

তারপর একখানা বেহাগ। বাংলা গান এবার। সকলে শুয়ে পড়লো—শান্তির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। অনেকে দেখলে বৌয়েরও চোখ

দিয়ে জল পড়ছে গান গাইতে গাইতে—রূপসী গায়িকা একেবারে যেন বাহ্যজ্ঞান ভুলে গিয়েছে গানে তন্ময় হয়ে।

সেদিন থেকেই সকলে শ্রীপতির বৌকে অন্য চোখে দেখতে লাগলো।

ওর সম্বন্ধে ক্রমে উচ্চধারণা করতে সকলে বাধ্য হোল আরও নানা ঘটনায়। পাড়াগাঁয়ে সকলেই বেশ হুঁসিয়ার, একথা আগেই বলেছি। ধার দিয়ে—সে যদি এক খুঁচি চাল কি দু পলা তেলও হয়—তার জন্যে দশবার তাগাদা করতে এদের বাধে না। কিন্তু দেখা গেল শ্রীপতির বৌ সম্পূর্ণ দিলদরিয়া মেজাজের মেয়ে। দেবার বেলায় সে কখনও না বলে কাউকে ফেরায় না, যদি জিনিষটা তার কাছে থাকে। একেবারে মুক্তহস্ত সে বিষয়ে। কিন্তু আদায় করতে জানে না, তাগাদা করতে জানে না, মুখে তার রাগ নেই, হাসিমুখ ছাড়া তার কেউ কখনো দেখে নি।

শ্রীপতির বৌয়ের আপনপর জ্ঞান নেই, এটাও সবাই দেখলে। পাশের বাড়ীতে চক্কত্তি গিন্নী বিধবা, একাদশীর দিন-দুপুরে তিনি নিজের ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন, শ্রীপতির বৌ একবাটি তেল নিয়ে এসে তাঁর গায়ে মালিশ করতে বসে গেল। যেন ও তাঁর নিজের ছেলের বৌ।

চক্কত্তি গিন্নী একটু অবাক হোলেন প্রথমটা। পাড়াগাঁয়ে এরকম কেউ করে না, নিজের ছেলের বৌয়েই করে না তো অপরের বৌ!

—এসো, এসো মা আমার এসো। থাক্ তেল মালিশ আবার কেন মা? তোমায় ওসব করতে হবে না, পাগলী মেয়ে—

এই পাগলী মেয়েটি কিন্তু শুনলে না। সে জোর করেই বসে গেল তেল মালিশ করতে। মাথার চুল এসে আগোছালো ভাবে উড়ে পড়ছে মুখে, অতিরিক্ত গরমে ও শ্রমে কিছু কিছু ঘাম দেখা দিয়েচে—চক্কত্তি গিন্নী এই সুন্দরী বৌটির মুখ থেকে চোখ যেন অন্যদিকে ফেরাতে পারলেন না। বড় স্নেহ হোল এই আপন-পর জ্ঞান-হারা মেয়েটার ওপর।

ইতিমধ্যে কমলার বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুর বাড়ী যাবার সময়ে সে শ্রীপতির বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্লে—বৌদিদি, তোমায় কি করে ছেড়ে থাকবো ভাই? মাকে ছেড়ে যেতে যত কষ্ট না হচ্ছে, তত হচ্ছে তোমায় ছেড়ে যেতে! এই এক ব্যাপার থেকেই বোঝা যাবে শ্রীপতির বৌ এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে গ্রামের তরুণ মনের ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পূজার সময় এসে পড়েছে। আশ্বিনের প্রথম, শরতের নীল আকাশে

অনেকদিন পরে সোনালি রোদের মেলা, বনসিমের ফুল ফুটেছে ঝোপে ঝোপে, নদীর চরে কাশ ফুলের শোভা। পাশের গ্রাম সত্রাজিৎপুরে বাঁড়ুয্যে বাড়ী পূজো হয় প্রতি বছর, এবারও শোনা যাচ্ছে মহানবমীর দিন তাদের বাড়ী আর বছরের মত যাত্রা হবে কাঁচড়াপাড়ার দলের।

শ্রীপতির বৌ গান-পাগলা মেয়ে, এ কথাটা এতদিনে এ গাঁয়ের সবাই জেনেছে। তার দিন নেই, রাত নেই, গান লেগে আছে, তুপুরে রাত্রে রোজ এস্রাজ বাজায়। গান সম্বন্ধে কথা সর্ব্বদা তার মুখে। শান্তির এখনও বিয়ে হয়নি, যদিও সে কমলার বয়সী। সে শ্রীপতির বৌয়ের কাছে আজকাল দিনরাত লেগে থাকে গান শিখ্‌বার জন্যে।

একদিন শ্রীপতির বৌ তাকে বল্লে—ভাই শান্তি, এক কাজ করবি, সত্রাজিৎপুরে তো যাত্রা হবে বলে সবাই নেচেছে। আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো আর দেখতে পাবে না? তারা কি আর অপর গাঁয়ে যাবে যাত্রা শুনতে? অথচ এরা কখনো কিছু শোনে না—আহা! এদের জন্যে যদি আমরা আমাদের পাড়াতে থিয়েটার করি?

শান্তি অবাক্! থিয়েটার! তাদের এই গাঁয়ে? থিয়েটার জিনিষটার নাম শুনেছে বটে সে, কিন্তু কখনো দেখেনি। বল্লে—কি করে কববে বৌদি, কি যে তুমি বলো! তুমি একটা পাগল!

শ্রীপতির বৌ হেসে বল্লে—সে সব বন্দোবস্ত আমি করবো এখন। তোকে ভেবে মরতে হবে না—গ্যাখ্‌ না কি করি।

সপ্তাহখানেক পরে শ্রীপতি যেমন শনিবারের দিন বাড়ী আসে, তেমনি এল। সঙ্গে তিনটি বড় মেয়ে ও তুটী ছোট মেয়ে ও চার পাঁচটি ছেলে। বড় মেয়ে তিনটির ষোল, সতেরো এমনি বয়েস, সকলেই ভারী সুন্দরী, ছোট মেয়ে তুটির মধ্যে যেটির বয়েস বছর তেরো, সেটি তত সুবিধের নয় কিন্তু যেটির বয়েস আন্দাজ দশ—তাকে দেখে রক্ত মাংসের জীব বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন মোমের পুতুল। ছেলেদের বয়েস পনেরোর বেশী নয় কারো। সকলেই সুবেশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

শান্তি, শান্তির মা এবং চক্কত্তি গিন্নী তখন সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপতির বৌ ওদের দেখে ছুটে গেল রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে। উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে বল্লে—এই যে রমা, পিণ্টু, তারা, এই যে শিবু আয়, আয় সব কেমন আছিস্? ওঃ কতদিন দেখিনি তোদের—

রমা বলে ষোল সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়েটি ওর গলা জড়িয়ে ধরলে, সকলেই ওকে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলে।

—দিদি কেমন আছিস্ ভাই—

—একটু রোগা হয়ে গেছিস্ দিদি ?

—ওঃ কতদিন যে তোকে দেখিনি—

—দাদাবাবু যখন বল্লেন তোর এখানে আসতে হবে আমরা তো—

—আহিরীটোলাতে মিউজিক কম্পিটিশন ছিল—নাম দিয়েছিলাম—ছেড়ে চলে এলাম—

মেয়েগুলির মুখ রং ও গড়ন শ্রীপতির বৌয়ের মত। রমা তো একেবারে হুবহু ওর মত দেখতে, কেবল যা কিছু বয়েসের তফাৎ। জানা গেল মেয়ে দুটির মধ্যে রমা ও তার ছোট সতী, এবং ছেলেদের মধ্যে বারো বছরের ফুট্‌ফুটে ছেলে শিবু শ্রীপতির বৌয়ের আপন ভাই বোন্, বাকী সবাই কেউ খুড়তুতো, কেউ জ্যাঠতুতো ভাই বোন্।

ক্রমে আরও জানা গেল শ্রীপতির বৌ এদের চিঠি লিখিয়ে আনিয়েছে থিয়েটার করানোর জন্যে।

পাড়ার সবাই রূপ দেখে অবাক্। এসব পাড়াগাঁয়ে অমন চেহারার ছেলে মেয়ে কেউ কল্পনাই করতে পারে না। দশ বছরের সেই ছেলেটার নাম পিণ্টু, সে শান্তির ন্যাওটা হয়ে গেল। সে আবার সাঁতার দেবার নীল রঙের পোষাক এনেছে, সিক্ত নীল পোষাক, সুগৌর দেহ যখন সে নদীর ঘাটে স্নান করে উঠে দাঁড়ায়—তখন ঘাটশুদ্ধ মেয়েরা—বোস্ গিন্নী, মণ্টুর মা, মজুমদার গিন্নী ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। রূপ আছে বটে ছেলেটির! শান্তি দস্তুরমত গর্ব্ব অনুভব করে, যখন পিণ্টু অনুযোগ করে বলে—আঃ শান্তিদি আসুন না উঠে, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বো ? আসুন, বাড়ী যাই।

পূজো এসে পড়লো। এ-গাঁয়ে কোনো উৎসব নেই পূজোয়, গরীবদের গাঁয়ে পূজো কে করবে ? দূর থেকে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুয্যেবাড়ীর ঢাক শুনেই গাঁয়ের মেয়েরা সন্তুষ্ট হয়। ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের পূজো দেখবার রীতি না থাকায় অনেকে দশ-পনেরো কি বিশ বছর দুর্গা প্রতিমা পর্য্যন্ত দেখেনি। মেয়েদের জীবনে কোনো উৎসব আমোদ নেই এ গাঁয়ে।

শ্রীপতির বৌ তাই একদিন শান্তিকে বলেছিল—সত্যি কি করে যে তোরা

থাকিস্ ঠাকুরঝি—একটু গান নেই, বাজনা নেই, বই পড়া নেই, মানুষে যে কেমন করে থাকে এমন করে!

বোধ হয় সেই জন্যেই এত উৎসাহের সঙ্গে ও লেগেছিল থিয়েটারের ব্যাপারে।

শ্রীপতিদের বাড়ীর লম্বা বারান্দার একধারে তক্তপোষ পেতে দড়ি টাঙিয়ে হলদে শাড়ী ঝুলিয়ে ষ্টেজ করা হয়েছে।

শ্রীপতির বৌ ভাই বোনদের নিয়ে সকাল থেকে খাট্‌চে।

শান্তি বল্লে—তুমি এতো জানলে কি করে বৌদি?

রমা বল্লে—তুমি জানো না দিদিকে শান্তিদি। দিদি অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে—

শ্রীপতির বৌ ধমক দিয়ে বোনকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—নে, নে—যা, অনেক কাজ বাকী, এখন তোর অত বক্তৃতা করতে হবে না দাঁড়িয়ে—

রমা না থেমে বল্লে—আর খুব ভাল পার্ট করার জন্যেও সোনার মেডেল পেয়েছে—যতবার পয়লা বোশেখের দিন আমাদের বাড়ীতে থিয়েটার হয়, দিদিই তো তার পাণ্ডা—জানো আমাদের কি নাম দিয়েছেন জ্যাঠামশায়?

শ্রীপতির বৌ বল্লে—আবার?

রমা হেসে থেমে গেল।

মহাষ্টমীর দিন আজ। শুধু মেয়েদের আর ছোট ছোট ছেলেদের দিয়ে থিয়েটার। দেখবে শুধু মেয়েরাই—সমস্ত পাড়া কুড়িয়ে সব মেয়ে এসে জুটেছে থিয়েটার দেখতে।

ছোট্ট নাটকটি। শ্রীপতির বৌয়ের জ্যাঠামশাইয়ের নাকি লেখা। রাজকুমারকে ভালবেসেছিল তাঁরই প্রাসাদের একজন পরিচারিকার মেয়ে। ছেলেবেলায় দু'জনে খেলা করেছে। বড় হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরুলেন রাজপুত্র, অন্য দেশের রাজকুমারী ভদ্রাকে বিবাহ করে ফিরলেন। পরিচারিকার মেয়ে অনুরাধা তখন নব যৌবনা কিশোরী, বিকশিত মল্লিকা—পুষ্পের মত শুভ্র, পবিত্র। খুব ভাল নাচতে গাইতে শিখেছিল সে ইতিমধ্যে। রাজধানীর সবাই তাকে চেনে জানে—নৃত্যের অমন রূপ দিতে কেউ পারে না। এদিকে ভদ্রাকে রাজ্যে এনে রাজকুমার এক উৎসব করলেন। সে সভায় অনুরাধাকে নাচতে গাইতে হোল রাজপুত্রের সামনে ভাড়া করা নর্ত্তকী হিসেবে। তার বুক ফেটে যাচ্ছে, অথচ সে একটা কথাও বল্লে না, নৃত্যের মধ্যে দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জীবনের

ব্যর্থ প্রেমের বেদনা সে নিবেদন করলে প্রিয়ের উদ্দেশ্যে। তারপরে কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে পরদিন একা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

শ্রীপতির বৌ অনুরাধা, রমা ভদ্রা। ওর অন্য সব ভাই বোনেরাও অভিনয় করলে। শ্রীপতির বৌ বেশভূষায়, রূপে, গলে দোদুল্যমান যুঁইফুলের মালায় যেন প্রাচীন যুগের রূপকথার রাজকুমারী, রমাও তাই, গানে গানে অনুরাধা তো ষ্টেজ্ ভরিয়ে দিলে, আর কি অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গি! সতী, রমা পিণ্টুও কি চমৎকার অভিনয় করলে, আর কি চমৎকার মানিয়েছে ওদের!

তারপরে বহুকাল পরে পথের ধারে মুমূর্ষু অনুরাধার সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা। সে বড় মর্ম্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য! অনুরাধার গানের করুণ সুরপুঞ্জে ঘরের বাতাস ভরে গেল। চারিদিকে শুধু শোনা যাচ্ছিল কান্নার শব্দ, শান্তি তো ফুলে ফুলে কেঁদে সারা।

অভিনয় শেষ হোল, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ী চলে গেল না। তারা শ্রীপতির বৌকে ও রমাকে অভিনয়ের পর আবার দেখতে চায়। শ্রীপতির বৌ ও তার ভাইবোনদের রান্না ঘরে নিয়ে গিয়ে চক্কত্তি গিন্নী ও শান্তির মা ও মণ্টুর মা খেতে বসিয়ে দিলেন আর ওদের চারিধার দিয়ে পাড়ার মেয়ে।

ওপাড়ার রাম গাঙুলির বৌ বল্লেন—বৌমা যে আমাদের এমন তা তো জানিনে! ওমা এমন জীবনে তো কখনো দেখিনি—

মণ্টুর মা বল্লেন—আর ভাইবোনগুলিও কি সব হীরের টুকরো! যেমন সব চেহারা তেমনি গান,—

শান্তি তো তার বৌদিদির পিছুপিছু ঘুরছে, তার চোখ থেকে অভিনয়ের ঘোর এখনও কাটেনি, সেই যূঁইফুলের মালাটি বৌদিদির গলা থেকে সে এখনও খুলতে দেয় নি। ওর দিক থেকে অন্যদিকে সে চোখ ফেরাতে পারচে না যেন।

চক্কত্তি গিন্নী বল্লেন—আর কি গলা আমাদের বৌমার আর রমার! পিণ্টু অতটুকু ছেলে, কি চমৎকার করলে!···

শান্তির মা বল্লেন—পিণ্টু খাচ্ছে না ছাখো সেজ বৌ। আর একটু দুধ দি, ভাত ক'টা মেখে নাও বাবা, চেঁচিয়ে তো ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে।···কি চমৎকার মানিয়েছিল পিণ্টুকে না সেজ বৌ?—একে ফুটফুটে সুন্দর ছেলে···

শ্রীপতির বৌ হাজার হোক্ ছেলে মানুষ, সকলের প্রশংসায় সে এমন

খুশী হয়ে উঠলো যে খাওয়াই হোল না তার। সলজ্জ হেসে বল্লে—জ্যাঠামশায় আমাদের বলেন কিন্নর দল—এখন ওই নামে আমাদের—

রমা হেসে ঘাড় দুলিয়ে বল্লে—নিজে যে বল্লে দিদি, আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমায় তবে ধমক দিলে কেন তখন ?

তারা বল্লে—নামটি বেশ কিন্নর দল, না ? আমাদের শ্যামবাজারের পাড়ায় কিন্নর দল বলতে সবাই চেনে।

রমা বল্লে, কৃত্রিম গর্ব্বের সঙ্গে—প্রায় এক ডাকে চেনে—হুঁ হুঁ—

তারপর এই রূপবান বালক বালিকার দল সকলে একযোগে হঠাৎ খিল্‌খিল্‌ করে মিষ্টি হাসি হেসে উঠ্‌লো।

সতী হাসতে হাসতে বল্লে—বেশ নামটি, কিন্নর দল, না ?

এমন একদল সুশ্রী চেহারার ছেলেমেয়ে, তার ওপর তাদের এমন অভিনয় করার ক্ষমতা, এমন গানের গলা, এমনি হাসিখুসি মিষ্টি স্বভাব, সকলেরই মনোহরণ করবে তার আশ্চর্য্য কি ?

মণ্টুর মা ভাবলেন কিন্নর দলই বটে !...

ওদের খেতে খেতে হাসি গল্প করতে মহাষ্টমীর নিশি প্রায় ভোর হয়ে এল।

শ্রীপতির বৌ বল্লে, আসুন বাকী রাতটুকু আর সব বাড়ী যাবেন কেন ? গল্প করে কাটানো যাক্।

শ্রীপতি বাড়ী নেই। সে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুয্যে বাড়ীর নিমন্ত্রণে গিয়েছে, আজ রাত্রে যাত্রা দেখে সকালে ফিরবে। সেইজন্যে সকলে বল্লে, তা ভাল কিন্তু বৌমা তোমাকে গান গাইতে হবে।

শান্তি বল্লে—বৌদি, অনুরাধার সেই গানটা গাও আর একবার, আহা চোখে জল রাখা যায়, না শুনলে।

শ্রীপতির বৌ গাইলে, রমা এস্রাজ বাজালে। তারপর রমা ও তারা এক সঙ্গে গাইলে।

একটিমাত্র তেড়ো-পাখী বাঁশ গাছের মগ্‌ডালে কোথায় ডাকতে আরম্ভ করেছে। রাত ফরসা হ'ল।

সে মহাষ্টমীর রাত্রি থেকে গ্রামের সবাই জানলে শ্রীপতির বৌ কি ধরণের মেয়ে।

কেবল তারা জানলে না যে শ্রীপতির বৌ প্রতিভাশালিনী গায়িকা, সত্যিকার

আর্টিষ্ট। সে ভালবেসে শ্রীপতিকে বিয়ে করে এই পাড়াগাঁয়ের বনবাস মাথায় করে নিয়ে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়েচে, যশের আশা, অর্থের আশা, আর্টের চর্চ্চা পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছে। তবু গানের ঝোঁক ওকে ছাড়ে না—ভূতে পাওয়ার মত পেয়ে বসে—দিনরাত তাই ওর মুখে গান লেগেই আছে, তাই আজ মহাষ্টমীর দিন সেই নেশার টানেই এই অভিনয়ের আয়োজন করেচে।

শান্তি কিছুতেই ছাড়তে চায় না ওকে। বলে তুমি কোথাও যেও না বৌদিদি, আমি মরে যাবো, এখানে তিষ্ঠুতে পারবো না, শান্তি আজকাল শ্রীপতির বৌয়ের কাছে গান শেখে, গলা মন্দ নয় এবং এদিকে খানিকটা গুণ থাকায় সে এরই মধ্যে বেশ শিখে ফেলেচে। কিছু কিছু বাজাতেও শিখেচে। গান বাজনায় আজকাল তার ভারী উৎসাহ। শ্রীপতির বৌ তো গান বাজনা যদি পেয়েছে, আর বড় একটা কিছু চায় না, শান্তির সঙ্গীত শিক্ষা নিয়েই সে সব সময় মহাব্যস্ত।

অগ্রহায়ণ মাসের দিকে বৌয়ের বাড়ী থেকে চিঠি এল রমা কি হয়ে হঠাৎ মারা গিয়েছে। শ্রীপতি কলকাতা থেকে সংবাদটা নিয়ে এল। শ্রীপতির বৌ খুব কান্নাকাটি করলে। পাড়াশুদ্ধ সবাই চোখের জল ফেললে ওকে সান্ত্বনা দিতে এসে।

শান্তি সব সময় বৌদির কাছে কাছে থাকে আজকাল। তাকে একদিন শ্রীপতির বৌ বল্লে—জানিস্ শান্তি, আমাদের কিন্নরের দল ভাঙতে সুরু করেছে, রমাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, আমার মন যেন বলছে···

শান্তির বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠলো, ধমক দিয়ে বল্লে, থাক্ ওসব, কি যে বল বৌদি!

কিন্তু শ্রীপতির বৌয়ের কথাই খাট্‌লো।

সে ঠিকই বলেছিল, শান্তি ঠাকুরঝি, কিন্নরের দলে ভাঙন ধরেছে।

রমার পরে ফাল্গুন মাসের দিকে গেল পিণ্টু বসন্ত রোগে। তার আগেই শ্রীপতির বৌ মাঘমাসে বাপের বাড়ী গিয়েছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে সেও গেল।

এ সংবাদ গ্রামে যখন এল, শান্তি তখন সেখানে ছিল না, সেই বোশেখ মাসে তার বিবাহ হওয়াতে সে তখন ছিল মেটিরি বাণপুর, ওর শ্বশুর বাড়ীতে। গ্রামের অন্য অন্য সবাই শুনলে, অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে খাঁটি অকৃত্রিম শোক এ রকম এর আগে কখনো এ গাঁয়ে করতে দেখা যায় নি। রায় গিন্নী,

চক্কত্তি গিন্নী, শান্তির মা, মণ্টুর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ মেয়েটি কোথা থেকে দু'দিনের জন্য এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অকরুণ, কুটিল ভাবে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্ত্তন যে কতখানি, এই সময়ে গাঁয়ের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেতো। ওদের চক্কত্তি বাড়ীর দুপুরবেলার আড্ডায়, স্নানের ঘাটে শ্রীপতির বৌয়ের কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না।

চক্কত্তি গিন্নী শোক পেয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশী। শ্রীপতির বৌয়ের কথা উঠলেই তিনি চোখের জল সামলাতে পারতেন না। বলতেন, দু'দিনের জন্যে এসে মা আমার কি মায়াই দেখিয়ে গেল! আমার পেটের মেয়ে অমন কক্ষনো করেনি···আহা! আমার পোড়া কপাল, সে কখনো এ কপালে টেঁকে!

মণ্টুর মা বলতেন, সে কি আর মানুষ! দেবী অংশে ওসব মেয়ে জন্মায়। নিজের মুখে বলতো হেসে হেসে, 'আমরা কিন্নরের দল খুড়িমা' শাপভ্রষ্ট কিন্নরীই তো ছিল···যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, তেমনি গান···ওকি আর মানুষ, মা?

কথা বলতে বলতে মণ্টুর মার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তো।

এসবের মধ্যে কেবল কথা বলতো না শান্তি। তার বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয়নি, ভেবেছিল বাপের বাড়ী এসে বৌদিদির সঙ্গে অনেকখানি জ্বালা জুড়োবে। পূজোর পরে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে বাপের বাড়ী এসে সে সব শুনেছিল। বৌদিদি যে তার জীবন থেকে কতখানি হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, তা এরা কেউ, কেউ জানে না। মুখে সে সব পাঁচজনের সামনে ভ্যাজ্ ভ্যাজ করে বলে লাভ কি? কি বুঝবে লোকে?

··· ··· ···

বছর দুই পরে একদিনের কথা। গাঁয়ের মধ্যে শ্রীপতির বৌয়ের কথা অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছে। শ্রীপতিও অনেকদিন পরে আবার গ্রামের বাড়ীতে যাওয়া আসা করছে শনিবারে কিংবা ছুটিছাটাতে।

শ্রীপতিদের বাড়ী থেকে শান্তিদের বাড়ী বেশী দূর নয়, দু'খানা বাড়ীর পরেই। শান্তি তখন এখানেই ছিল। অনেক রাত্রে সে শুনলে শ্রীপতি দাদাদের বাড়ীতে কে গান গাইচে। ঘুমের মধ্যে গানের সুর কানে যেতেই সে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলো—

এ কার গলা? ওর গা শিউরে উঠলো। ঘুমের ঘোর এক মুহূর্ত্তে ছুটে

গেল। কখনো সে ভুলবে জীবনে এ গান, এ গলা? সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে ওদের রোয়াকে জ্যোৎস্না রাত্রে বসে এই গানখানাই বৌদিদি প্রথম গেয়েছিল! সেই অপূর্ব্ব করুণ সুর, গানের সুরের প্রতি মোচড়ে যেন এক টি বিষণ্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রাণঢালা আত্মনিবেদন! এ কি আর কারো গলার—ওর কুমারী জীবনের আনন্দভরা দিনগুলির কত অবসর প্রহর যে এ কণ্ঠের সুরে মধুময়!

ও পাগলের মত ছুটে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

রাত অনেক। কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর পৌঁছেচে। ফুট্‌ফুটে শরতের জ্যোৎস্নায় বাঁশবনের তলা পর্য্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে।

ঠিক যেন তিন বছর আগেকার সেই মহাষ্টমীর রাত্রির মতো।

শান্তির মা ইতিমধ্যে জেগে উঠে বল্লেন, ও কে গান করছে রে শান্তি? তারপর তিনিও তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন। শ্রীপতিদের বাড়ী তো কেউ থাকে না, গান গাইবে কে? ওদিকে মণ্টুর মা, মণি, বাদল সবাই জেগেছে দেখা দেল।

প্রথমটা এরা সবাই ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শ্রীপতি কখন রাতের ট্রেনে বাড়ী এসেছিল, কেউ লক্ষ্য করেনি। সে কলের গান বাজাচ্ছে। ওদের সাড়া পেয়ে সে বাহিরে এসে বল্লে—আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে আজ চেয়ে আনলুম ওর গানখানা। মরবার ক'মাস আগে রেকর্ডে গেয়েছিল।

সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শান্তি প্রথমে সে নীরবতা ভঙ্গ করে আস্তে আস্তে বল্লে—ছিরুদা, রেকর্ডখানা আর একবার দেবে?

পরক্ষণে একটি অতি সুপরিচিত, পরমপ্রিয়, সুললিত কণ্ঠের দরদ ভরা সুরপুঞ্জে পাড়ার আকাশ বাতাস, স্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রিটা ছেয়ে গেল। মানুষের মনের কি ভুলই যে হয়! অল্পক্ষণের জন্যে শান্তির মনে হোল তার কুমারী জীবনের সুখের দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে, যেন বৌদিদি মরেনি, কিন্নরের দল ভেঙ্গে যায় নি, সব বজায় আছে। এই তো সামনে আসছে পূজো, আবার মহাষ্টমীতে তাদের থিয়েটার হবে, বৌদিদি গান গাইবে। গান থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বলবে—কেমন শান্তি ঠাকুরঝি, কেমন লাগ্‌লো!

মৌরীফুল

অন্ধকার তখনও ঠিক হয় নাই। মুখুয্যে-বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানে জোনাকীর দল সাঁজ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছিল। তাল-পুকুরের পাড়ে গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে—মাঠের ধারে বাঁশবাগানের পিছনটা সূর্য্যাস্তের শেষ-আলোয় উজ্জ্বল। চারিদিক বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মুখুয্যেদের অন্দর-বাড়ী হইতে এক তুমুল কলরব আর হৈ-চৈ উঠিল।

বৃদ্ধ রামতনু মুখুয্যে শিবকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। তিনি রোজ সন্ধ্যাবেলায় আহুতি দিয়া থাকেন, এজন্য প্রায় একপোয়া খাঁটি গাওয়া ঘি তাঁর চাই। তিনি নানা উপায়ে এই ঘি সংগ্রহ করিয়া ঘরে রাখিয়া দেন। অন্যদিনের মত আজও তাকের উপর একটা বাটিতে ঘি-টা ছিল, তাঁর পুত্রবধূ সুশীলা সেই বাটি তাকের উপর হইতে পাড়িয়া সে ঘি-টার সমস্তই দিয়া খাবার তৈয়ারী করিয়াছে।

রামতনু মুখুয্যে মহকুমার কোর্টে গিয়াছিলেন ও-পাড়ার চৌধুরীদের পক্ষে একটা মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে।

বিপক্ষের উকীল তাঁকে জেরার মুখে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি গত মে মাসে পাঁচু রায় আর তার ভাইয়ের পাঁচীলের জায়গা নিয়ে মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিলেন না?

রামতনু মুখুয্যে বলিয়াছিলেন—হাঁ তিনি ছিলেন।

উকীল পুনরার জেরা করিয়াছিলেন—দু-নালির চৌধুরীদের কানসোনার মাঠের দাঙ্গার মোকদ্দমায় আপনি পুলিশের দিকে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন কি না?

রামতনু মহাশয়কে ঢোক গিলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে তিনি দিয়াছিলেন বটে।

বিপক্ষের উকীল আবার প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, এর কিছুদিন পরেই বড়-তরফের স্বত্বের মামলায় আপনি বাদী পক্ষের সাক্ষী ছিলেন কি না?

কবে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, মুখুয্যে মহাশয় প্রথমটা তাহা মনে করিতে পারেন নাই, তারপর বিপক্ষের উকীলের পুনঃ পুনঃ কড়া প্রশ্নে এবং মুন্সেফবাবুর ভ্রূকুটি-মিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখে হতভাগ্য রামতনুর মনে পড়িয়াছিল যে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন বটে এবং এই গত জুলাই মাসে এই কোর্টেই তাহা তিনি দিয়া গিয়াছেন।

তারপর কোর্টে কি ঘটিয়াছিল, বিপক্ষের উকীল হাকিমের দিকে চাহিয়া রামতনুর উপর কি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, রামতনু উকীল-আম্‌লায় ভর্ত্তি মুন্সেফবাবুর এজ্‌লাসে হঠাৎ কিরূপে সপুষ্প সর্ষপক্ষেত্রের আবিষ্কার করেন, সে-সকল কথা উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। তবে মোটের উপর বলা যায়, রামতনু মুখুয্যে যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তাঁর শরীরের ও মনের অবস্থা খুবই খারাপ। কোথায় এ অবস্থায় তিনি ভাবিয়াছিলেন হাত পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া শ্রীগুরুর উদ্দেশে আহুতি দিয়া অনিত্য বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত মনকে একটু স্থির করিবেন, না দেখেন যে আহুতির জন্য আলাদা করিয়া তোলা যে ঘি-টুকু তাকে ছিল, তাহার সবটাই একেবারে নষ্ট হইয়াছে!

তারপর প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা ধরিয়া মুখুয্যে বাড়ীর অন্দর মহলে একটা রীতিমত কবির লড়াই চলিতে লাগিল। মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্রবধূ সুশীলা প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইলেও সাম্‌লাইয়া লইয়া এমন-সব কথায় শ্বশুরকে জবাব দিতে লাগিল যাহা একজন আঠারো-বৎসর-বয়স্কা তরুণীর মুখে সাজে না। পক্ষান্তরে কোর্টে বিপক্ষের উকীলের অপমানে ও ঘরে আসিয়া পুত্রবধূর নিকট অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় রামতনু মুখুয্যে পুত্রবধূর পিতৃকুল ও তাঁহার নিজের পিতৃকুলের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এমন-সব দুরূহ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ডুবালের গল্পে উল্লিখিত কুলাদর্শ-বিদ্যা অধ্যয়ন না করিলে সে-সব বুঝা একেবারেই অসম্ভব।

এমন সময় মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলে কিশোরী বাড়ী আসিল। তাহার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে, বেশী লেখা-পড়া না শেখায় সে চৌধুরীদের জমিদারী কাছারীতে ন'টাকা বেতনে মুহুরীগিরি করিত।

কিশোরীলাল নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে আলো দেওয়া হয় নাই, অন্ধকারেই জামা কাপড় ছাড়িয়া সে বাহিরে হাত-পা ধুইতে গেল।

তারপর ঘরে ঢুকিয়া শুনিল, ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে সুশীলা তাহার সম্মুখের বার্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে, এ সংসারে থাকিয়া সংসার করা তাহার শক্তিতে কুলাইবে না, অতএব কাল সকালেই যেন গরুর গাড়ী ডাকাইয়া তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কিশোরী সে কথার কোন বিশেষ জবাব না দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া, বাঁশের লাঠিগাছা ঘরের কোণ হইতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ও-পাড়ায় রায়বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের নিষ্কর্ম্মা যুবকদিগের যাত্রার আখ্ড়াই ও রিহার্সেল চলিত—সেইখানে অনেকক্ষণ কাটাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসা তাহার নিত্যকর্ম্মের ভিতর।

রামতনু মুখুয্যে মহাশয়ও অনেকক্ষণ বাহিরের ঘরে কাটাইলেন। প্রতিবেশী হরি রায় তামাকের খরচ বাঁচাইবার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় মুখুয্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রয় করিতেন; তাঁহাকে রামতনু জানাইলেন যে তিনি খুব শীঘ্রই কাশী যাইতেছেন, কারণ আর এ-বয়সে ইত্যাদি।···

তাঁহার এ বাণপ্রস্থ অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষার জন্য দায়ী একমাত্র তাঁহার পুত্রবধূ সুশীলা। সুশীলা সকাল নাই সন্ধ্যা নাই একটা কিছু না বাধাইয়া থাকিতে পারে না। সে অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে যাইলে ক্ষেপিয়া যায়। তাহার জন্য রামতনু মুখুয্যের বাড়ীতে কাক চিল বসিবার উপায় নাই। শ্বশুর শাশুড়ীকে সে হঠাৎ আঁটিয়া উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু এজন্য তাহার চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় না।

অনেক রাত্রে কিশোরী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ঘরে খাবার ঢাকা আছে এবং স্ত্রী ঘুমাইতেছে। খাবারের ঢাকা খুলিয়া আহারাদি শেষ করিয়া সে শুইতে গিয়া দেখিল, স্ত্রী ঘুম-জড়ানো চক্ষে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। স্বামীকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভের সুরে বলিল—কখন এলে? তা আমায় একটু ডাকলে না কেন?

কিশোরী বলিল—আর ডেকে কি হবে? আমার কি আর হাত পা নেই! নিতে জানিনে?

হঠাৎ তাহার স্ত্রী রাগিয়া উঠিল—নিতে জান তো জেনো। কাল থেকে আমার এখানে আর বন্‌বে না। এ যেন হয়েচে শত্রুপুরীর মধ্যে বাস—বাড়ীসুদ্ধ লোক আমার পেছনে এমন ক'রে লেগেছে কেন শুনতে চাই। না হয় বরং···

কান্নায় ফুলিয়া সে বালিসের উপর মুখ গুঁজিল।

কিশোরী দেখিল স্ত্রী রাত-দুপুরের সময় গায় পড়িয়া ঝগড়া করিয়া একটা বিভ্রাট বাধাইয়া তোলে বুঝি। এরকম করিয়া আর সংসার করা চলে না—ভাত ঢাকা ছিল, খুলিয়া লইয়া খাইয়াছে, ইহাতেও যদি স্ত্রী চটিয়া যায় তাহা হইলে আর পারা যায় না,। কিছু না, ও একটা ছল, ঐ সামান্য সূত্র ধরিয়া এখনি সে একটা রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিবে।

কিশোরী বলিল—যা খুসী কাল্‌কে কোরো—এখন একটু ঘুমুতে দাও। ঘুমুচ্ছিলে বলেই আর ডাকিনি এই তো অপরাধ? তা বেশ, কাল থেকে ওঠাবো, চুলের নড়া ধরে' ওঠাবো।

সুশীলা কথাও বলিল না, মুখও তুলিল না, বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া রামতনু মুখুয্যে শুনিলেন, চৌধুরীরা খবর পাঠাইয়াছে কয়েকটি নূতন সাক্ষীর তালিম দিতে হইবে। যাইবার সময় তিনি বলিলেন—ও বউমা, একটু সকাল সকাল ভাত দিয়ো, কোর্টে যেতে হবে।

বেলা নয়টার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন সুশীলা স্নান করিয়া আসিয়া রৌদ্রে কাপড় মেলিয়া দিতেছে, গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরী রান্নাঘরে বসিয়া রাঁধিতেছেন। স্বামীকে দেখিয়াই মোক্ষদা চৌকীদার-হাঁকার সুরে বলিতে লাগিলেন—হয় আমি একদিকে বেরিয়ে যাই, না হয় বাপু এর একটা বিহিত করো। সেই সকাল থেকে ঘুরপাক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, বল্‌চি—ও বউমা, দুটো ভাত চড়িয়ে দাও, ওগো যা হয় দুটো-কিছু রাঁধ—হাতে পায়ে ধর্‌তে কেবল বাকি রেখেছি। কার কথা কে শোনে?—এই বেলা-দুপুরের সময় রাণী এখন এলেন নেয়ে···

সুশীলা রক হইতে সমান গলায় উত্তর দিল—মাইনে-করা দাসী তো নই, আমি যখন পারবো তখন রান্না চড়াবো—সকাল থেকে বসে' আছি নাকি? এত খাটুনি সেরে আবার আট্‌টার মধ্যে ভাত দেবো—মানুষের তো আর শরীর নয়—যার না চল্‌বে সে নিজে গিয়ে রেঁধে নিক্‌···

এ-কথার উত্তরে মোক্ষদা খুন্তী হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া নটরাজ শিবের তাণ্ডব নর্ত্তনের একটা আধুনিক সংস্করণ সুরু করিতে যাইতেছিলেন—একটা ঘটনায় তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

একটা দশ-বারো বৎসরের ছেলে, রংটা বড়ই কালো, ম্যালেরিয়ায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ, পরণে অতি ময়লা এক গামছা, শীতের দিনেও তাহার গায়ে কিছু

নাই, হাতে ছোট একটা বাখারীর ছড়ি লইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল ছেলেটি পার্শ্বের গ্রামের আতর-আলি ঘরামির ছেলে, গত বৎসর তার বাপ মারা গিয়াছে, দুটি ছোট ছোট বোন্ আর মা ছাড়া তার আর কেহ নাই। অবস্থা খুব খারাপ, সবদিন খাওয়া জোটে না, ছেলেটা পিঠে ছড়ি বাজাইয়া হাপু গাহিয়া মা ও বোন দুটিকে প্রতিপালন করে। সে-গ্রামের প্রায় সব বাড়ীতে আসিত, কিন্তু মুখুয্যে-বাড়ী আর কখনো আসে নাই তাহার একটা কারণ এই যে, দানশীলতার জন্য রামতনু মুখুয্যে গ্রামের মধ্যে আদৌ প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

ছেলেটি উঠানে দাঁড়াইয়া বগল বাজাইয়া নানারূপ সুর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাপু গাহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে জোর করিয়া লাঠির বাড়ি মারিতে লাগিল।

তিনটি নেহাৎ গো-বেচারী সাক্ষীর তালিম দিতে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রামতনুর মেজাজ ভাল ছিল না, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—থাম্ থাম্, ও-সব রাখ্—এখন ও-সব দেখবার সখ্ নেই—যা অন্য বাড়ী দেখ্‌গে যা—যা...

সুশীলা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে অবাক্ হইয়া হাপু গাওয়া দেখিতেছিল—ছেলেটি সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে যাইতেই সে তাড়াতাড়ি বাহিরের রকে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল—শোন, তোর বাড়ী কোথায় রে?

—হরিশপুর, মা-ঠাক্‌রুণ।

—তোর বাড়ীতে কে আছে আর?

—মোর বাপ মারা গিয়েছে আর-বছর মা-ঠাক্‌রুণ—মোদের আর কেউ নাই, মুই বড়, মোর ছোট দুটো বোন্ আছে...

—তাই বুঝি তুই হাপু গাস? হ্যাঁ রে এতে চলে?

রামতনুর ধমক খাইয়া ছেলেমানুষ অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল, সুশীলার কথার ভিতর সহানুভূতির সুর চিনিয়া লইয়া হঠাৎ তাহার কান্না আসিল—চোখের জল হু হু করিয়া পড়িতেই ম্যালেরিয়া-শীর্ণ হাতটি তুলিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—না মা-ঠাক্‌রুণ, চলে না। এ-সব লোকে আর দেখ্‌তি চায় না। মুই যদি ভাল গান গাইতি পার্তাম তো যাত্রার দলে যাতাম, বড় কষ্ট মোদের সংসারের—এই শীতি মা-ঠাক্‌রুণ...

সুশীলা বাধা দিয়া বলিল—দাঁড়া, আমি আস্‌চি।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কান্নার বেগ অতিকষ্টে সাম্‌লাইয়া চাহিয়া দেখিল আল্‌নায় একখানা নূতন মোটা বিছানার চাদর ঝুলিতেছে, হাতের গোড়ায় সেইখানা পাইয়া টানিয়া লইল। তারপর জানালা দিয়া বাড়ীর মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া চাদরখানা তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে দিয়া চুপি চুপি বলিল—এইখানা নিয়ে যা, এতে শীত বেশ কাট্‌বে। কাট্‌বে না? খুব মোটা। শীগ্‌গির যা, লুকিয়ে নিয়ে যা কেউ যেন না দেখে…

ছেলেটা চাদর হাতে হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সুশীলা বলিল--ওরে এক্ষুনি কে এসে পড়বে, শীগ্‌গির যা…

ছেলেটাকে বিদায় দিয়া সুশীলা ভিতর-বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিল শ্বশুর আহার করিতে বসিয়াছেন। ছেলেটার দুঃখে সুশীলার মন খুব নরম হইয়া গিয়াছিল, সে গিয়া রান্না-ঘরে ঢুকিয়া কাজে মন দিল, শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে কিছু দেব বাবা?

মোক্ষদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—তোমাকে আর দিতে হবে না, যে মিষ্টি বচন দিয়েছ তাতেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, নাও এখন পার তো এদিকে এস একবার, হাঁড়িটা দেখ, নয় তো বলো নিজে মরি-বাঁচি একরকম করে' সাঙ্গ করে' তুলি।

রামতনু কোন কথা বলিলেন না, আপন মনে খাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এই সব ব্যাপারেই সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া যাইত, রামতনুর পুত্রবধূর নিকট কোন জিনিস চাহিয়া খাইতে তাহার রাগ গলিয়া জল হইয়া যাইত, কিন্তু লোকে তাহাকে জব্দ করিতেছে বা অপমান করিবার ফন্দী খুঁজিতেছে ভাবিলে তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না, সেও কোমর বাঁধিয়া রণে আগুয়ান্ হইত। সেই বা ছাড়িবে কেন?

মাস-দুই পরে।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু বেশ গরম পড়িয়াছে। কিশোরী অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছে। বাড়ীতে যে যাহার ঘরে ঘুমাইতেছে। সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সুশীলা ঘরের মেঝেয় বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছে। কিশোরী সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে!

সুশীলা চিঠির কাগজখানা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চাপিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া একটু দুষ্টামির হাসি হাসিল, বলিল—বল্‌বো কেন?

—থাক্, না বলো, ভাত দাও। রাত কম হয়নি। আবার সকাল থেকেই খাটুনি আরম্ভ হবে।

সুশীলা ভাবিয়াছিল স্বামী আসিয়া সে কি লিখিতেছে দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিবে। প্রকৃতপক্ষে সে চিঠি কাহাকেও লিখিতেছে না, স্বামীকে কথা বলাইবার এ তার একটা পুরানো কৌশল মাত্র। অনেক দিন সে স্বামীর মুখে দুটা ভাল কথা শুনে নাই, তাহার নারী-হৃদয় ইহারই জন্য তৃষিত ছিল এবং ইহারই জন্য সে ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতেও এই সামান্য ফাঁদটি পাতিয়া বসিয়া ছিল—কিন্তু কিশোরী ফাঁদে পা দেওয়া দূরে থাকুক, সেদিকে ঘেঁসিলও না দেখিয়া সুশীলা বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কাগজ কলম তুলিয়া রাখিয়া সে স্বামীর ভাত বাড়িয়া দিল। একপ্রকার চুপচাপ অবস্থায় আহারাদি শেষ করিয়া কিশোরী গিয়া শয্যা আশ্রয় করিবার পর, সে নিজে আহারাদি করিয়া শুইতে গিয়া দেখিল কিশোরী ঘুমায় নাই, গরমে এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। আশায় বুক বাঁধিয়া সে তাহার দ্বিতীয় ফাঁদটি পাতিল।

—একটা গল্প বলো না? অনেকদিন তো বলনি, বল্‌বে লক্ষ্মীটি···

বিবাহের পর প্রথম প্রথম কিশোরী তাহার কিশোরী স্ত্রীর নিকট বটতলার আরব্য উপন্যাস হইতে নানা গল্প বলিত। রাত্রির পর রাত্রি তখন এ-সব গল্প শুনিয়া সুশীলা মুগ্ধ হইয়া যাইত। জনহীন দেশের মধ্যে যেখানে শুধু জীন-পরীদের জগৎ······খেজুর বনের মধ্যে ঠাণ্ডা-জলের ফোয়ারা হইতে মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে······পথহীন দুরন্ত মরু-প্রান্তরে মৃত্যু যেখানে শিকার সন্ধানে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, সমুদ্রের ঝড়···তরুণ শাহজাদাগণের দৈত্যসঙ্কুল অরণ্যের মাঝখান দিয়া নির্ভীক শিকারযাত্রা—এ-সব শুনিতে শুনিতে তাহার গা শিহরিয়া উঠিত, ঘুম ভাঙিলে ঘরের মধ্যে অর্দ্ধরাত্রির অন্ধকার বিকটাকার জীনদেহের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিত। প্রাচীন যুগের তরুণ শাহ্‌জাদাদের কল্পনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে সে নিজের স্বামীকেই যাত্রার দলের রাজার পোষাক পরাইয়া দূরদেশে বিপদের মুখে পাঠাইত, শাহ্‌জাদাদিগের দুঃখে তাহার নিজের স্বামীর উপর সহানুভূতিতেই তাহার চোখে জল আসিত। এই রকমে গল্প শুনিতে শুনিতে অদৃশ্য নায়ক-নায়িকাদের গুণ দৃশ্যমান গল্পকারের উপরে প্রয়োগ করিয়া

সে স্বামীকে প্রথম ভালবাসে। সে আজ পাঁচ ছয় বৎসরের কথা, কিন্তু সুশীলার এখনও সে ঘোর কাটে নাই।

কিশোরী স্ত্রীর কথা উড়াইয়া দিল—হ্যাঁ, এখন গল্প বল্‌বো! সমস্ত দিন খেটেখুটে এলাম, এখন রাত-দুপুরে বক্‌বক্ করি আর কি। তোমাদের কি? বাড়ী ব'সে সব পোষায়।

অন্য মেয়ে হইলে চুপ্ করিয়া যাইত। সুশীলার মেজাজ ছিল একগুঁয়ে। সে আবার বলিল, তা হোক্, একটা বলো, রাত এখন তো বেশী নয়……

—না বেশী নয়—তোমার তো রাত কমবেশীর জ্ঞান কত! নাও, চুপ্‌চাপ্ শুয়ে পড় এখন……

সুশীলা এইবার জিদ্ ধরিল—বলো না একটা, একটা ছোট দেখেই না হয় বলো—এত ক'রে বল্‌ছি একটা কথা রাখ্‌তে পারো না?

কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ! এ তো বড় জ্বালা হ'ল! রাতেও একটু ঘুমুবার যো নেই—সমস্তদিন তো গলাবাজীতে বাড়ী সর্‌গরম রাখ্‌বে, রাত্তিরটাও একটু শান্তি নেই?

এইটাই ছিল সুশীলার ব্যথার স্থান। স্বামীর মুখে একথা শুনিয়া সে ক্ষেপিয়া গেল—বেশ করি গলাবাজি করি, তাতে অসুবিধা হয় আমাকে পাঠিয়ে দাও এখান থেকে—রাত দুপুর করলে কে! নিজে আসবেন রাত দুপুরের সময় আড্ডা দিয়ে—কে এত রাত পর্য্যন্ত ভাত নিয়ে ব'সে থাকে? নিজেরই দেহ, পরের আর তো দেহ না! খেটেখুটে এসে একেবারে রাজা করেছেন আর কি! নিজের খাটুনিটাই কেবল……

কিশোরী ঘুমাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, স্ত্রীর উত্তরোত্তর চড়া সুরে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—উঠিয়া বসিয়া প্রথমে সে স্ত্রীর পিঠে সজোরে ঘা-কতক পাখার বাঁট বসাইল, তাহার পর তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বিছানার উপর হইতে নামাইয়া ধাক্কা মারিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল, বলিল—বেরো, ঘর থেকে বেরো আপদ—দূর হ—রাত দুপুরেও একটু শান্তি নেই—যা বেরো—যেখানে খুসি যা……

ঘরের আলোর কাছে আসিয়া কিশোরী দেখিল স্ত্রী দুই হাতের নখ দিয়া আঁচ্‌ড়াইয়া তাহার হাতের আঙুলগুলিতে রক্তপাত করিয়া দিয়াছে।

ইরাণী শাহ্‌জাদাগণের নজীর না থাকিলেও কিশোরী মধ্যে মধ্যে দুরন্ত স্ত্রীর প্রতি এরূপ ঔষধি প্রয়োগ করিত।

শেষ-রাত্রে একাদশীর জ্যোৎস্নায় চারিদিক যখন ফুলের পাপড়ির মত শাদা, ভোর রাত্রের বাতাস নেবু-ফুলের গন্ধে আর পাপিয়ার গানে মাখামাখি, সুশীলা তখন ঘরের দোরের বাহিরে আঁচল পাতিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল।

সকাল হইলে যে যার কাজে মন দিল। মোক্ষদা বলিলেন—বউমা, আজ চৌধুরীরা শিবতলায় পূজো দিতে যাবে, আমাদের যেতে বলেছে, সকাল সকাল সেরে নাও।

এই চৌধুরীটি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রামতনু মুখুয্যের প্রতিপালক, ইহারাই গ্রামের জমিদার এবং ইহাদেরই জমি-জমা-সংক্রান্ত মোকদ্দমার তদ্বির ও সাহায্য করিয়া রামতনু অন্নসংস্থান করিতেন।

বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া ভাল কাপড় পরিয়া সকলে নৌকায় উঠিল—দুই ঘণ্টার পথ। চৌধুরী-বাড়ীতে কলিকাতা হইতে একটি বৌ আসিয়াছিল। তাহার স্বামী বড়লোকের ছেলে, এম্-এ পাস করিয়া বছর-দুই হইল ডেপুটিগিরি চাকরী পাইয়াছে। বউটি কলিকাতার মেয়ে, চৌধুরীদের সহিত তাহার স্বামীর কিরূপ সম্পর্ক আছে, এজন্য চৌধুরীগৃহিণী রাসপূর্ণিমার সময় তাহাকে আনাইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সে কখনো পাড়াগাঁয়ে আসে নাই। নৌকায় খানিকটা বসিয়া থাকিবার পর বউটি দেখিল, নীলাম্বরী-কাপড় পরণে তাহারই সমবয়সী আর-একটি বউ নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল, নৌকায় সমবয়সী সঙ্গিনী পাইয়া কলিকাতার বউটি খুব সন্তুষ্ট হইলেও প্রথমে আলাপ করিতে তাহার বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। সঙ্গিনীর কাপড়চোপড় পরিবার অগোছাল ধরণ দেখিয়া বউটি বুঝিয়াছিল তাহার সঙ্গিনী নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অবস্থাও খুব ভাল নয়। নৌকার ও-ধারে চৌধুরীগৃহিণী মোক্ষদার সহিত সাবিত্রী-ব্রত প্রতিষ্ঠার কি আয়োজন করিয়াছেন তাহারই বিস্তৃত বড়মানুষী ফর্দ্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন। নৌকায় কোন পরিচিতা মেয়েও নাই, কাজেই বউটি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বউটির লেখাপড়া জানিত এবং দেশ-বিদেশের খবরাখবরও কিছু কিছু রাখিত—চৌধুরীগৃহিণীর একঘেয়ে বড়মানুষী চালের কথাবার্ত্তায় সে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, সে লক্ষ্য করিল তাহার সঙ্গিনী ঘোম্‌টার ভিতর কালো-কালো ডাগর চোখে তাহার দিকে সকৌতুকে চাহিতেছে। বউটির হাসি পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি ভাই?

সুশীলা সন্দিগ্ধস্বরে বলিল—শ্রীমতি সুশীলাসুন্দরী দেবী।

সুশীলার রকম-সকম দেখিয়া বউটির খুব হাসি পাইতে লাগিল। সে বলিল—অত ঘোম্‌টা কিসের ভাই? তুমি আর আমি ছাড়া তো আর কেউ এদিকে নেই, নাও এস, ঘোম্‌টা খোল, একটু গল্প করি।

এই কথা বলিয়া বউটি নিজেই সুশীলার ঘোম্‌টা খুলিয়া দিল—খুলিতেই সুশীলার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল; রং যদিও ততটা ফর্সা নয়, কিন্তু কালোর উপর অত শ্রী সে কখনো দেখে নাই, নদীর ধারের সরস সতেজ চিক্কণ শ্যাম কলমী-লতারই মত একটা সবুজ লাবণ্য যেন সারা মুখখানায় মাখানো। মুখখানি দেখিয়াই সে এই নিরাভরণা পাড়াগাঁয়ের মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিল—উনি ব'সে আছেন তোমার কে ভাই, শাশুড়ী?

—হ্যাঁ।

—এস, আর একটু সরে' এস ভাই, দুজনে গল্প করি আর দেখতে দেখতে যাই। তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ভাই?

সুশীলার ভয় কাটিয়া যাইতেছিল, সে বলিল—সে হ'ল শিম্‌লে।

—কোন্ শিম্‌লে? কল্‌কাতা শিম্‌লে?

কলিকাতায় শিম্‌লে আছে নাকি? কৈ তাহা তো সুশীলা কোনদিন শোনে নাই। সে বলিল—আমার বাপের বাড়ী এখান থেকে বেশী দূর নয়, পাঁচ ছ' কোশ পথ, গরুর গাড়ী ক'রে যেতে হয়।

নদীর ধারে যবক্ষেত, সর্ষেক্ষেত, বুনো গাছপালা দেখিয়া বউটি খুব খুসি। এ-সব সে পূর্ব্বে বড় দেখে নাই, আঙুল দিয়া একটা মাছরাঙা পাখী দেখাইয়া বলিল—বাঃ, বড় সুন্দর তো! ওটা কি পাখী ভাই?

—ওটা তো মাছরাঙা পাখী, কেন তুমি দেখনি কখনো?

বউটি বলিল—ভাই, আমি কল্‌কাতার বাইরে অ্যাদ্দিন পা দিইনি, খুব ছেলেবেলায় একবার বাবার সঙ্গে চন্দননগরে বাগান-বাড়ীতে যাবার কথা মনে আছে, তারপর এই আস্‌ছি—তুমি আমায় একটু দেখিয়ে নিয়ে চল। ওটা কিসের ক্ষেত ভাই?

সুশীলা দেখিল তাহার সঙ্গিনী আঙুল দিয়া নদীর ধারের একটা মৌরীর ক্ষেত দেখাইতেছে—প্রথমটা সে সঙ্গিনীর চোখ-ঝল্‌সানো রং, অদৃষ্টপূর্ব্ব দামী সিল্কের শাড়ী, ব্লাউজ এবং চিক্‌চিকে নেক্‌লেসের বাহার দেখিয়া যে ভয় অনুভব করিতেছিল, তাহার অজ্ঞতা দেখিয়া সুশীলার সে ভয় কাটিয়া অজ্ঞ সঙ্গিনীর

উপর একটু স্নেহ আসিল—কলিকাতায় মাছরাঙা পাখী, মৌরীক্ষেত, এ-সব সামান্য জিনিষও নাই নাকি? সুশীলা হাসিয়া বলিল—তুমি ফুলের গন্ধ দেখে বুঝতে পার না ভাই? ও তো মৌরীর ক্ষেত। কেন, আমাদের বাপের বাড়ীর গাঁয়ে কত তো মৌরীর ক্ষেত আছে—মৌরীর শাক কখনো খাওনি? কল্‌কাতায় বুঝি নেই?

কলিকাতার বৌটি বুঝাইয়া দিল যে কলিকাতার অতীত ইতিহাসের সে খবর রাখে না, বর্ত্তমান অবস্থায় সেখানে মৌরীক্ষেত প্রভৃতি থাকা সম্ভব নয় তবে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন নৌকা শিবতলার ঘাটে গিয়া লাগিল, তখন তাহাদের দুজনের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে। সঙ্গিনীর মুখে স্বামীর আদরের গল্প শুনিয়া সুশীলার মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা জাগিয়া উঠিল—সেটা সে অনবরত চাপিবার চেষ্টা করে, তবু কি জানি কেন সেটা ফাঁক পাইলেই মাথা তোলে! প্রথম বিবাহের পর তাহার স্বামীও তো তাহাকে কত আদর করিত, রাত্রে ঘুমাইতে না দিয়া নানা গল্পে ভুলাইয়া জাগাইয়া রাখিত, সুশীলা পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত সাধ্যসাধনা করিয়া পান মুখে তুলিয়া দিত—সেই স্বামী তাহার কেন এমন হইল। তাহার বুকটার মধ্যে কেমন হু হু করিয়া উঠিল।

দুজনে তাহারা খানিকক্ষণ গাছের ছায়ায় নদীর ধারে এদিক্ ওদিক্ বেড়াইল, কি সুন্দর দেখায় চারিদিক্!…নীল আকাশ সবুজ মাঠের উপর কেমন উপুড় হইয়া আছে!…ওমা, পানকৌড়ির ঝাঁক চরের উপর বসিয়া বসিয়া কেমন ঝিমায়!…

কলিকাতার বউটি বলিল—এস ভাই, আমরা একটা কিছু পাতাই। কেমন?

সুশীলা খুসি হইয়া বলিল—খুব ভাল ভাই, কি পাতাব বলো …

—এক কাজ করি এস—আস্‌তে আস্‌তে নদীর ধারে যে মৌরীফুল দেখে এলাম, এস আমরা দুজনে মৌরীফুল পাতাই। কেমন?

সুশীলা আহ্লাদের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। নদী হইতে অঞ্জলি করিয়া জল তুলিয়া তাহারা মৌরীফুল পাতাইল।

এমন সময় মোক্ষদা ডাকিলেন—বউমারা এদিকে এস।

তাহারা গিয়া দেখিল গাছতলায় অনেক লোক—সেদিন পূজা দিতে

অনেক লোক আসিয়াছিল। প্রকাণ্ড বটগাছ, তাহার তলায় ভাঙা ইটের মন্দির। গাছতলা হইতে একটু দূরে এক বুড়ী নানা ঔষধ বিক্রয় করিতেছে। সুশীলা ও তাহার সঙ্গিনী সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, রোগ সারা, ছেলে হওয়া হইতে সুরু করিয়া সকল রকমের ঔষধই আছে, গরু হারাইলে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর্য্যন্ত। মেয়েরা সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ঔষধ কিনিতেছে। সুশীলার সঙ্গিনী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে সেখান হইতে মন্দিরের দিকে লইয়া চলিল, বলিল—চলো মৌরীফুল, দেখিগে কেমন পূজো হচ্চে।

একটুখানি মন্দিরে দাঁড়াইয়া সুশীলা একটা ছুতায় সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঔষধ-বেচা বুড়ীর নিকট দাঁড়াইল। সেখানে তখন কেহ ছিল না, বুড়ী বলিল—কি চাই?

সুশীলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

বুড়ী বলিল—আর বল্‌তে হবে না মা-ঠাক্‌রুণ। তা তোমার তো এখনও ছেলে-পিলে হবার বয়েস যায়নি, ও-বয়েসে অনেকের...

সুশীলা সলজ্জভাবে বলিল—তা নয়।

বুড়ী বলিল—এবার বুঝলাম মা-ঠাক্‌রুণ—তা যদি হয়, তা হ'লে তোমার সোয়ামীর বার-মুখো টান আছে। একটা ঔষধ দিই, নিয়ে যাও, এক মাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে—ও-রকম কত হয় মা-ঠাক্‌রুণ...

বুড়ী একটা শিকড় তুলিয়া বলিল—এই নাও, বেটে খাইয়ে দিও। কেউ যেন টের না পায়, টের পেলে হবে না। আট আনা লাগবে।

স্বামীর বার-মুখো টান আছে—একথা শুনিয়া সুশীলা খুব দমিয়া গেল। তাহার আঁচলে একটা আধুলি ছিল, আজকার দিনে জিনিষটা-আস্‌টা কিনিবার জন্য সে ইহা বাড়ী হইতে শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিয়াছিল। বাড়ীর বার হওয়া তো বড় ঘটে না, কাজেই এটা তাহার পক্ষে একটা উৎসবের দিন। আধুলিটি শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিবার কারণ—মোক্ষদা ঠাক্‌রুণ জানিতে পারিলে ইহা এতক্ষণ আঁচলে থাকিত না। সুশীলা আঁচল হইতে আধুলিটি খুলিয়া বুড়ীকে দিল এবং খাওয়াইবার প্রণালী জানিয়া লইয়া শিকড়টি কাপড়ের মধ্যে গোপনে বাঁধিয়া লইল।

পূজা দেওয়া সাঙ্গ হইয়া গেল। সকলে আবার আসিয়া নৌকায় উঠিল।

গ্রামের ঘাটের কাছাকাছি আসিলে সুশীলা বলিল—ভাই, তুমি এখন দিনকতক আছ তো?

—না ভাই, আমি কাল কি পরশু চ'লে যাব। তা হ'লেও তোমায় ভুলবো না মৌরীফুল, তোমার মুখখানি আমার মনে থাক্‌বে ভাই—চিঠি-পত্র দেবে তো? এবার পাড়াগাঁয়ে এসে তোমায় কুড়িয়ে পেলাম—তোমায় কখনো ভুলবো না।

সুশীলার চোখে জল আসিল, এত মিষ্ট কথা তাহাকে কে বলে? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে দুষ্ট, একগুঁয়ে, ঝগ্‌ড়াটে।

তাহার হাতে একটি সোণার আংটি ছিল, ইহা তাহার মায়ের দেওয়া আংটি, বিবাহের পর প্রথম তাহার মা তাহার হাতে এটি পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেটি হাত হইতে খুলিয়া সে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিল—দেখি ভাই তোমার আঙুল, তুমি হ'লে মৌরীফুল, তোমায় খাওয়াবার কথা, কাপড় দেওয়ার কথা—এই আংটিটা আমার মায়ের দেওয়া, তোমায় দিলাম, তবু এটা দেখে তুমি গরীব মৌরীফুলকে ভুলে যাবে না।

সুশীলা আংটিটা সঙ্গিনীর হাতে পরাইয়া দিতে গেল,—বউটি চট্ করিয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিল—দূর পাগল! না ভাই, এ রাখো—তোমার মায়ের দেওয়া আংটি—এ কেন আমায় দিতে যাবে? না ভাই...

সুশীলা জোর করিতে গেল—হোক্ ভাই, দেখি—মায়ের দেওয়া বলে ই

বউটি বলিল—দূর! না ভাই, ওসব রাখো—সে বরং...

সুশীলা খুব হতাশ হইল। মুখটি তাহার অন্ধকার হইয়া গেল—সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিল। বউটি সুশীলার হাত ধরিয়া বলিল—পায়ে পড়ি ভাই মৌরীফুল, রাগ কোরো না। আচ্ছা, কেন তুমি শুধু শুধু তোমার মায়ের দেওয়া আংটি আমায় দিতে যাবে ভাই? আচ্ছা তুমি যদি দিতে চাও এই পূজোর সময় আস্‌বো—অন্য কিছু বরং দিও—একদিন না হয় খাইয়ো—আংটি কেন দেবে ভাই!—আর আমায় ভুল্‌বে না তো ভাই?

সুশীলা ব্যগ্রভাবে বলিল—তোমায় ভুল্‌বো ভাই মৌরীফুল? কখখোনো না—তুমি কোন্ জন্মে যে আমার মায়ের পেটের বোন্ ছিলে ভাই মৌরীফুল...

তাহার পরে সে একটু আনাড়ি ধরণে হাসিয়া উঠিল—হিঃ হিঃ হিঃ! কেমন সুন্দর কথাটি—মৌরীফুল—মৌরীফুল—মৌরীফুল—তুমি যে হ'লে গিয়ে আমার নদীর ধারের মৌরীফুল—তোমায় কি ভুল্‌তে পারি?...

কথা শেষ না করিয়াই সে দুই হাতে সঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কালো চোখদুটি জলে ভরিয়া গেল।

কলিকাতার বউ এই অদ্ভুত প্রকৃতি সঙ্গিনীর অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানা বার বার সস্নেহে চুম্বন করিল—তারপর দুজনেই চোখের জলে ঝাপসাদৃষ্টি লইয়া দুজনের কাছে বিদায় লইল।...

দিন কতক কাটিয়া গেল। কিশোরী বাটী নাই, কি-একটা কাজে অন্য গ্রামে গিয়াছে, ফিরিতে দু'একদিন দেরী হইবে। মোক্ষদা সকালে উঠিয়া জমিদার-গৃহিণীর আহ্বানে তাঁহার সাবিত্রী-ব্রত-প্রতিষ্ঠার আয়োজনে সাহায্য করিতে চৌধুরী-বাড়ী চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—বউমা আমার ফেরবার কোনো ঠিক নেই, রান্না-বান্না ক'রে রেখো, আমি আজ আর কিছু দেখতে পারব না, চৌধুরী-বাড়ীর কাজ—কখন মেটে বলা যায় না।

একথা মোক্ষদার না বলিলেও চলিত। কারণ ভোরে উঠিয়া বাসন-মাজা, জল-তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া এ সংসারের সমস্ত কাজের ভারই ছিল সুশীলার উপর। এ সংসারে কিশোরীর বিবাহের পর কোনো দিন ঝি-চাকর প্রবেশ করে নাই—যদিও পূর্ব্বে বাড়ীতে বরাবরই একজন করিয়া ঝি থাকিত। সুশীলার খাটুনিতে কোন ক্লান্তি ছিল না, খাটিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট ছিল—যখন মেজাজ ভাল থাকিত, তখন সমস্ত দিন নীরবে ভূতের মত খাটিয়াও সে বিরক্ত হইত না।

শাশুড়ী চলিয়া গেলে অন্যান্য কাজকর্ম্ম সারিয়া সুশীলা রান্নাঘরে গিয়া দেখিল একখানিও কাঠ নাই। কাঠ অনেক দিনই ফুরাইয়া গিয়াছে, এ-কথা সুশীলা বহুবার শ্বশুরকে জানাইয়াছে। রামতনু মধ্যে মধ্যে মজুর ডাকাইয়া কাঠ কাটাইয়া লইতেন, এবার কিন্তু অনেক দিন হইল তিনি আর এদিকে দৃষ্টি দেন নাই। কিশোরীর দোষ নাই, কেননা সে বড় একটা বাড়ীতে থাকিত না, সংসারের সংবাদ তেমন রাখিতও না। আসল কথা হইতেছে এই যে রান্নাঘরের পিছনে খিড়কীর বাহিরে অনেক শুক্‌না বাঁশ ও ডালপালা পড়িয়া আছে—সুশীলা রান্না চড়ানোর পূর্ব্বে বা রান্না করিতে করিতে প্রয়োজন মত এগুলি দা দিয়া কাটিয়া লইয়া কাজ চালাইত। রামতনু দেখিলেন, কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন কেন অনর্থক কাঠ কাটিবার লোক ডাকিয়া আনা—আনিলেই একটা টাকা খরচ তো? পুত্রবধূ বকিতেছে বকুক্, কারণ বকুনিই উহার স্বভাব।

কাঠ নাই দেখিয়া সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া গেল। এদিকে বাড়ীতেও এমন কেহ নাই যাহাকে বকিয়া গায়ের ঝাল মিটায়, কাজেই সে আপন মনে চীৎকার করিতে লাগিল—পারবো না, রোজ রোজ এমন ক'রে সংসার করা আমায় দিয়ে হয়ে উঠবে না—আজ দুমাস ধ'রে বলচি কাঠ নেই—এদিকে রান্নার বেলা ঠিক আছেন সব, তার একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই—কি দিয়ে রাঁধবে? হাত পা উনুনের মধ্যে দিয়ে রাঁধবে নাকি? রোজ রোজ কাঠ কাটো, কেটে রাঁধো—অত সুখে আর কাজ নেই—থাক্‌লো হাঁড়ী প'ড়ে, যিনি যখন আসবেন, তিনি তখন ক'রে নেবেন...

রাঁধিবার কোন আয়োজন সে করিল না। খানিকটা বসিয়া বসিয়া তাহার মনে হইল ততক্ষণ মশলাগুলা বাটিয়া রাখা যাক্। সে মাঝে মাঝে কাজের সুবিধার জন্য কয়েকদিনের মশলা একসঙ্গে বাটিয়া রাখিত।

বেলা প্রায় দশটার সময় একটি অল্পবয়সী ফুটফুটে বউ, পরণে একখানা পুরাণো চেলীর কাপড়, হাতে থাকিবার মধ্যে দুগাছি শাঁখা—একটি বাটি হাতে রান্নাঘরের দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিয়া বলিল—দিদি আছ নাকি?

সুশীলা মশলা বাটিতে বাটিতে মুখ তুলিয়া বলিল—আয় আয় ছোট বউ—আয় না ঘরের মধ্যে—ঠাক্‌রুণ নেই...

বউটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—একি দিদি, এত বেলা হ'ল, এখনও রান্না চড়াওনি যে!

সুশীলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—রান্না চড়াব! হাঁড়ি-কুড়ি ভেঙে ফেলিনি এই কত!......

বউটির চোখে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, সে বলিল—না দিদি, ও-সব কিছু কোরো না, ভাত চড়িয়ে দাও লক্ষীটি, নইলে জান তো কি রকম লোক সব......

—দেব—দেখবে সব আজ কি রকম মজা, রোজ রোজ কাঠ কাটবো আর ভাত রাঁধবো, উঃ!

—কাঠ নেই বুঝি? আচ্ছা, দাখানা দাও দিদি, আমি দিচ্চি কেটে।

—তোর কি দায় তুই দিতে যাবি? বোস্ ঠাণ্ডা হয়ে—যাদের গরজ আছে তারা নিজেরা বুঝুক গিয়ে...

—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, দাও রান্নাটা চড়িয়ে, জান তো ওরা...

—তুই বোস্ দেখি ওখানে চুপ ক'রে, দেখিস্ এখন মজা—আজ দু'মাস ধ'রে রোজ বল্‌চি কাঠ নেই, কথা কানে যায় না কারুর—আজ মজাটি দেখাবো···

সুশীলার একগুঁয়েমিতে বউটি কিছু ভীত হইল, কারণ মজা কোন্ পক্ষ দেখিবে এ সম্বন্ধে তাহার একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে না পারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

এই বউটি রামতনু মুখুয্যের জ্যাঠতুত ভাই রামলোচন মুখুয্যের পুত্রবধূ। পাশেই এদের বাড়ী। রামলোচনের অবস্থা খুবই খারাপ—তা সত্বেও তিনি বছর দুই হইল ছেলের বিবাহ দিয়াছেন—রামলোচনের স্ত্রী ছিল না, পুত্রবধূই গৃহিণী। দুরবস্থার সংসারে ছেলেমানুষ বউকে সংসার করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে-অসময়ে বাটি হাতে খুঁচি হাতে এ বাড়ীতে হাত পাতিয়া তেলটা নুনটা লইয়া যাইত, চাউল না থাকিলে আঁচলে করিয়া চাউল লইয়া যাইত—ধার বলিয়াই লইয়া যাইত—কখনও শোধ করিতে পারিত, কখনও পারিত না।

মোক্ষদা ঠাকরুণকে বউটি বড় ভয় করে—তিনি থাকিলে জিনিষপত্র তো দেনই না, যদি বা দেন তাহা বহু মিষ্ট বাক্যবর্ষণ করিবার পর। তবু বউটির আসিতে হয়, কি করিবে, অভাব। সুশীলা তাহাকে মোক্ষদা ঠাক্‌রুণের হাত হইতে বাঁচাইয়া গোপনে এটা ওটা যখন যাহা দরকার সাধ্যমত সাহায্য করিত। সামান্য একবাটি তেল লইয়া গেলেও হুঁসিয়ার মোক্ষদা ঠাকরুণ তাহা কখনও ভুলিতেন না—গলা-টিপিয়া কড়া-ক্রান্তিতে তাহা আদায় করিয়া ছাড়িতেন। সুশীলা ছিল অগোছালো ও অন্যমনস্ক-ধরণের মানুষ, সে ধার দিয়া অত-শত মনেও রাখিত না, বা সামান্য তেল নুন ধার দিয়া আদায় করিবার কোন চেষ্টাও করিত না—শোধ দিতে আসিলে অনেক সময় বলিত—ওই তুই আবার দিতে এলি কেন ভাই ছোট বউ, ওর আবার নেব কি? যা, ও তুই নিয়ে যা ভাই।

সুশীলা আপন মনে খানিকক্ষণ বকিয়া বউটির দিকে চাহিয়া বলিল—তারপর, তোর রান্নাবান্না?

বউটি বাটিটা আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, বাহির করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল—সেদিনকার সেই তেল নিয়ে গিয়েছিলাম দিদি, তা আমাদের এখনও

আনা হয় নি। আজ রাঁধ্‌বার তেল নেই—একসঙ্গে দুদিনের দিয়ে যাবো—সেইজন্যে...

সুশীলা বলিল—আচ্ছা, নিয়ে আয় দেখি বাটি। দেখি কি আছে, আমাদেরও বুঝি তেল আনা হয় নি।

পাত্রে যতটুকু তেল ছিল সুশীলা সবটুকু এই কুণ্ঠিতা দরিদ্রা গৃহলক্ষ্মীটিকে ঢালিয়া দিল। বউটি চলিয়া যাইবার সময় মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—লক্ষ্মী দিদি, দাও রান্না চড়িয়ে...

সুশীলা বলিল—তুই পালা দেখি—আমি ওদের মজা না দেখিয়ে আজ আর কিছুতেই ছাড়্‌চি নে...

বেলা বারোটার সময় মোক্ষদা ঠাকুরুণ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া হৈ-চৈ বাধাইয়া দিলেন। প্রকৃতই ইহাতে রাগ হইবার কথা। একটু পরে রামতনু আসিলেন, তিনি ব্যাপার দেখিয়া দালানে গিয়া আপন মনে তামাক টানিতে সুরু করিলেন। ঝগড়া ক্রমে খুব চাগাইয়া উঠিল, মোক্ষদা উচ্চৈঃস্বরে সুশীলার কুলজী গাহিতে লাগিলেন।—সুশীলাও যে খুব শান্তশিষ্ট, এ অপবাদ তাহাকে শত্রুতেও দিতে পারিত না, কাজেই ব্যাপার যখন খুব বাধিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে কিশোরী আসিয়া হাজির হইল—যদিও আজ তাহার ফিরিবার কথা ছিল না, তবুও কাজ মিটিয়া যাওয়াতে সে আর সেখানে অপেক্ষা করে নাই। মোক্ষদা ছেলেকে পাইয়া হাঁকডাক আরও বাড়াইয়া দিলেন। কিশোরী এত বেলায় বাড়ী আসিয়া এ অশান্তির মধ্যে পড়িয়া অত্যন্ত চটিয়া গেল—তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল স্ত্রীর উপর। হাতের গোড়ায় একখানা শুক্‌নো চেলা-কাঠ পড়িয়া ছিল, সেইটা লইয়াই লাফাইয়া সে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিল। সুশীলা তখনও বসিয়া বাট্‌না বাটিতেছিল—স্বামীকে শুক্‌না কাঠ হাতে লইয়া বীরদর্পে রান্নাঘরে লাফাইয়া উঠিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল—আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হাত দুটা তুলিয়া নিজের দেহটা আড়াল করিবার চেষ্টা করিল—কিশোরী প্রথমতঃ স্ত্রীর খোঁপা ধরিয়া এক হেঁচ্‌কা টান দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, তার পর তাহার পিঠে কয়েক ঘা চেলা-কাঠের বাড়ি মারিয়া তাহার গলা ধরিয়া প্রথমে এক ধাক্কা মারিল রান্নাঘরের দাওয়ায় এবং তথা হইতে এক ধাক্কা দিল উঠানে। ধাক্কার বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া সুশীলা মুখ থুব্‌ড়িয়া উঠানে পড়িয়া গেল—মার আরও চলিত, কিন্তু

রামতনু তামাক খাইতে খাইতে ছেলের কাণ্ড দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িলেন।

পাশের বাড়ীর বউটি তখন শ্বশুর ও স্বামীকে খাওয়াইয়া সবে নিজে খাইতে বসিতেছিল, হঠাৎ এ-বাড়ীর মধ্যে মারের শব্দ শুনিয়া সে খাওয়া ফেলিয়া সুশীলাদের খিড়কীতে ছুটিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল—সুশীলা উঠানে দাঁড়াইয়া আছে ; সর্ব্বাঙ্গে ধূলা, বাট্‌নার পাত্রের উপর পড়িয়া গিয়াছিল, কাপড়ে চোপড়ে হলুদের ছোপ ; মাথার খোঁপা একধারে খুলিয়া কতক চুল মুখের উপর কতক পিঠের উপর পড়িয়াছে , গাঙ্গুলী-বাড়ী হইতে দুটো ছেলে ব্যাপার দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে, আরও দু-একজন পাড়ার মেয়ে সাম্‌নের দরজা দিয়া উঁকি মারিতেছে—ওদিকে পাঁচিলের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহার নিজের শ্বশুর রামলোচন মজা দেখিতেছেন।

চারিদিকের কৌতূহলদৃষ্টির মাঝখানে, সর্ব্বাঙ্গে হলুদের ছোপ ও ধূলিমাখা বিস্রস্তকুন্তলা, অপমানিতা দিদিকে অসহায়ভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কি-রকম করিয়া উঠিল—কিন্তু সে একে ছেলেমানুষ তাহাতে অত্যন্ত লজ্জাশীলা, শ্বশুর ভাসুর এবং এক-উঠান লোকের মধ্যে বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে না পারিয়া প্রথমটা সে খিড়কীর বাহিরে আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল, গাঙ্গুলী-বাড়ীর প্রৌঢ় গাঙ্গুলী মহাশয়ও যখন হুঁকা হাতে—কি হে রামতনু, বলি ব্যাপারখানা কি শুনি—বলিয়া বাড়ীর মধ্যের উঠানে আসিয়া হাজির হইলেন, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সুশীলার হাত ধরিয়া খিড়কী-দোর দিয়া বাহিরে লইয়া গিয়াই হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—কেন ও-রকম করতে গেলে দিদিমণি, লক্ষ্মীটি, তখনই যে বারণ করলাম ?

তার পরদিন দুপুরবেলা সুশীলা রান্নাঘরে রাঁধিতেছিল। কিশোরী খাইতে বসিয়াছে, মোক্ষদা ঠাক্‌রুণ কি প্রয়োজনে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সুশীলা পিছনে ফিরিয়া ভাত বাড়িতে বাড়িতে স্বামীর ডালের বাটিতে কি গুলিতেছে, পাশে একটা ছোট বাটি। মোক্ষদার কি-রকম সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা, তোমার বাটিতে কি ? কি মেশাচ্ছ ডালের বাটিতে ?

সুশীলা পিছন ফিরিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া মোক্ষদার সন্দেহ আরও বাড়িল--তিনি বাটিটা হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন তাহাতে সবুজ মত কি একটা বাটা।

তিনি কড়াসুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বেটেছ এতে ?

তিনি দেখিলেন পুত্রবধূ উত্তর দিতে পারিতেছে না, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল। মোক্ষদা ঠাক্‌রুণ বাটি হাতে—ওমা কি সর্ব্বনাশ! আর একটু হ'লেই হয়েছিল গো,—বলিয়া উঠানে আসিয়া চীৎকার করিয়া হাট বাধাইলেন।

কিশোরী দালান হইতে উঠিয়া আসিল, রামতনু আসিলেন, গাঙ্গুলী-বাড়ীর মেয়েপুরুষ আসিল, আরও অনেকে আসিল।

মোক্ষদা সকলের সামনে সেই বাটিটা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—ত্মাখো তোমরা সকলে, তোমরা ভাব শাশুড়ী-মাগী বড় দুষ্টু—নিজের চোখে দেখে নাও ব্যাপার, কি সর্ব্বনাশ হয়ে যেত এখনি, যদি আমি না দেখতাম—দোহাই বাবা তারকনাথ, কি ঠেকানই আজ ঠেকিয়েছ···

এক-উঠান লোক—সকলেই শুনিল রামতনুর দুরন্ত পুত্রবধূ স্বামীর ভাতে বিষ না কি মিশাইয়া খাওয়াইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। কেউ অবাক্ হইয়া গেল, কেউ মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—ও-সব আমরা অনেককাল জানি, আমরা রীত্ দেখলেই মানুষ চিনি, তবে পাড়ার মধ্যে ব'লে এতদিন······

কে একজন বলিল—জিনিসটা কি তা দেখা হয়েছে ?······

মোক্ষদা ঠাক্‌রুণের গাল-বাদ্যের রবে সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।

গাঙ্গুলী মহাশয় রামতনুকে বলিলেন—গুরু রক্ষা করেছেন! এখন যত শীগ্‌গির বিদেয় কর্‌তে পার তার চেষ্টা করো, শাস্ত্রে বলে, দুষ্টা ভার্য্যে! আর একদিনও এখানে রেখো না।

সমস্ত দিন পরামর্শ চলিল।

সন্ধ্যার সময় ঠিক হইল কাল সকালেই গাড়ী ডাকিয়া আপদ্ বিদায় করা হইবে, আর একদিনও এখানে না, কি জানি কখন কি বিপদ ঘটাইবে। বিশেষতঃ পাড়ার মধ্যে ও-রকম দজ্জাল বউ থাকিলে পাড়ার অন্য অন্য বউঝিও দেখাদেখি ঐরকমই হইয়া উঠিবে।

সেদিন রাত্রে সুশীলাকে অন্য একঘরে শুইতে দেওয়া হইল—ইহা মোক্ষদা ঠাকরুণের বন্দোবস্ত—কাল সকালেই যখন যেখানকার আপদ্ সেখানে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে, তখন আর তাহার সঙ্গে সম্পর্ক কিসের ?

রাত্রে শুইয়া শুইয়া কত রাত পর্য্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না। ঘরের

জানালা সব খোলা, বাহিরের জ্যোৎস্না ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে কাল ও আজ এই দুইদিন অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে—সে স্বভাবত নির্ব্বোধ, লাঞ্ছনা ভোগের অপমান সে ইহার পূর্ব্বে কখনও তেমন করিয়া অনুভব করে নাই, যদিও মারধর ইহার পূর্ব্বে বহুবার খাইয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে আজ ও কালকার দিনের মত শ্বশুরশাশুরী ও এক-উঠান লোকের সাম্‌নে এ-ভাবে অপমানিতাও সে কোনদিন হয় নাই। তাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চোখের জল বাঁধ মানিতেছে না—কাল মার খাইয়া পিঠ কাটিয়া গিয়াছে ও হাত দিয়া ঠেকাইতে গিয়া হাতের কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গিয়া হাতও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহার সেই স্বামী, যে স্বামী পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে এমন সব রাতে তাহাকে সমস্ত রাত ঘুমাইতে দিত না, সে পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত ভুলাইয়া পান মুখে গুঁজিয়া দিত—সেই স্বামী এরূপ করিল ?

পান খাওয়ানোর কথাটিই সুশীলার বার-বার মনে আসিতে লাগিল। রাত্রের জ্যোৎস্না ক্রমে আরো ফুটিল। তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি-পাতা-ওঠা গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসন্ত-মধ্যাহ্ন ধোঁয়া ধোঁয়া রৌদ্রের উত্তরীয় উড়াইয়া বেড়ায়......দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি প্রস্ফুট-প্রসূন-সুরভির মধ্য দিয়া চলিয়া চলিয়া নদীর ধারের শিমুলতলায় সন্ধ্যার ছায়ার কোলে গিয়া ঢলিয়া পড়ে......পাড়াগাঁয়ের আমবনে বাঁশবনে জ্যোৎস্না-ঝরা বাতাসে সারারাত কত কি পাখীর আনন্দ-কাকলী......বসন্ত-লক্ষ্মীর প্রথম প্রহরের আরতির শেষে বনের গাছপালা তখন আবার নূতন করিয়া টাট্‌কা ফুলের ডালি সাজাইতেছে।......

শুইয়া শুইয়া সুশীলা ভাবিল, জগতে কেউ তাহাকে ভালবাসে না—কেবল ভালবাসে তাহার মৌরীফুল। মৌরীফুল পত্র লিখিয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া সে রোজ রাত্রে কাঁদে, তাহাকে না দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার কষ্ট হইতেছে। সত্যই যদি কেউ তাহাকে ভালবাসে তো সে ওই মৌরীফুল—আর ভালবাসে ওই ছোট-বউটা। আহা, ছোট-বউএর বড় কষ্ট! ভগবান্ দিন দিলে সে ছোট-বউএর দুঃখ ঘুচাইবে।......কিন্তু স্বামী যে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছে ? ও কিছু না, অভাবে পড়িয়া উহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে, নহিলে সেও কি এমন ছিল ? মৌরীফুলের বর তো কত জায়গায় বেড়ায়, মৌরীফুলকে একখানা পত্র লিখিয়া দেখিলে হয়, যদি উহার কোন চাকরী করিয়া দিতে পারে। চাকরী হইলে সে আর তার স্বামী একটা

আলাদা বাসায় থাকিবে, আর কেহই সেখানে থাকিবে না, মাঠের ধারের ছোট ঘরখানি সে মনের মত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে, উঠানে কুমড়ার মাচা বাঁধিবে, বাজার-খরচ কমিয়া যাইবে। লোকে বলে সে গোছালো নয়, একবার বাসায় যাইলে সে দেখাইয়া দিবে যে সে গোছালো কি না। আচ্ছা, ওই বাড়ীখানায় যদি আগুন লাগে! না—আগুন দিবে কে? ছোট-বউ! উঁহুঁ, দিলে তাহার শাশুড়ী ঠাকরুণই দিবে, যে রকম লোক!

জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নায় ও-গুলো কি ভাসিতেছে? সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎস্না-রাতে পরীরা সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো?......তাহার বিবাহের রাত্রে কেমন বাঁশী বাজিয়াছিল, কেমন সুন্দর বাঁশী, ও-রকম বাঁশী নদীর ধারে কত পড়িয়া থাকে......আচ্ছা পিওনে মৌরী-ফুলের একখানা চিঠি দিয়া গেল না কেন? লাল চৌকা খাম, খুব বড়, সোনার জল দেওয়া, আতর না কি মাখান......

পরদিন সকাল বেলা পুত্রবধূর উঠিবার দেরী হইতে লাগিল দেখিয়া মোক্ষদা ঠাকৃরুণ ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, পুত্রবধূ জ্বরের ঘোরে অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়িয়া আছে, চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল।......

সেদিন সমস্ত রাত একভাবেই কাটিয়া গেল, তাহার দিকে কেহ নজর করিল না, তার পরদিন বেগতিক বুঝিয়া রামতনু ডাক্তার আনিলেন। দুপুরের পর হইতে জ্বরের ঘোরে সে ভুল বকিতে লাগিল—সত্যি মৌরীফুল তা নয়, ওরা যা বল্‌ছে—আমি অন্য ভেবে......

সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে সে মারা গেল।

তাহার মৃত্যুতে গাঙ্গুলী-পাড়ার হাড় জুড়াইয়া গেল, পাড়ার কাক-চিলগুলাও একটু সুস্থির হইল। কিছুদিন পরেই কিশোরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মেঘলতা ঘরে আসিল। দেখিলে চোখ জুড়ায় এমন সুন্দর মেয়ে, কর্ম্মপটু, হুঁসিয়ার, গোছালো। দ্বিতীয়বার বিবাহের অল্পদিন পরেই যখন কিশোরী পালেদের ষ্টেটে ভাল চাকরীটা পাইল তখন নূতন বউএর লক্ষ্মীভাগ্য দেখিয়া সকলেই খুব খুসি হইল।

সংসারের অলক্ষ্মীস্বরূপা আগের পক্ষের বউএর নাম সে সংসারে আর কোনদিন কেহ করে নাই।

ক্যান্‌ভাসার কৃষ্ণলাল

চাকুরী গেল। এত করিয়াও কৃষ্ণলাল চাকুরী রাখিতে পারিল না। সকাল হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত (ডাউন খুলনা প্যাসেঞ্জার, ১০-৪৫ কলিকাতা টাইম) টিনের সুটকেস্ হাতে শিয়ালদ' হইতে বারাসত এবং বারাসত হইতে শিয়ালদ' পর্য্যন্ত 'তাঁতের মাকু'র মত যাতায়াত করিয়া ও ক্রমাগত "দত্তপুকুরের বাতের তেল, দত্তপুকুরের বাতের তেল—বাত, বেদনা, ফ্‌লো, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, দাঁত কনকনানি, এক কথায় যত রকম ব্যথা, শূলানি, কামড়ানো আছে সব এক নিমেষে চলে যাবে—আজ চব্বিশ বছর এই লাইনে ওষুধটি প্রত্যেক ভদ্রলোক ব্যবহার করচেন, সকলেই এর গুণ জানেন—" বলিয়া চীৎকার করিয়াও চাকুরী রাখা গেল না।

সেদিন বসু মহাশয় (ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু) কৃষ্ণলালকে ডাক দিয়া বলিলেন—পাল মশায়, কাল রাত্রের ক্যাশ জমা দেননি কেন?

—আজ্ঞে, আজ্ঞে—অনেক রাত হয়ে গেল—খুলনা ট্রেন—প্রায় বিশ মিনিট লেট্।

—দেখুন, আগেও আমি অন্তত সতেরো বার আপনাকে সাবধান করে দিয়েচি। খুলনা ট্রেন দশটা একুশে স্টেশনে আসে। আমি সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত আফিসে বসে ছিলাম শুধু আপনার জন্যে। নিতাই দু'বার স্টেশনে দেখে এল ট্রেন রাইট-টাইমে এসেচে। লেট এক মিনিটও ছিল না—

—আজ্ঞে বড়বাবু, শরীরটা কাল বড়ই—

—ও আপনার পুরোনো কথা। ও কথা আর শুনবো না আজ। যাক, ক্যাশ এনেচেন এখন?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিল। বলিল—ক্যাশটা আনিগে যাই—না—একটু মুস্কিল হয়েছে, আচ্ছা আসি—

—যান আসুন—

কৃষ্ণ তবুও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া নৃত্যগোপালবাবু বলিলেন—কি হ'ল!

—আজ্ঞে ওবেলা দেবো ওটা। বাসায় এনে রেখেছিলাম, চাবি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েচে, আমি যার সঙ্গে থাকি।

—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—একটু বেড়াতে বার হয়েছিলাম ওই গোলদীঘির দিকে—

—সব বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করিনে। কেন করিনে তাও আপনি জানেন। রাত দশটার পরেই ক্যাশ এনে দেওয়ার কথা—আপনি বুড়ো হয়ে গেলেন এই ক্যান্‌ভাসারের কাজ ক'রে। জানেন না যে ক্যাশ তখুনি জমা দেওয়ার নিয়ম আছে?

— আজ্ঞে, আজ্ঞে—

—এ রকম আরও কতবার হয়েছে বলুন দিকি? আপনার কথার ওপর বিশ্বাস করা যায় না আর। বড়ই দুঃখের কথা। আপনি আমাদের পুরোনো ক্যান্‌ভাসার ব'লে আপনার অনেক দোষ সহ্য করেছি আমরা। কিন্তু এবার আর নয়। আপনি এ মাসের এই ক'দিনের মাইনে নিয়ে যাবেন আপিস খুললে—কমিশনের হিসেবটাও সেই সঙ্গে দেবেন। যান এখন।

অবশ্য এত সহজে কৃষ্ণলাল যাইতে রাজি হয় নাই—নৃত্যগোপালবাবুকে সে যথেষ্টই বলিয়াছিল, নৃত্যগোপালবাবুর বুড়োকর্ত্তাকে গিয়া পর্য্যন্ত ধরিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হইল না।

মুস্কিল এই, চাকুরী যখন যাইবার হয়, তখন তাহাকে কিছুতেই ধরিয়া রাখা যায় না। মৃত্যুপথযাত্রী মানবের মতই তার গতিপথ নির্ম্মম, ধরাবাঁধা!

সুতরাং চাকুরী গেল।

তখন বেলা আড়াইটা। সকাল হইতে ইহাকে উহাকে ধরাধরির ব্যাপারেই এতক্ষণ সময় কাটিয়াছে! স্নান-আহার হয় নাই।

১৫।২ রামনারায়ণ মিত্রের লেনে ঢুকিয়াই যে টিনের চালওয়ালা লম্বা দোতলা মাটির ঘর, অর্থাৎ যে মাটকোঠার ঠিক সামনেই আজকাল কর্পোরেশনের সাধারণ স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছে—তারই পশ্চিম কোণে সতরো নম্বর ঘরে আজ প্রায় এগারো বছর ধরিয়া কৃষ্ণলালের বাসা।

কৃষ্ণলাল ঘরে একা থাকে না। ছোট্ট ঘরে তিনটি ময়লা বিছানা মেজের উপর পাতা। সে ঢুকিয়া দেখিল ঘরে কেবল যতীন শুইয়া ঘুমাইতেছে। আর একজন রুমমেট্ ট্রামের কণ্ডাক্টার, সাড়ে চারটার পরে সে ডিউটি হইতে ছুটি লইয়া একবার আধঘণ্টার জন্ম বাসায় আসে এবং তারপরেই সাজিয়া-গুজিয়া কোথায় বাহির হইয়া যায়।

নীচে পাইস্ হোটেলে ইহাদের খাইবার বন্দোবস্ত।

কৃষ্ণলালের সাড়া পাইয়া যতীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে বলিল—এত বেলায় ?

—বেলায় তা কি হবে ? চাক্রীটা গেল আজ।

সে কি ! এতদিনের চাক্রীটা—

—কত করে বল্লুম বড়বাবুকে। তা শোনে কি কেউ ? গরীবের কথা কে রাখে বলো !

—হয়েছিল কি ?

—ক্যাশ জমা দিতে দেরি হয়েছিল। বলে তুমি ক্যাস ভেঙেচ।

—তাইতো···তাহোলে এখন উপায় ?

—দেখি কোথাও আবার চেষ্টা—জুটে যাবে একটা না একটা। আমাদের এক দোর বন্ধ হাজার দোর খোলা—আমাদের অন্ন মারে কে।

সামান্য কিছু পয়সা হাতে ছিল—পাইস্ হোটেল হইতে শুধু ডাল ভাত খাইয়া আসিয়া কৃষ্ণলাল কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল, পরে নবীন কুণ্ডু লেনে একটি খোলার বাড়ীতে ঢুকিয়া ডাক দিল—ও গোলাপী—গোলাপী—

তাহার সাড়ায় যে বাহির হইয়া আসিল, সে বর্ত্তমানে রূপযৌবনহীনা প্রৌঢ়া, পরনে আধ ময়লা খয়েরী রংয়ের শাড়ী, হাতে গাছকয়েক কাঁচের চুড়ি। দু-গাছা সোনাবাঁধানো পেটি। মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, গায়ের রং এখনও বেশ ফর্সা।

গোলাপীকে ত্রিশ বৎসর আগে দেখিলে ঠিক বোঝা যাইত গোলাপী কি ছিল। এখন আর তাহার কি আছে ? কৃষ্ণলাল তখন সবে ঔষধের ক্যান-ভাসারের পদে বাহাল হইয়াছে—তাহার চমৎকার চেহারা ও কথাবার্ত্তা বলিবার ভঙ্গিতে রেলগাড়ীর প্যাসেঞ্জার কি করিয়া সহজেই ভুলিয়া যাইত—জলের মত পয়সা আসিতে লাগিল।

এই নবীন কুণ্ডু লেনেই অন্য এক বাড়ীতে এক বন্ধুর সহিত আসিয়া সে

গোলাপীকে দেখে। তখন নতুন যৌবন, হাতেও কাঁচা পয়সা। গোলাপীর তখন বয়স ষোলো সতেরো। রূপ দেখিয়া রাস্তার লোক চমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়। গোলাপীর মা'র হাতে বছরে বছরে মোটা টাকা জমে। কৃষ্ণলাল সেই হইতেই নবীন কুণ্ডু লেনের নৈশ অধিবাসী। কত কালের কথা—গোলাপীর ঘরে মেহগ্‌নি কাঠের দেরাজ হইল, ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত বড় বিলাতি কাঁচ বসানো আয়না হইল, সেকালে প্রচলিত ম্যাকাসার অয়েলের শিশির পর শিশি ভিড় জমাইয়া তুলিল—বাতায়ন মালতী ফুলের টবে সজ্জিত হইয়া বাড়ীর অন্যান্য ঘরের অধিবাসীদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করিল।

কাঁচা পয়সা কৃষ্ণলালের হাতে। প্রতিদিনের আয় তিন টাকা, আড়াই টাকার নীচে নয়।

একদিন গোলাপীর মা অভিমানের স্বরে বলিল—যাই বলো বাপু, গোলাপী আমায় প্রায়ই বলে, একখানা বাড়ী তার নিজের না হ'লে চলে না আর—তা তেমন কপাল কি—এই এক বাড়ীতে ছত্রিশ জনার সঙ্গে—

—কেন মা? তার ভাবনা কি? কালই ঘর দেখে দিচ্চি—

—কত টাকা ভাড়ার মধ্যে হবে বলো—এই আমাদের পাড়াতেই আছে—যা তুমি বলবে। কুড়ি কি পঁচিশ—

—ত্রিশ টাকায় একখানা ভালো বাড়ী এ পাড়াতেই আছে—তাহ'লে তাই না হয়—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—এ আবার আমায় জিজ্ঞেস করতে হয় মা?

গোলাপীরা নতুন বাড়িতে উঠিয়া আসিল। বড় পাঁচী বলিল—ওগো, একটু রয়ে সয়ে নিস—দেখিস যেন আবার দড়ি না ছেঁড়ে—খুব বরাত তোর যাহোক গোলাপী। আর আমাদের ওই বুড়ো রায় বাবু রোজ আসেন আর বাঁধানো দাঁত জলের গেলাসে খুলে রাখেন—ক'দিন বল্লাম একখানা ঢাকাই শাড়ী, আর একটা বাজা-ঘড়ি দাও দেওয়ালে টাঙানোর, তা বুড়ো মড়া আজ সাতমাস ঘুরুচ্চে—আজ এলে হয় একবার—ওর দাঁত খুলে জলের গেলাসে ডুবিয়ে রাখা বের করে দেবো—

শুধু বাড়ী? গোলাপীর টেবিল-হারমোনিয়ম হইল, জোড়া জোড়া শাড়ী, চেয়ার, এমন কি শেষে কলের গান পর্য্যন্ত। কোন্ সুখ গোলাপীর বাকি ছিল? প্রতি রবিবারে কৃষ্ণলালের সঙ্গে গাড়ী করিয়া (অবশ্য ঘোড়ার গাড়ী)

কালীঘাটে গঙ্গাস্নান ও দেবীদর্শন করিতে যাওয়া তাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বছরের পর বছর কাটিয়া গেল।

গোলাপী আর কৃষ্ণলাল, কৃষ্ণলাল আর গোলাপী।

ইতিমধ্যে গোলাপীকে সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিতা দেখিয়া তাহার মা একদিন নবীন কুণ্ডু লেনের মায়া কাটাইয়া বোধ হয় উর্ব্বশী বা তিলোত্তমা-লোকে প্রস্থান করিল। অমন জাঁকের শ্রাদ্ধ এ অঞ্চলে কেহ দেহ দেখে নাই তার আগে।

ক্রমে ক্রমে গোলাপীর যৌবনে ভাঁটা পড়িল। কৃষ্ণলালেরও আয়ের অঙ্ক কমিতে লাগিল। দত্তপুকুরের তেলের অনুকরণে শত শত বাতের তেল বাজারে বাহির হইল—রেলগাড়ীর কামরাও নিত্যনূতন ক্যানভাসারে ভরিয়া গেল। যা ছিল কৃষ্ণলালের একার—তাহার মধ্যে অনেক ভাগ বসিল। পূর্ব্বের সচ্ছলতা কমিতে লাগিল।

তারপর দশ বারো বছরে সুন্দরী গোলাপী কুরূপা প্রৌঢ়াতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—তাহার সে বাড়ী চলিয়া গিয়া আবার সাত আটটি নানা বয়সের সঙ্গিনীর সঙ্গে এই বাড়ীটিতে থাকিতে হয়। তবুও কৃষ্ণলালের যাহা কিছু উপার্জ্জন, এইখানেই তাহার সদ্ব্যয়। গোলাপীও তাহা বোঝে—এই ত্রিশ বছরের মধ্যে সে কৃষ্ণলালকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় নাই।

কৃষ্ণলাল বলিল—গোলাপী, চাক্‌রীটা গেল!

গোলাপী বিস্ময়ের স্বরে বলিল—সে কি গা!

বড়বাবু রাগ করেচে, কাল ক্যাশ জমা দিইনি বলে।

—কি করলে সে টাকা?

—খরচ হয়ে গেল!

—কোথায় খরচ হয়ে গেল—কিসে খরচ হয়ে গেল? তোমার এখনও দোষ গেল না তা ওরা কি করে রাখে তোমায়? কাল কোথায় গিয়েছিলে?

—সে খরচ নয় গোলাপী। দক্ষিণেশ্বরে সেদিন যাওয়ার দরুন দেনা ছিল মনে নেই? কাবুলীর কাছ থেকে টাকা নিইনি? রাত দশটার পরে ইষ্টিশনের গেটে আমায় ধরেচে। রুপী দেও। শেষে ভাবলাম কি ছোরা মারবে না কি? ভয়ে পড়ে দিয়ে দিলাম টাকা। কাবুলীর দেনা, ও হজম করা কঠিন।

—তা নেও বেশ হয়েচে। এখন খাওয়া হয়েচে না হয়নি? আমার

অদেষ্টে ঝি-গিরি নাচ্‌চে সে তো দেখতে পাচ্চি। তখন বল্লু, পাড়াগাঁয়ের দিকে চলো—কোথাও একখানা ঘরদোর বেঁধে দু'জনে থাকা যাবে—তা না, তোমার বাপু কল্‌কেতা আর কলকেতা! কলকেতা ছেড়ে আমি থাকতে পারবো নি। এখন থাকো কলকেতায়? কে এখানে খাওয়ায় দেখি?

—জুটে যাবে, এখানেই জুটে যাবে। অত ভাবনার কারণ নেই—

—তোমার এ বুড়ো বয়সে চাকুরী নিয়ে তোমার জন্যে বসে আছে! এখন আর কি তোমার হাত পা নেড়ে বক্তিমে করবার গতর আছে নাকি?

—দেখিয়ে দেবো গোলাপী, দেখবি? ভদ্রমহোদয়গণ, এই সেই বিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম দত্তপুকুরের বাতের তেল—ইহা ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বাত বেদনা, মাথাধরা, দাঁত কনকনানি, কাউর, ছুলি, কাটা ঘা, পোড়া ঘা—

গোলাপী হাসিতে হাসিতে বলিল—থাক্ গো গোসাঁই, আর বিদ্যে দেখাতে হবে না···সবাই জানে তুমি খুব ভালো বক্তিমে দিতে পারো—আহা, কি হাত পা নাড়ার ছিরি! যেন থিয়েটারের এ্যাক্টো করচেন!

—তাহ'লে বল চাকুরীতে নেবে কিনা?

—নেবে না আবার? একশো বার নেবে—আমি যাই এখন ঝি-গিরি ক'রে নিজের পেট চালাবার চেষ্টা দেখি—নিজেই খেতে প্যবে না তা আমায় আর খাওয়াবে কোত্থেকে! কি অদেষ্ট যে নিয়ে এসেছিলাম!

কৃষ্ণলাল চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া গোলাপী বলিল—ব'সো দু'টি মুড়িটুড়ি মেখে দি—খেয়ে একটু চা খেয়ে যাও—

অগত্যা কৃষ্ণলাল বসিল। বলিল—তাহ'লে কক্তৃতা এখনও দিতে পারি কি বলো?

—নেও, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। দিতে পারো তো—সত্যি কথা যদি বলি তবে তো পায়া ভারী হয়ে যাবে।

—কি বলো না গোলাপী, বলতেই হবে।

—তোমার মত অমন কারো হয় না, আমি তো কতই দেখলাম দাঁতের মাজনের, ওষুধের ফিরিওয়ালা—আমাদের এই গলির মুখে হারমোনিয়াম গলায় বেঁধে নাচে, বক্তিমে দেয় পোড়ারমুখোরা—কিন্তু সে সব ফিরিওয়ালা তোমার মত নয়—

কৃষ্ণলাল রাগের সুরে বাধা দিয়া বলিল—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তোকে নিয়ে আর পারিনে দেখচি—তারা হ'ল ফিরিওয়ালা—আমরা হলুম

ক্যান্‌ভাসার—হারমোনিয়াম পিঠে বেঁধে যারা গান গেয়ে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নেচে বেড়ায়, আমরা কি সেই দলের? অপমান হয়, ওকথা আমাদের ব'লো না!

—যাক যাক, ভুল হয়েচে, তুমি এখন ঠাণ্ডা হয়ে বসে চা খেয়ে নেও।

গোলাপীর মন আজ বেশ খুশি। কতদিন পরে যেন যুবক কৃষ্ণলালের অঙ্গভঙ্গি ও সুন্দর সতেজ গলার স্বর সে আবার শুনিল। ত্রিশ বৎসরের অন্ধকার কালো ছেঁড়া পর্দাটা কে টানিয়া সরাইয়া দিল।

সে যত্ন করিয়া কৃষ্ণলালকে খাওয়াইল—কৃষ্ণলাল বিদায় লইয়া যখন আসে তখন বলিল—একটা কথা বলি শোনো। যদি খাওয়া-দাওয়ার কোনো কষ্ট হয়, তবে আমার কাছে এসে অবিশ্যি খেয়ে যাবে। এই বেদ্দ বয়েসে না খেলে শরীর থাকবে কেন? আমায় কিছু দিতে হবে না এখন। ওই সোনার-বেনেদের ঠাকুর বাড়ীতে একটা ঝিয়ের দরকার, সকাল-সন্ধ্যে কাজ করব—আমি কাল থেকে সেখানে কাজে লেগে যাবো—তা তোমায় বলাও যা না বলাও তাই—তুমি কি আসবে? তোমায় আমি চিনি কিনা!

কৃষ্ণলাল হাসিয়া বলিল—ভালোই তো। তোর রোজগার এইবার খাই দিনকতক—সে সাধ আমার আছে অনেকদিন থেকেই। আচ্ছা তাহ'লে এখন আসি, ওবেলা হয়তো আসবো—সন্ধ্যের পর।

তাহার পর এক মাস কাটিয়া যায়। কিন্তু গোলাপীর বাড়ী কৃষ্ণলাল আর আসিল না। সুখের দিনে গোলাপীকে সে অনেক দিয়াছে—এখন দুঃখের দিনে বসিয়া বসিয়া গোলাপীর অন্ন ধ্বংস করিবে তেমন-বংশে জন্ম নয় কৃষ্ণলালের। বিশেষত দেখিতে হইবে, গোলাপীও প্রৌঢ়া—ঝি-গিরি ভিন্ন এখন তার কোনো উপায় নাই।

মেসের ভাড়া বাকি পড়িয়াছিল দু'মাসের, মেসের অধ্যক্ষ কৃষ্ণলালকে ডাকিয়া বলিল—কি কৃষ্ণবাবু, আমাদের রেণ্টটা কি হবে?

—আজ্ঞে ক্ষেত্রবাবু, দেখতেই তো পাচ্ছেন—চাকুরীটা গেল, হাতে কিছু নেই। এ অবস্থায়—

—ফি-মাসে আমি পকেট থেকে ঘরভাড়া জোগাবো কোথা থেকে সেটাও তো দেখতে হবে? দুদিন সময় নিন—তারপর আপনি দয়া করে সিট ছেড়ে দিন, আমি অন্য ব্যবস্থা দেখি।

কৃষ্ণলাল পড়িল মহা বিপদে। একে খাইবার পয়সা নাই—তাহার উপর মাথা গুঁজিবার যে জায়গাটুকু ছিল, তাহাও তো আর থাকে না। তিন দিন

কাটিয়া গেল, দু' একটি পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া দু' চার আনা ধার লইয়া পাইস হোটেলের ডাল ভাতে কোনোরকমে ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া এই তিনদিন কাটাইল। কিন্তু তিনদিন পরে তাহার সত্যই অনাহার শুরু হইল। দু' পয়সার ছাতু বা মুড়ি সারাদিনে—শুধু ছাতু, একটু গুড় বা চিনি জোটে না তাহার সাথে। তাহার পর পেট পুরিয়া জল, কলের নির্ম্মল জল।

মেসের ম্যানেজার আবার ডাক দিলেন। বলিলেন—কিছু হ'ল ?

—আজ্ঞে এখনো—এই ভাবচি—

—আমার লোক এসে গিয়েচে—কাল মাসের পয়লা। দু' মাসের ভাড়া পকেট থেকে দিয়েচি—এ মাসেও দিতে হবে। আমিও ছা-পোষা মানুষ মশাই—কত লোকসান হজম করি বলুন ? আপনি জিনিষপত্তর নিয়ে চলে যান—আমার ভাড়ার দরকার নেই। খাটখানা রেখে যাবেন মেসে।

পরদিন সকালেই জিনিষপত্র সমেত (একটি টিনের ট্রাঙ্ক ও একটি ময়লা বিছানা) কৃষ্ণলালকে পথে দাঁড়াইতে হইল। বর্ষাকাল। জিনিষপত্র রাখিবার মত জায়গা কোথায় পাওয়া যায় ? গোলাপী অনেকবার মেসে খবর লইয়াছে —মধ্যে একদিন দু'ঘণ্টা মেসের বাইরের ফুটপাতে বসিয়াছিল তাহার অপেক্ষায় (কারণ ম্যানেজার তাহাকে চেনে, মেসে কুচরিত্রা স্ত্রীলোক ঢুকিতে দিবে না) —কৃষ্ণলাল দূর হইতে দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এখন গোলাপীর বাড়ী গেলে সে কান্নাকাটি করিবে, আটকাইয়া রাখিতে চাহিবে। নতুবা সেখানে জিনিষপত্র রাখা চলিত।

মেস হইতে কিছু দূরে বড় রাস্তার উপর একটা চায়ের দোকানের মালিকের সঙ্গে কৃষ্ণলালের পরিচয় ছিল। বলিয়া কহিয়া সেখানে কৃষ্ণলাল জিনিসপত্র আপাতত রাখিয়া দিল। তাহার পর উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দেখিল সে গঙ্গার ধারে আহিরিটোলার ষ্টীমারঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে।

সকাল হইতে কিছু খাওয়া হয় নাই। ঘাটের ধারে একটা গাছতলায় হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালা ভুট্টা পোড়াইতেছে। কৃষ্ণলাল এক পয়সায় একটা ভুট্টা কিনিয়া জলের ধারে বসিয়া সেটি পরম তৃপ্তির সহিত খাইল।

একটা বিড়ি পাইলে হইত এই সময়।

এই সময় একটি ছোক্‌রা ব্যাগহাতে আসিয়া তাহার পাশে ব্যাগটি নামাইয়া পকেট হইতে ঝাড়ন বাহির করিয়া সিমেণ্ট-বাঁধানো রানার উপর পাতিল।

বসিতে যাইবে এমন সময় ছোকরা হঠাৎ পকেটে হাত দিয়া কি দেখিয়া একবার চারিদিকে চাহিল এবং কাছেই কৃষ্ণলালকে দেখিয়া বলিল—একটু দয়া করে, ব্যাগটা দেখবেন? এক পয়সার বিড়ি কিনে আনি—

বিড়ি কিনিয়া আনিয়া সে কৃষ্ণলালকে একটি বিড়ি দিল। কৃষ্ণলাল আগেই আন্দাজ করিয়াছিল, ছোক্‌রা একজন ক্যান্‌ভাসার। এখন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি বুঝি ক্যান্‌ভাস্‌ করেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—কি জিনিস?

—হাতকাটা তেল—সার্জ্জিক্যাল মলম—

—বেশ পাওয়া যায়? কমিশন কেমন?

—ভালোই। খদ্দেরকে হাত কেটে দেখাতে—সঙ্গে ছুরি থাকে—এই যে—

ছোক্‌রা জামার আস্তিন গুটাইয়া দেখাইল—কব্জি হইতে কনুই পর্য্যন্ত হাতের সমস্ত অংশটা ছুরি দিয়া ফালা ফালা করিয়া চেরা। কৃষ্ণলাল শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—এ কি! লাগে না?

ছোক্‌রা হাসিয়া বলিল—লাগে—আবার মলম লাগালে সেরে যায়।

—কি রকম আয় করেন?

—চব্বিশ টাকা থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা মাসে।

কৃষ্ণলালের মন বেজায় দমিয়া গেল। এত কাণ্ড করিয়া ত্রিশ টাকা! অথচ এমন সময় গিয়াছে—যখন দত্তপুকুরের বাতের তেল ফিরি করিয়া সে মাসে ষাট সত্তর টাকা অনায়াসে রোজগার করিয়াছে—তাহার জন্য নিজের হাত ছুরি দিয়া ফালা ফালা করিয়া কাটিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই।

ক্যানভাসারের কাজে আর সুখ নাই। আর সে এ কাজ করিবে না।

পরদিন কৃষ্ণলাল কলিকাতা ছাড়িয়া স্বগ্রামে রওনা হইল। বসিরহাট স্টেশনে নামিয়া সাত ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার পৈতৃক গ্রাম ইলশেখালি পৌঁছিতে বেলা তিনটা বাজিল। গ্রামে তাহার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ছাড়া অন্য কেহ আপনার জন নাই—নিজের পৈতৃক ভিটা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। বহুদিন এদিকে আসে নাই, দেখা শোনাও করে নাই—খড়ের ঘর কতদিন টেকে? আজ প্রায় সতেরো আঠারো বছর পূর্ব্বে দু-পাঁচ দিনের জন্য একবার পিসিমার শ্রাদ্ধে গ্রামে আসিয়াছিল। সেই আর এই।

জ্ঞাতিরা অবশ্য কৃষ্ণলালকে জায়গা দিল। কিন্তু কিছুদিন থাকিয়া কৃষ্ণলালের কেমন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। গ্রামে তাহার মন টেকে না। কখনও সে দীর্ঘদিন ধরিয়া গ্রামে বাস করে নাই—এখানকার লোকে কথাবার্ত্তা বলিতে জানে না, ভাল করিয়া মিশিতে জানে না, চা খায় না। কলিকাতায় রাস্তার ভিখারীও চা খায়। তাহার উপর এই পাড়াগাঁয়ে যেমন জলকাদা, তেমনি জঙ্গল—রাত্রে মশার উৎপাতে নিদ্রা হয় না। এরই মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রায় সকল বাড়ীতেই দেখা দিয়াছে।

না, এখানে মন টেকে না। কৃষ্ণলাল চেষ্টা করিয়া দেখিল—এখানে সবাই যেন সারাদিন ঘুমাইয়া আছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহারা চড়কতলার ক্ষুদ্র মাঠে বেলতলায় বসিয়া হুঁকা হাতে আড্ডা দেয়, পরচর্চ্চা করে। কোনো কাজ নাই অথচ দুপুরে ভাত দু'টি মুখে দিতে না দিতে এদের চোখ ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে। দিবানিদ্রা চলে বেলা চারিটা পর্য্যন্ত—তারপর ঘুম হইতে রক্তবর্ণ চোখে উঠিয়া কেহ বা বাজারে দু'পয়সার সওদা করিতে যায়—সেখানেও আবার আড্ডা…এ দোকানে ও দোকানে বসিয়া তামাক খাওয়া… চার পয়সার সওদা করিতে তিন ঘণ্টা লাগাইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী আসে। তারপরই আহার ও নিদ্রা। কেরোসিন তেলের দাম চড়িয়া গিয়াছে—তেল খরচ করিয়া আলো জ্বালাইয়া রাখিতে কেহ রাজী নয়। কয়েক বাড়ী যাও—অন্ধকারে বসিয়া দু' একটা কথা বলো, গল্প করো—এক আধ কল্কে তামাক খাও—তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া আবার বিছানা আশ্রয় কর। দিন শেষ হইয়া গেল।

কৃষ্ণলাল এরকম জীবনে অভ্যস্ত নয়। এ কি জীবন? অথচ সকলেই বলিবে, দাদা, সংসার আর চলে না, বড় কষ্ট। কষ্ট ঘুচাইবার চেষ্টা কোথায়? আজ দীর্ঘ পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরিয়া যার কলিকাতায় ভীষণ কর্ম্মব্যস্ত জীবন কাটিয়াছে, এ ধরণের অলস, শ্রমবিমুখ জীবনের ধারণাই করিতে পারে না সে।

সকালে উঠিয়াই নীচের তলায় কলে স্নান সারিয়া লইতে হইত। খুব ভোরে স্নান না সারিলে এমন ভিড় জমিয়া যাইবে কলে যে, আর স্নান করা চলিবে না। নীচের তলায় সেকরার দোকানের লোকেরা, শালওয়ালা, দরজি, পূব দিকের ঘরে যে মুটেরা থাকে সবাই আসিয়া কলে ভিড় লাগাইয়া দিবে, ইহার পর আসিবে একদল বালতি হাতে জল ধরিতে ও চাউল ধুইতে। সারি সারি লোক দাঁড়াইয়া যাইবে কলসী হাতে জল ভরিতে। ওপরের তিন তলার তিনটি

মেসের চাকরেরা। সকলেই কর্ম্মব্যস্ত, ঘড়ি ধরিয়া কাজ কলিকাতায়, 'সময় গেল। ছ'টা বাজে, কখন কি হবে?' দিন আরম্ভ হইয়াছে···এখুনি বাবুরা আসিয়া ভাত চাহিবে আটটা বাজিতে না বাজিতে, এতটুকু দেরি করিলে চলিবে না।

স্নান সারিয়া কৃষ্ণলাল ব্যাগ হাতে বাহির হইত শেয়াল-দ' স্টেশনে, প্রথমেই সাতটা দশ বারাসত, সাতটা পঁচিশ নৈহাটি, পৌনে আটটা রাণাঘাট প্যাসেঞ্জার, সাড়ে আটটা বনগাঁ লোকাল, আটটা পঞ্চাশ দত্তপুকুর, ন'টা দশ কেষ্টনগর লোকাল,···শুরু হইয়া গেল দিনের কাজ। বাতের তেল! বাতের তেল! দত্তপুকুরের বাতের তেল! যত প্রকার বাত, ফুলা, শূলানি, কন্‌কনানি, মাথা ধরা, পেট বেদনা, ইহার একমাত্রা ব্যবহারে···ভদ্রমহোদয়গণ, এই ওষুধটি আজ ত্রিশ বছর যাবৎ এই লাইনে সুখ্যাতির সহিত চলিতেছে,—এই চলিল বেলা বারোটা পর্য্যন্ত। বারোটা পঞ্চান্ন শান্তিপুর ছাড়িয়া গেলে তবে সকালের কাজ মিটিল। কি জীবন! কি আনন্দ! কি পয়সা রোজগার! কাঁচা পয়সা রোজ আসে, রোজ সন্ধ্যায় উড়িয়া যায়, যে পয়সা আয় করিতে জানে, সে-ই জানে খরচ করিতে, ইহাতে ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণলাল আরও মাসখানেক কোনোরকমে কাটাইল।

আর চলে না। এ অলস জীবন তাহার অসহ, কখনো পা গুটাইয়া কূর্ম্ম-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এভাবে সে থাকে নাই। বেশিদিন এভাবে থাকিলে সে পাগল হইয়া যাইবে, নয়তো মরিয়া যাইবে।

কিন্তু কলিকাতায় গিয়া সে খাইবে কি? কোনো উপায় তো দেখা যাইতেছে না। ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটে আর চাকরী হইবার সম্ভাবনা নাই। তবুও একবার বসু মহাশয়কে গিয়া ধরিয়া দেখিলে কেমন হয়? কিছু যদি না জোটে, তবে আহিরিটোলার ঘাটে সেই হাতকাটা তেলের ক্যানভাসার ছোকরার সঙ্গে দেখা করিয়া...তবে ছুরি দিয়া নিজের হাতটা ফালা ফালা করিয়া কাটা—এ বৃদ্ধ বয়সে, ক্যান্‌ভাসারের চাকুরীর মত সম্মানের চাকুরী, আরামের চাকুরী আর নাই, কিন্তু হাত কাটিয়া দেখাইয়া জিনিস বিক্রয় করা? ওতে মানসম্ভ্রম থাকে না।

এভাবে গ্রামে বসিয়া থাকা জীবন নয়। চিরকাল কাজের মধ্যে থাকিয়া আজ বাঁচিয়া মরিয়া থাকা তাহার পোষাইবে না। গ্রামেও তো হাওয়া খাইয়া জীবন ধারণ করা যায় না—কেহ কেহ তাহাকে সামনের বছর দু'এক বিঘা ধান

করিতে পরামর্শ দিল—কেহ বলিল, ডোবার ধারে জমিটা পড়ে আছে কেষ্ট খুঁড়ো, তোমারই পৈতৃক জমি, এই শীতকালে মানকচু লাগাও ওটাতে, তবু হাটে হাটে কিছু ঘরে আসবে, সামনের শীতকাল নাগাৎ—কৃষ্ণলালের হাসি পায়।

কলিকাতার রোজগার যে কি ধরণের, সেখানে ক্যান্‌ভাসারের কাজে মাসে যে টাকা এক সময় তাহার আয় ছিল, এখানে গোটা বছর ধরিয়া কচু, কুমড়া বেচিয়াও যে সে আয় হওয়া অসম্ভব—এই মূর্খ, অর্ব্বাচীনেরা তাহা কি করিয়া বুঝিবে?

অবশেষে সে একদিন বাক্স বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতায় আসিয়া হাজির হইল।

বাঁচিতে হয় তো ভাল করিয়াই সে বাঁচিবে।

ট্রেনে পুরানো ক্যান্‌ভাসারদের সঙ্গে দেখা। নবশক্তি ঔষধালয়, কবিরাজ অনঙ্গমোহন দেব, বিশ্বাস কোম্পানী—ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেট প্রভৃতি ফার্ম্মের লোক সব। সবাই জানে, সবাই খাতির করে।

—আরে, এই যে কেষ্টদা, আজকাল আর দেখিনে যে?

—কেষ্টদা, কোত্থেকে? বিয়েথাওয়া করলেন নাকি এ বয়সে?

—আজকাল কোন কোম্পানীতে আছেন কেষ্টদা? দেখিনে ট্রেনে আর?

—জমিজমা দেখতে গেছলে ভায়া? তা দেখবেই তো, থাকলেই দেখে—আমাদের কোনো চুলোয় কিছু নেই, যা করে এই বিশ্বাস কোম্পানী, হিংসে হয় তোমায় দেখে, দু'শো টাকা বছরে আয়ের সম্পত্তি? বলো কি! তবে তো তুমি—

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কৃষ্ণলালকে এ বিড়ি দেয়, ও পানের কৌটা খুলিয়া সামনে ধরে। পুরানো বন্ধুর দল। ইহাদের ফেলিয়া সে এতকাল ঘুমন্ত পুরীতে কাল কাটাইল সে কি ভাবিয়া? এখানে কাজ আছে, আমোদ আছে। পয়সা রোজগার আছে, তারপর ইয়ে আছে। আর সে কোথাও যাইবে না কলিকাতা ছাড়িয়া, মরিতে হয় এখানে মরিবে।

পনেরো বিশ দিন এখানে ওখানে হাঁটাহাঁটি করিয়াও কিন্তু চাকুরী মিলিল না। বসু মহাশয় ঝাড়া জবাব দিলেন। এখন সুশ্রী চেহারার ছোকরা ক্যান্‌ভাসার—বেশ লম্বা জুলপি, ঘাড় বাহির করিয়া চুল ছাঁটা, লপেটা জুতা

পায়ে, থিয়েটারের রামের মত গলা, এই সবাই চায়। বয়স হইয়া গেলে, মানে, এখন উহাদের লোক আছে, দরকার হইলে চিঠি লিখিয়া জানাইবেন পরে।

পুরোনো মেসেই উঠিয়াছিল, বারান্দাতে আছে। গোলাপীর সঙ্গে দেখা করে নাই। এখন করিতে চাহেও না সে। অনাহারে দু'দিন কাটিল মধ্যে। অবশেষে একদিন আহিরিটোলার ঘাটেই গিয়া হাজির হইল, যদি হাতকাটা তেলওয়ালা সেই ছোকরার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। সে সাড়ে বারোটার ষ্টীমারে রোজ বালি হইতে আসে বলিয়াছিল। সাত আট দিন ক্রমাগত ঘুরিয়াও কিন্তু ছোকরার দেখা মিলিল না। কৃষ্ণলালের দুঃখ শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর চলে না। আচ্ছা, সে ক্যান্‌ভাসারি ভুলিয়া যাইতেছে না তো? আজ কতদিন চাকুরী নাই। কতদিন বক্তৃতা দিবার অভ্যাস নাই। চর্চ্চা অভাবে শেষে কিনা ছোকরা ক্যান্‌ভাসারেরা কৃষ্ণলালকে ছাড়াইয়া যাইবে।

সেদিন কৃষ্ণলাল নিজের টিনের ছোট সুটকেস্‌টি হাতে লইয়া ড্যালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে দাঁড়াইয়া হাত পা নাড়িয়া ক্যান্‌ভাসারের বক্তৃতা জুড়িয়া দিল, চর্চ্চা রাখা দরকার তো বটেই, তাছাড়া সে নিজের শক্তি পরীক্ষা করিতে চায়, খরিদ্দার জোটে কিনা সে একবার দেখিবে। এখনও তাহার যাহা গলা আছে, থিয়েটারের রামের মত গলাওয়ালা কোন্ ছোকরা ক্যান্‌ভাসার তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবে, সে দেখিতে চায়।—দত্তপুকুরের বাতের তেল! ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বাত, বেদনা, মাথা ধরা, দাঁতশূলানি, হাত বেদনা, পিঠ বেদনা··· ভদ্রমহোদয়গণ! এই ঔষধটি আজ ত্রিশ বছর ধরিয়া এই লালদীঘির মোড়ে···

কৃষ্ণলাল মিনিট পাঁচ ছয় পরে সগর্ব্বে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল। বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে। একজন ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিয়া বলিল—আমার একটা ছোট ফাইল!—

কৃষ্ণলাল গম্ভীর ভাবে বলিল—আমার কাছে ওষুধ নেই—আমি বসু ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টের লোক, যাঁদের দরকার হবে, তাঁরা একশো ছয়ের সি হরিধন পোদ্দারের লেনে বসু ইণ্ডিয়ান ড্রাগ সিণ্ডিকেটের অফিসে···আমার নামের এই স্লিপটা নিয়ে যান দয়া করে, টাকায় চার আনা কমিশন পাবেন—দাঁড়ান লিখে দিচ্চি—

দিন পাঁচ ছয় কাটিল। কৃষ্ণলালের নেশা লাগিয়া গিয়াছে। সে বেলা তিনটার সময় রোজ সুটকেস্ হাতে ঝুলাইয়া ড্যালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে গিয়া বক্তৃতা জুড়িয়া দেয়। আফিস ফেরতা লোকেরা ভিড় করিয়া শোনে।

সেদিন কৃষ্ণলাল দাঁড়াইয়া দত্তপুকুরের বাতের তেলের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক ভিড় ঠেলিয়া একেবারে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণলাল চমকিয়া উঠিল, বসু ড্রাগ সিণ্ডিকেটের মালিক নৃত্যগোপাল বসু মহাশয় স্বয়ং!

বসু মহাশয় কৃষ্ণলালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, শুনুন একবার এদিকে—

কৃষ্ণলাল ভিড়ের পাশ কাটাইয়া কিছু দূরে বসু মহাশয়ের সঙ্গে গিয়া অপ্রতিভের মত দাঁড়াইল; বসু মহাশয় বলিলেন, একি হচ্চে?

কৃষ্ণলাল অপরাধীর মত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল আজ্ঞে, আজ্ঞে, একবার চর্চ্চাটা রাখচি, নইলে—

বসু মহাশয় বলিলেন, তাইতো বলি এ কি কাণ্ড! গত দিন পাঁচ ছ'য়ের মধ্যে অফিসে আপনার নামের শ্লিপ নিয়ে বোধ হয় একশো কি দেড়শো খদ্দের গিয়েছে। এত ওষুধ বিক্রি গত ক'মাসের মধ্যে হয়নি। একে তো এই ডাল্ সিজন্ যাচ্চে, আমি তো অবাক। সবাই বলে লালদীঘির মোড়ে আপনাদের পাবলিসিটি অফিসার, তাঁরই মুখে শুনে......আমি বলি আজ নিজে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখি তো নিজের চোখে। তা আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েচি, আপনার এরকম কাজে—

কৃষ্ণলাল বিনীতভাবে বলিল, আজ্ঞে, ভাবলাম ছোকরা ক্যান্‌ভাসারদের মত থিয়েটারী রামের গলা কোথায় পাবো—তবুও একবার দেখি দিকি—

বসু মহাশয় বলিলেন, শুনুন। ওসব থাক। আপনি আজই আপিসেই আসুন এক্ষুনি। আপনাকে আজ থেকে হেড ক্যান্‌ভাসার এ্যাপয়েণ্ট করলাম। ষাট টাকা মাইনে পাবেন আর কমিশন, শুধু তদারক ক'রে বেড়াবেন কে কেমন কাজ করচে, আর ছোকরাদের একটু তালিম দিয়ে দেবেন, বুঝলেন না? আসুন চ'লে আমার গাড়ীতে—

সন্ধ্যাবেলা।...নবীন কুণ্ডুর লেনে খোলার সংকীর্ণ রোয়াকে গোলাপী ক্যানেস্ত্রা-কাটা তোলা উনুনে আঁচ দিয়া প্রাণপণে পাখার বাতাস করিতেছে, এমন সময় বাহিরে কে পরিচিত গলায় ডাকিল—গোলাপী, ও গোলাপী, বাইরে এসে এই জিনিসগুলো ধরো দিকি। হাত ভেঙে গিয়েচে—

দ্রবময়ীর কাশীবাস

দু'দিন থেকে জিনিসপত্র গুছানো চললো। পাড়ার মধ্যে আছে মাত্র তিনঘর প্রতিবেশী—কারো সঙ্গে কারো কথাবার্ত্তা নেই। পাড়ার চারিধারে বনজঙ্গল, পিটুলি গাছ, তেঁতুল গাছ, বাঁশঝাড়, বহু পুরোনো আম-কাঁঠালের বাগান। দ্রব ঠাকরুণের বাড়ীর চারিধার বনে বনে নিবিড়, সূর্য্যের আলো কস্মিন্ কালে ঢোকে না, তার ওপর বাড়ীর সামনে একটা ডোবা, বর্ষার জলে টইটুম্বুর, দিনরাত 'ঘাঁওকো' 'ঘাঁওকো ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক, দিনে রাতে মশার বিন্‌বিন্নুনি।

দ্রব ঠাকরুণের নাতি বল্লে—ঠাক্‌মা সাবু আছে ঘরে, না বাজার থেকে আনবো ?

দ্রব ঠাকরুণের কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ শোনাল, কারণ আজ দু'মাস কাল তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন—পালাজ্বর, ঘড়ির কাঁটার নিয়মে তা আসবে একদিন অন্তর অন্তর ঠিক বিকেল বেলাটিতে। দ্রব ঠাকরুণ পুরোনো কাঁথা-লেপ চাপা দিয়ে পড়বেন, উঃ আঃ করবেন—জ্বরের ধমকে ভুল বকবেন।

ও বাড়ীর ন' ঠাকরুণ এসে জিজ্ঞেস করবে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে—বলি ও দিদি, অমন করচ কেন ? জ্বর এল নাকি ?

—আর ন'বৌ। মলেই বাঁচি। নিত্যি জ্বর, নিত্যি জ্বর—ওরে মা রে, হাত-পা কি কামড়ানটা কামড়াচ্চে !...একটু উঠে হেঁটে বেড়াতে দেবে না—এ কি কাণ্ড, হ্যাঁ গা ?

পরে মিনতির সুরে বলবেন—ও ন'বৌ, নক্ষী দিদি, শীত তো আজ ভাঙলো না, কাঁথা গায়ে দিইচি, নেপ গায়ে দিইচি—তুমি ওই বাঁশের আল্‌নায় পুরোনো তোশকটা পেড়ে আমার গায়ে যদি দিয়ে ছাও—

—চেপে ধরবো, হ্যাঁ দিদি ?

—ধ-রো—ন-বৌ—চেপে ধ-রো—আমার হ-য়ে গেল !

—ভয় কি, অমন করো না, ছিঃ। টেবু আসবে চিঠি পেলেই, কানু আসবে, বিন্দে আসবে—তোমার নাতিরা বেঁচে থাক্, অমন সোনার চাঁদ নাতি সব, ভাবনা কি তোমার দিদি ?

—কে-উ—আ-মা-কে—দে-খে-না—ন-বৌ—

—কেন দেখবে না দিদি—সবাই দেখবে। তুমি বেশি বোকো না, চুপটি করে শুয়ে থাকো—

—আমার গো-রু ! গো-রু উ-ত্ত-র-মা-ঠে—

—কোথায় গোরু দিয়ে এসেছিলে ?

—জ-টে গ-য়-লা-র অ-ড়-ল ক্ষে-তে-র পাশে—

—আচ্ছা আমি এনে দেবো এখন গোরু। আমারও গোরু রয়েছে জটে গোয়ালার জমির কাছেই। তুমি শুয়ে থাকো।

আরও ঘণ্টা খানেক পরে বৃদ্ধা ন' ঠাকরুণ আবার এসে জানালায় দাঁড়িয়ে বল্লেন—কম্প থেমেচে দিদি ?

ক্ষীণস্বরে লেপ কাঁথার ছেঁড়া স্তূপের মধ্যে থেকে জবাব এল—গোরু ! আমার গোরু তো—

—কোনো ভয় নেই। সে আমি এনেচি। কম্প থেমেচে ?

—হু

সারা বর্ষা দ্রবময়ী এমনি ম্যালেরিয়ায় ভোগেন, তাঁর বড় নাতি শ্রীশচন্দ্র ওরফে টেবু কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়, মেজ নাতি পাক্‌শীতে ই, বি, আর-এ—ছোট নাতিও ওদিকে যেন কোথায় থাকে। বড় নাতি ছাড়া অন্য দুটি অবিবাহিত, বড় নাতির আবার একটি ছেলেও হয়েচে। আজ বছর পাঁচ-ছয় আগে বড় নাতি ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ী এসে দিন সাতেক ছিল। নাতবৌ মনোরমা হুগলী জেলার মেয়ে, সে এখানে এসে নাক সিঁটকে থাকে, 'বাড়ী তো ভারি, মোটে একখানা চালাঘর, ছেঁচার বেড়া, এমনিধারা জঙ্গল যে, দিনমানেই বুনো শূওর লুকিয়ে থাকে—মশার তো ঝাঁক। মাগো, কি কাদা ঘাটের পথে ! এখেনে কি মানুষ থাকে না কি ?' মনোরমার খাঁড়ার মত নাক আরও উঁচু ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সাতদিন পরে দ্রবময়ীকে

নাতির ছেলে খোকন্‌মণির মায়া কাটাতে হয়। তাঁর চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

ন'ঠাকরুণকে বলেন—সুদের সুদ, ও যে কি মিষ্টি তা তোমাকে কি বোঝাব ন' বৌ—

দ্রবময়ীর আকুল ক্রন্দনের মধ্যে যে কত কালের পিপাসিত প্রতীক্ষা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিষ্পলকে চেয়ে আছে, স্বামীহীনা বন্ধ্যা বিধবা ন' ঠাকরুণ তা বুঝতে না পেরে কেমন অবাক হয়ে যান, হয়তো বা ভাবেন—দিদির সবই বাড়াবাড়ি!

ন'ঠাকরুণ আপনার জন কেউ নয়—পাড়ার পাশের বাড়ীর প্রতিবেশিনী মাত্র। বছরের মধ্যে গড়ে তিন-চার মাস দুই বৃদ্ধার মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে যায়, মুখ দেখাদেখি থাকে না—তবুও ঝগড়া কেটে গেলে পাড়ার মধ্যে একমাত্র ন'ঠাকরুণই দ্রবময়ীকে দেখাশুনো করেন সব চেয়ে বেশি, জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে তাঁর গোরুটাও নিজের গোরু দুটোর সঙ্গে মাঠে বেঁধে দিয়ে আসেন, একটু সাবু হয়তো করে নিয়ে আসেন, অন্তত জানালায় উঁকি মেরে দু'একটা কথা বলেন।

কিন্তু এবার দ্রবময়ী ভুগচেন একটু বেশি।

আষাঢ় মাসের প্রথম থেকে জ্বর শুরু হয়েচে, মাঝে মাঝে প্রায়ই ভোগেন।

শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়েচে—ঘোর অরুচি তার ওপর। পালাজ্বরে ধরেচে আজ মাসখানেক।

সন্ধ্যার দিকে দ্রবময়ী লেপ তোশক ফেলে ঝেড়ে উঠলেন। পালাজ্বরের কম্প থেমে গিয়েচে। জ্বর যদিও এখনো যায় নি—মুখ তেতো, মাথা ভার, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করচে।

ডাক দিলেন—ও ন' বৌ, গরু এনেচ দিদি?

দু'তিনবার ডাকের পর ন'ঠাকরুণ উত্তর দিলেন—কে ডাকে? দিদি? ঠেলে উঠেচ?

—বলি আমার গোরুডো কি এনেচ মাঠ থেকে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোরু গোরু করেই ম'লে শেষকালডা? জ্বর ছেড়েচে?

—ছেড়েচে—ছেড়েচে। বলি গোরু কোথায় বেঁধে রাখলে?

—গোয়ালে গো গোয়ালে—ক্ষেপলে যে গোরু গোরু করে···

কেরোসিন তেল একটা টেমিতে একটুখানি ছিল, দ্রব ঠাকরুণ টেমিটা

জ্বালালেন। আমড়া গাছে একটা তেড়ো পাখী আর একটা তেড়ো পাখীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইচে। দ্রবঠাকরুণের জরতপ্ত মস্তিষ্কে মনে হ'ল পাখী দুটো বলচে :—

প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—
দ্বিতীয়। কঁ্যা-কঁ্যা-কঁ্যা—
প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—
দ্বিতীয়। কঁ্যা-কঁ্যা-কঁ্যা—
প্রথম। কুৎলি, কুৎলি—

দ্রব ঠাকরুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কি একঘেয়ে আওয়াজ রে বাপু। চালাচ্চে তো চালাচ্চেই, আধঘণ্টা হয়ে গেল—একে মাথা ধরে আছে, ভালো লাগে? থাম্ না বাপু। মানুষে জানোয়ারে সবাই মিলে পেছনে লাগলে কি করে বাঁচি—

গোহালে গিয়ে দ্রব ঠাকরুণ মুংলি গোরুকে দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করলেন। মুংলি না খেলে তাঁর খাওয়া হয় না, এই বনজঙ্গলে ঘেরা নির্জ্জন স্বামীর-ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছেন, সবাই ছেড়ে গিয়েচে তাঁকে, কতক স্বর্গে কতক বা বিদেশে। তাঁর দুই ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি, নাৎনী—একঘর বড় গেরস্ত, যদি সবাই থাকতো আজ বজায়।

কেউ নেই আজ। মুংলিকে নিয়ে তিনি একা পড়ে আছেন গোপীনাথ-পুরের ভিটেতে। তাই গোরুটাকে অত ভালোবাসেন, মাঠে বেঁধে দিয়ে বারবার করে দেখে আসেন, নদীতে জল খাওয়াতে নিয়ে যান।

সকালে উঠে দ্রব ঠাকরুণের মনে হ'ল খিদের চোটে তিনি দাঁড়াতে পারচেন না। বাড়ীর পেছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা ডুমুর গাছ থেকে কিছু ডুমুর পেড়ে আনলেন, দুটো সজনে শাক পাড়লেন উঠোনের গাছ থেকে। ঘাটের পথে মুখুজ্যে গিন্নীর সঙ্গে দেখা। মুখুজ্যে গিন্নীর ছেলে ক'টি লেখাপড়া শেখে নি, গাঁজা খেয়ে বেড়ায়—দ্রব ঠাকরুণের ক'টি নাতিই চাকুরে, এজন্যে দ্রব ঠাকরুণের প্রতি তাঁর অন্তরে অন্তরে হিংসে বেশ।

জিজ্ঞেস্ করলেন—জ্বর হয়েছিল না কি শুনলাম খুড়ীমার?

—হ্যাঁ মা, আজ দুটো ভাত রাঁধবো। তাই সকাল সকাল ঘাটে যাচ্চি—

—আর মা, তোমার থাকতেও নেই—অমন সব নাতি নাৎনী থাকতেও তোমার এই দুর্দ্দশা—সবই কপাল!

অর্থাৎ, দুই চাকুরে নাতি আছে বলে তোমার গুমর করবার কিছু নেই? তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

নদীর ঘাটে যাবার পথে দুধারে শুধু বন আর বাগান। কোনো বাগানে বেড়া দেওয়া নেই, ঘন আশসেওড়া ও বনচালতে গাছের ডালপালা স্নানার্থীদের গায়ে লাগে বলে দু'একজন শুচিবাইগ্রস্তা বিধবা পথের নিতান্ত পাশের ডালগুলো হাত দিয়ে ভেঙে ভেঙে রেখেচেন। দ্রব ঠাকরুণ বনের মধ্যে ঢুকে উঁকি মেরে কি দেখচেন, এমন সময় মুখুজ্যেদের সেজ বৌ পেছন থেকে বল্লে—কি দেখচেন, ও খুড়ীমা?

—এই খয়েরখাগী কাঁঠালগাছটাতে কাঁঠাল আছে কিনা এক আধটা মা—একটা গাছ কাঁঠাল, সর্ব্বনেশেদের জন্যে যদি মা তার কিছু ঘরে উঠলো—নিজে থাকি অসুখে পড়ে—

—কে কাঁঠাল নিলে খুড়ীমা?

—কে নিয়েচে আমি কি চৌকি দিতে গিয়েচি বসে বসে? এই পাড়ার মধ্যেই চোরের ঝাড়—স্যাখ তোর, না স্যাখ মোর। সর্ব্বনেশে কলিকালে কি ধম্মো জ্ঞান আছে মা?

—চলুন খুড়ীমা ঘাটে যাই—

দ্রব ঠাকরুণ বকতে বকতে ঘাটের দিকে চলেন। স্নান সেরে এসে দুটো আলো চাল ফুটিয়ে ডুমুরের চচ্চড়ি করে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসেচেন এমন সময় দেখলেন বাড়ীর পেছনে কাগজী লেবু গাছটার তলায় কি খস্ খস্ শব্দ হচ্চে।

দ্রব ঠাকরুণ হাঁক দিলেন—কে রে নেবুতলায়?

ক্ষীণ বালিকাকণ্ঠে উত্তর এল—এই আমি কনক, ঠাকুরমা—

—কেন ওখানে কি শুনি? কি হচ্চে ওখানে? বের হয়ে আয় ইদিকে, সাম্‌নে আয়।

একটি ম্যালেরিয়াশীর্ণ, দশ এগারো বছরের বালিকামূর্ত্তি অকুণ্ঠপদবিক্ষেপে নেবু ঝোপের আড়াল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উঠোনে এসে দ্রব ঠাকরুণের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়ালো।

—এই আমার মার মুখে অরুচি—কিছু খেতে পারে না, তাই গিয়ে বল্লে—যা তোর ঠাকুরমার নেবুগাছ থেকে একটা নেবু—

দ্রব ঠাকরুণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বল্লেন—হ্যাঁ যা—তোর বাবা নেবু

গাছ পুঁতে রেখে গিয়েচে, যা তুলে নিয়ে আয় গিয়ে! যত সব চোর ছ্যাঁচড় নিয়ে হয়েচে—তোর মার অরুচি, তা হাটে নেবু কিনতে পারিস নে? এখানে কি? তোর বাবার গাছ আছে—এখানে?

বালিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দ্রব ঠাকরুণ আপন মনে বকে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বালিকা ভয়ে ভয়ে বল্লে—ও ঠাকুরমা—

—কি রে? কি?

—আমি চলে যাব?

—কেন, তোকে কি বেঁধে রেখেচি নাকি? যা—

—নেবু দেবেন না?

দ্রব ঠাকরুণ চুপ করে আপনমনে বড় বড় কয়েকটি ভাতের গ্রাস মুখে পুরে দিলেন, বাঁ হাতে ঘটি নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে অপেক্ষাকৃত নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন—তোর পরনের কাপড় কাচা? ঐ কলসীটা থেকে আমায় একটু খাবার জল গড়িয়ে দে দিথি—

মেয়েটি তাই করলে। দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—অরুচি কেন? তোর মার কি ছেলেপিলে হবে না কি?

—তা তো জানিনে ঠাক্‌মা।

—যা, নিয়ে যা—তবে একটার বেশি নিবি নে—বুঝলি?

দ্রব ঠাকরুণ খেয়ে উঠে মাদুর পেতে একটু শুয়েচেন, এমন সময় মুখুজ্যে বাড়ীর বড় ছেলে অতুল এসে বল্লে—ও ঠাক্‌মা, শুয়েচেন নাকি?

—হ্যাঁ, কে? অতুল? কি ভাই?

—আপনার পিটুলি গাছ আছে? কলকাতা থেকে দেশলাইয়ের কারখানার লোক এসেচে গাঁয়ের পিটুলি আর শিমুল গাছ কিনতে। আপনার যদি থাকে—বেশ দর দিচ্চে—

—না বাপু, আমার নেই।

—কেন আপনার বাড়ীর পেছনের হরি রায়ের দরুণ জঙ্গলে তো বেশ বড় বড় পিটুলি গাছ আছে—

—না, আমি বেচবো না।

আসলে দ্রব ঠাকরুণের গাছপালার ওপর বড় মায়া, স্বামীর আমলের যা কিছু যৎসামান্য জমিজমা, তা প্রায়ই জঙ্গলাবৃত এবং বড় বড় বাজে গাছে

ভর্ত্তি। জ্বালানি কাঠ হিসেবে বিক্রী করলেও এ কয়লার দুর্ম্মূল্যতার দিনে দু'পয়সা পাওয়া যায়, কিন্তু গাছের একটা ডাল কাটতেও তাঁর মায়া। না খেয়ে কষ্ট পাবেন, তবুও গাছ বিক্রীর কথা তুলতেও দেবেন না। একজনের শুঁয়োপোকা লাগাতে সে ডুমুরপাতা পারতে এসেছিল, কারণ ডুমুর পাতা দিয়ে শুঁয়ো-লাগা জায়গাটা ঘসলে শুঁয়ো ঝরে যায়, কিন্তু দ্রব ঠাকরুণ তাকে ডুমুর পাতা পাড়তে দেননি। হয়তো এটা অতিরঞ্জিত গল্প মাত্র, তবে এর দ্বারা তাঁর মনের অবস্থা অনেকটা বোঝা যাবে।

বৈকালের দিকে দ্রব ঠাকরুণ বেশ ভালোই বোধ করলেন। পাড়ার এক প্রান্তে জঙ্গলে ঘেরা বাড়ী, বড় কেউ এদিকে বেড়াতে আসে না, এক ন' ঠাকরুণ ছাড়া কেউ উঁকি মেরে বড় একটা দেখে না, দ্রব ঠাকরুণ কিন্তু লোকজন, আড্ডা, মজলিস প্রভৃতি ভালোই বাসেন। কেউ এসে গল্প করে, এটা তাঁর খুবই ইচ্ছে—কিন্তু ও বেলার সেই বালিকাটি ছাড়া বিকেলে আর কেউ এল না। সেও এসেচে নিজের স্বার্থে।

—ঠাকুর-মা, একটা নেবু দেবেন?

—কেন রে, কেন? ওবেলা তো—

—ওবেলার নেবু ওবেলা ফুরিয়েচে, এবেলা একটা দরকার—মা বল্লে—

—আচ্ছা, আয় উঠে বোস একটু—

বালিকাটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে বসে। নয়তো নেবু পাওয়া যায় না। বুড়ীর কাছে বসতে তার ইচ্ছে হয় না, তার সমবয়সী বালিকারা রায়পাড়ার পুকুরধারে এতক্ষণ ফুল তোলাতুলি খেলা আরম্ভ করে দিয়েচে···তার প্রাণ রয়েচে সেখানে পড়ে। কিন্তু দ্রব ঠাকরুণের নিঃসঙ্গ মন যাকে হয় আঁকড়ে ধরতে চায় এই নির্জ্জন বৈকাল বেলাটিতে···তবুও দুটো কথা বলবার লোক তো বটে।

দ্রব ঠাকরুণ আপন মনেই বকে চলেচেন, নাৎবৌয়ের মন্দ ব্যবহারের কথা, নাতির ছেলে খোকনের অলৌকিক গুণাবলী, ছোট নাতি পরেশ তাঁকে কি রকম ভালবাসে···এই ধরণের নানা কথা শুনতে শুনতে ক্ষুদ্র শ্রোতাটির হাই ওঠে, সে করুণ স্বরে বলে—ঠাক্‌মা, মা সাবু চড়িয়ে আমায় বল্লে, নেবু নিয়ে আয়, বেলা গেল—

—হ্যাঁ হচ্ছে হচ্ছে—তারপর শোন্ না...

—মা বক্‌বে—নেবু নইলে সাবু খেতে পারবে না—

—আচ্ছা, শোন্—তারপর খোকন্মণি সেই পেয়ারা তো খাবেই, কিছুতেই ছাড়ে না—ওর মাও দেবে না—বড্ড হেজলদাগড়া মেয়ে ওর মা, আমি বলি, বৌ—চাচ্চে খেতে, এক টুকরো ওকে ত্থাও—তা আমায় বললে—অপনি চুপ করে থাকুন, আপনি কি বোঝেন ছেলেমেয়ে মানুষ করার—একালের মাও অন্য রকম, আপনাদের সেকাল গিয়েচে।

আমি জানিনে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে—তবে তুই তোর বর পেলি কোথা থেকে রে আবাগের বেটি?

—আমি এবার যাই ঠাক্‌মা—নেবু একটা—

—আচ্ছা তা যা নিয়ে একটা নেবু—শুনলি তো সব কাণ্ডখানা? দিদি-শাশুড়ী বড় মন্দ—

এমন সময়ে বাড়ীর বাইরে একখানা গোরুর গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। খুকী কৌতূহলে চেয়ে বড় বড় চোখ করে বল্লে—ও ঠাক্‌মা, কে যেন এল গাড়ী করে—তোমার ওই তুঁত-তলায় গাড়ী দাঁড়ালো—

বলতে বলতে দ্রব ঠাকরুণের মেজ নাতি নীরদচন্দ্র ছুটি ভারী মোট দু'হাতে ঝুলিয়ে বাড়ী ঢুকে ডাক দিলে—ও ঠাক্‌মা—

দ্রব ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বল্লেন—কানু? আয়, আয় ভাই—ভালো আছিস্?

কানু এসে মোট নামিয়ে পিতামহীকে প্রণাম করলে, বালিকাটির দিকে চেয়ে বল্ল—এ হরিকাকার মেয়ে কনক না? ওঃ কত বড় হয়ে গিয়েচে—ভালো আছিস কনকী? নে দাঁড়া—একখানা গজা নিয়ে যা—

পুঁটলি খুলে মেয়েটির হাতে একখানা বড় গজা দিতে সে নিঃশব্দ হাসিমুখে হাত পেতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বড় মোটটার মধ্যে আরও কি কি জিনিস আছে দেখবার আগ্রহে। তাদের বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে বিদেশে চাকুরি করে—নিতান্তই অল্পবিত্ত গৃহস্থের সংসার—চাকুরে বাবুরা বাড়ী আসবার সময় কি কি অপূর্ব্ব জিনিস না জানি নিয়ে আসে!

দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—তারপর, কি মনে করে? হঠাৎ যে? বুড়ীকে মনে পড়েচে তা হোলে? বাবাঃ সারা আষাঢ় মাস অসুখে ভুগে ভুগে —তাই এখনও কি সেরেচি। এমন একটা লোক নেই যে, এক ঘটি জল এগিয়ে ত্থায়—ওই ন' বৌ ছিল তাই—এত চিঠি দিলাম, না এল টেবু না এল বিন্দে, না এলে তুমি—

সন্ধ্যার পর ন' ঠাকরুণ খবর পেয়ে ছুটে এলেন। গ্রামের ছেলে, জন্মাতে দেখেছেন, অনেক দিন পরে দেখে খুব খুশি। কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করার পর বল্লেন—হ্যাঁ কানু, তা তোমরা সোনার চাঁদ সব নাতি থাকতে বুড়ী এখানে বেঘোরে মারা যাবেন? কালাজ্বরে ধরেছে—এই আজ ভাল আছে, কাল এমন সময় সব লেপ কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়বে। কে ত্থাখে, কে শোনে—তার ওপর আবার গোরু—একটা বিহিত করে যাও যা হয়—নইলে—

কানু বল্লে—সে সব জন্যেই তো আসা। চিঠি পেয়েচি অনেক দিন, সায়েব ছুটি দিতে চায় না—পরের চাকরি—তাই দেরি হোল।

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—ভালো কথা ন' বৌ, দুখানা গজা নিয়ে যাও, জল খেয়ো—কানু এনেচে আমার জন্যে—তা ও যেমন পাগল, আমার কি দাঁত আছে যে গজা খাবো? নিয়ে যাও ন' বৌ।

—তা ত্থাও দুখানা, নিয়ে যাই। ভালোটা মন্দটা এ পাড়াগাঁয়ে তো চক্ষেই দেখতে পাইনে দিদি—বেঁচে থাক্ তোমার সোনার চাঁদ নাতিরা, তোমার ভাবনাটা কিসের? বিশেষ করে কানুর মত ছেলে নেই এ গাঁয়ে—আমি যা' বলবো তা মুখের ওপরই বলবো বাপু—

ফলে ন' বৌ দু'খানার জায়গায় চারখানা গজা হাতে খুশি মনে বাড়ীর দিকে চল্লেন আর কিছুক্ষণ পরে।

নাতি-ঠাকুরমায় পরামর্শ হ'ল রাত্রে। কানু এক মতলব ফেঁদে এসেচে। ঠাকুরমাকে সে কাশী নিয়ে গিয়ে রেখে আসবে। তার একজন কে বন্ধুর মা কাশীতে থাকেন, সেই একই বাড়ীতে ঠাকুরমাকে রাখবে। পরদিন সকালে ন' বৌ শুনে খুব খুশি, অমন সব নাতি থাকতে ভাবনা কি? তীর্থধর্ম্ম করার সময় তো এই। তাঁর যদি আজ ছেলেটাও বেঁচে থাকতো।

আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সাত মাস মাত্র বয়সে ন' ঠাকরুণের সে ছেলে মারা গিয়েচে—সে-ই প্রথম, সেই শেষ। তাঁর আর ছেলেপুলে হয় নি।

যাবার দিন দ্রব ঠাকরুণ প্রিয় মুংলি গোরুটার ভার দিয়ে গেলেন ন' বৌকে। বার বার মাথার দিব্য দিলেন, মুংলিকে যেন যত্ন করা হয়। বল্লেন—ও গোরু তোমারই হয়ে গেল ন' বৌ, আমায় আশীর্ব্বাদ করো যেন কাশীতে হাড় ক'খানা রাখতে পারি—নাতিদের ঘাড়ের বোঝা যেন নেমে যাই—আমার বড় নাতির ভাবনা কি, তার সচ্ছল অবস্থা, লুচি পরোটা জলখাবার, তেলে ঘিয়ে

কলকলে করে পাঁচ ব্যান্নুন রান্না—আমি বুড়ো হয়েচি, ওদের সংসারে সেকেলে মতের লোকের জায়গা আর হয় না এখন—

ঘরের আড়ায় শুকনো নারকোল পাতার আঁটি, পাকাটির বোঝা জোগাড় করা ছিল, বর্ষায় উনুন ধরানোর কষ্ট বলে সুগৃহিণী দ্রব ঠাকরুণ যে-সময়ের-যা' সঞ্চয় করে রাখতেন। কাশীবাস করতে যাচ্ছেন, পেছনটান থাকলে তীর্থবাস হয় না—সে সব দান করে গেলেন কতক ন' ঠাকরুণকে, কতক এ'কে ওকে।

কনক একটা পাকা শসা হাতে এনে বল্লে—শসা খাবে ঠাক্‌মা ?

—তুই এক বোঝা পাকাটি নিয়ে যা কনকী—ঠাক্‌মাকে মনে রাখবি তো ? হ্যাঁ-রে।

কনক অনেকখানি ঘাড় নেড়ে বল্লে—হুঁ-উ-উ—

ন' ঠাকরুণ চোখের জল ফেললেন যাবার সময়ে।

দ্রব ঠাকরুণ ট্রেনে কোনো রকমে শুচিতা বজায় রেখে কাশী এসে পৌছলেন। একটা গলির মধ্যে দোতলা একটা বাড়ীর নীচের তলার ঘরে কানুর সেই বন্ধুর মা কাশীবাস করচেন। পাশেই আর একখানা ছোট ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে দ্রব ঠাকরুণের জন্যে। অপর বৃদ্ধাটির কাছে চাবি ছিল ঘরের, তিনি চাবি খুলে দিলেন। দ্রব ঠাকরুণ নিজের জিনিসপত্র নিয়ে সেই ঘরে অধিষ্ঠান হোলেন।

দ্রব ঠাকরুণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সভয়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁর প্রতিবেশিনী নদে' জেলার লোক। কথাবার্ত্তার ধরণ ও সুর শহুরে ও সম্পূর্ণ মার্জ্জিত। যশোর জেলার মানুষ দ্রব ঠাকরুণের ভয় পাবারই কথা বটে। তিনি এসে দ্রব ঠাকরুণের ঘরে ঢুকে বল্লেন—আপনার রান্নবান্নার ব্যবস্থা কাল থেকে করলেই হবে—আজ আমার ঘরে দুধ আর মিষ্টি আছে, আপনার জন্যে রাখলুম কিনা।

দ্রব ঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে বল্লেন—ও !

প্রতিবেশিনী নিজের ঘর থেকে খাবার এনে বল্লেন—আপনার লোমবস্ত্র বার করুন—

দ্রব ঠাকরুণ ভালো বুঝতে না পেরে বল্লেন—কি বল্লেন ?

দ্রব ঠাকরুণের 'বল্লেন' এই কথায় 'ব'-এর উচ্চারণ যশোর জেলার

উচ্চারণরীতি অনুযায়ী প্রসারিত উচ্চারণ, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার উচ্চারণে এই সব স্থানের উচ্চারণ যতদূর সম্ভব আকুঞ্চিত। 'বল্লেন'-এর উচ্চারণ 'বোল্লেন —'ও'কার-এর উচ্চারণও যতদূর সম্ভব ঘোরালো।

—বোলচি, লোমবস্ত্র বের করে পরুন, একটু কিছু মুখে দিতে হবে তো?

লোমবস্ত্র কি জিনিস, পাড়াগাঁয়ের মানুষ দ্রব ঠাকরুণ কখনো শোনেন নি—তবে জিনিসটা যে বস্ত্রজাতীয় দ্রব্য তা বুঝতে পারলেন, বল্লেন—সে তো আমার নেই!

—লোমবস্ত্র নেই? আপনি জপ করেন কি পোরে?

—এই সাদা থান প'রেই জপ করি, আর কোথায় কি পাবো?

বাড়ীখানা গলির মুখে হ'লেও প্রায় সদর রাস্তার ওপরে। অনেক রাত পর্য্যন্ত গাড়ীঘোড়া রাস্তার গোলমাল থামে না। নিরিবিলি বনজঙ্গলের মধ্যে বাড়ীতে একা থাকা দ্রব ঠাকরুণের চিরদিনের অভ্যাস, এত গোলমালে বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। উঃ কি মুস্কিলেই পড়া গেল! নাঃ, কাশীর লোক ঘুমোয় কখন?

কানু তার পরদিন বন্ধুর মার হাতে পল্লীবাসিনী পিতামহীকে সমর্পণ করে কর্ম্মস্থানে চলে গেল, তার ছুটি ফুরিয়েচে। বন্ধুর মার নাম নীরজাবাসিনী, দ্রব ঠাকরুণের চেয়ে তাঁর বয়েস দু'পাঁচ বছর কম হবে, মাথার সব চুল এখনও পাকেনি—তবে সেটা স্বাস্থ্যের গুণেও হতে পারে।

দ্রব ঠাকরুণ এঁর সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলে বেড়াতে গেলেন—খুব লোকজনের ভিড়, গান, বক্তৃতা, কথকতা। এক গেরুয়া কাপড় পরা সন্নিসির চারিপাশে খুব ভিড়, নীরজা সেখানে জুটলেন গিয়ে। কর্ম্মবাদ, সেবাধর্ম্ম ইত্যাদি নিয়ে সন্নিসি কি সব কথা বলে যাচ্ছেন, দ্রব ঠাকরুণ অতশত বুঝতে পারলেন না। ফিরবার পথে দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—উনি কেডা?

—উনি রামকৃষ্ণ মঠের একজন বড় ইয়ে—স্বামী সেবানন্দ।

—কি মঠ?

—কেন রামকৃষ্ণ মঠের কথা শোনেন নি? ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের—মস্ত বড় কাণ্ড ওঁদের—

—রাম আর কৃষ্ণ দুই ঠাকুরের নাম বুঝি?

নীরজা বিস্ময়ে দ্রব ঠাকরুণের দিকে চেয়ে বল্লেন—আপনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শোনেন নি?

—না। কে তিনি—কই না—এখানে আছেন?

নীরজা আর কোন কথা বল্লেন না। এমন বর্ব্বরের সঙ্গেও তিনি বেড়াতে বেরিয়েচেন যে রামকৃষ্ণদেবের নাম পর্য্যন্ত জানে না! দ্রব ঠাকরুণের কোনো দোষ নেই, তিনি অজ সেকেলে লোক, অজ পল্লীগ্রাম ছেড়ে জীবনে কখনো কোথাও যান নি। গোপীনাথপুরের জঙ্গলে ও-নাম কখনো কারো মুখে শোনেনও নি। তিনি জানেন, রাম, কৃষ্ণ, রাধা, দুর্গা, লোচনপুরের জাগ্রত কালী, কালীঘাটের কালী ইত্যাদি। অত বড় নামের কোনো ঠাকুরের কথা, কই—কেউ তো তাঁকে বলে নি?

দ্রব ঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গিনী তাঁকে নিতান্ত নাস্তিক, অজ্ঞ, মূর্খ বলে না ঠাওরান।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই দ্রব ঠাকরুণ বুঝে নিলেন সঙ্গিনীটি ধর্ম্ম-বাতিকগ্রস্তা। সাধু সন্নিসির ভক্ত। যদি কোথাও কোনো নতুন ধরণের সাধু মন্দিরে কি ঘাটে বসে আছে, তবে আর নিস্তার নেই। সেখানে বসে অমনি গরুড়ের মত হাত জোড় করে বক্ বক্ বকুনি জুড়ে দেবে। আর কি-সব কথা জিজ্ঞেস করবে, কর্ম্মফল কি, পুনর্জন্ম কি, হেনো তেনো। রাস্তাঘাটে বেরুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, বাসায় ফিরবার নামটি নেই। এত বিরক্ত ধরে দ্রব ঠাকরুণের—কিন্তু তিনি কি করবেন? কাশীর রাস্তা চেনেন না—একাও বাসায় ফিরতে পারেন না সঙ্গিনী না ফিরলে।

একদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি দেখতে গেলেন দুজনেই।

সেখানে এক সন্ন্যাসিনী নাটমন্দিরে বসে আছেন, গেরুয়া কাপড় পরনে, মাথায় জটা, অনেক মেয়েছেলের ভিড় হয়েচে সেখানে। নীরজা তো সাধু সন্ন্যাসী দেখলে সর্ব্বদা একপায়ে খাড়া, চারিপাশের ভক্তের দলে গেল মিশে তাঁকে নিয়ে। দ্রব ঠাকরুণ শুনতে লাগলেন কেউ জিজ্ঞেস করচে, মাইজি, ঠাকুরের দেখা পাওয়া যায়?

কেউ বলচে—মাইজি, আমার মেয়ের মাদুলি দেবেন তো আজ?

—আজ আমার হাতখানা দয়া করে দেখবেন কি?

নীরজা জিজ্ঞেস করলেন—মাইজি, আমার ভক্তি হচ্চে না কেন?

দ্রব ঠাকরুণ শুনে মনে মনে হেসে আর বাঁচেন না। সর্ব্বদা সাধুসন্নিসি নিয়েই আছো, এখানে প্রণাম, ওখানে ধন্না, দুঘণ্টা ধরে নাক টেপা—এতেও

যদি তোমার ভক্তি না হয়ে থাকে, গঙ্গার জলে ডুবে মরো গিয়ে—ঢং দেখে আর বাঁচি নে! মরণ আর কি!

তারপর সবাই চলে গেল—নীরজা সেই যে সেখানে চোখ বুজে ধ্যানে না কি যোগে বসলো আর ওঠে না। দ্রব ঠাকরুণও কিছু বলতে সাহস পান না। এদিকে তাঁর মনে পড়লো সুজি একদম নেই, সেকথা এতক্ষণ মনে ছিল না, এত রাত হয়ে গেল কোথায় বা সুজি কেনা হবে। রাত্রে একটু মোহনভোগ খাওয়া, তাও আজ ধর্ম্মের ভিড়ে বুঝি বা হয় না।

বসে বসে দ্রব ঠাকরুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মন্দির থেকে বাঙালী মেয়েরা প্রায় সব চলে গিয়েচে, এদেশী লোক যারা হিন্দি মিন্দি বলে, তাদের দলই যাচ্চে আসচে। ওদের কথা তিনি কিছুই বুঝতেও পারেন না, বলতেও পারেন না।

আজ মাস তিনেক গ্রাম থেকে এসেচেন। বেশ শীত পড়ে গিয়েচে কাশীতে। মুংলি গরুটার কথা এত করেও আজকাল মনে পড়চে! শীতের রাত্রে পাছে মুংলির কষ্ট হয় বলে তিনি গোয়ালে আগুন করে রাখতেন। তাঁর গাছটাতে খুব ডুমুর হয়েচে নিশ্চয়, কে জানে একটা গাছ ডুমুর কারা খাচ্চে? কম ডুমুর হয় গাছটাতে! আহা, ন'বৌ কি মুংলিকে অত যত্ন করচে?—তাঁর মত? তিনি যে পেটের মেয়ের মত ওকে···না, তাঁর চোখে জল এসে পড়ে।

আজই এতকাল পরে ন' বৌয়ের পত্র এসেচে দেশ থেকে···তাই বেশি করে মনে পড়চে দেশের কথা। ন'বৌ লিখেচে মুংলি ভালো আছে, শীগগির বাছুর হবে। তাঁর বাড়ীর দাওয়ার খুঁটি না বদলালে নয়। কানু বা বিন্দেকে যেন চিঠি লেখা হয় সেজন্যে।

নীরজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন···দিদি, চলো যাই···সত্যি কি পবিত্র স্থান, না? ইচ্ছে হয় না যে আবার সংসারে ফিরে যাই, রাঁধি খাই।

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—মরো-না এখানে শুকিয়ে হত্যে দিয়ে—কে মাথার দিব্যি দিয়েছে রাঁধতে খেতে!

নীরজা বল্লেন—করন্যাসটা অভ্যেস করচি কিনা, প্রায় হয়ে এল—

দ্রবময়ী নীরব। মাগীটা পাগল নাকি? কি সব বলে বোঝাও যায় না। রাত দুপুর বাজলো, বাবা, এখন বাসায় চল্ দিকি!

বাসায় এসেও কি তাই নিস্তার আছে?

নীরজা ডাকবে তার ঘর থেকে—ও দিদি একটু গীতাপাঠ করি শোনো—

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁকে যেতে হয়। গীতা-টিতা ওসব তিনি বোঝেন না। সুবচনীর ব্রতকথা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শিবরাত্রির ব্রতকথা এসব শোনা তাঁর অভ্যেস আছে, বেশ দিব্যি বুঝতেও পারেন—এসব শক্ত শক্ত কথার কি কাওমাও, এক বর্ণও যদি বোঝেন! আর মাগীর চোখ উল্টে, কান্না কান্না মুখের ভাব করে পড়বার ভঙ্গিই বা কি! দ্রব ঠাকরুণ না পারেন হাসতে, না পারেন হাসি চাপতে। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে গা!

নীরজা পড়তে পড়তে বলবেন—আহা-হা! কি চমৎকার!

দ্রব ঠাকরুণ বসে ঢুলতে ঢুলতে ভাববেন—থামলে যে বাঁচি—

সকালে উঠে নীরজা বল্লেন—আজ আমার গুরুদেব আসবেন, দিদি দু'খানা লুচি ভেজে দিও তো আমার ঘরে বসে।

বেলা দুটোর সময় এক সন্নিসি এসে হাজির। বেশ মোটা ভুঁড়িওয়ালা, এই লম্বা দাড়ি। নীরজা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে দু'বার মাথা ঠুকলেন গুরুদেবের পাদপদ্মে। আহারাদির যোগাড় করতেই কাটলো সারাদিন—তিনসের দুধ মেরে একসের হ'ল, ঘরে রাবড়ি মালাই তৈরী হ'ল। লুচি ভাজা হ'ল। সন্ধ্যার সময় নীরজা বসলেন গুরুর কাছে কি সব ক্রিয়া শিখতে। আসন না মাথামুণ্ডু তাই শিখতে। যত বা এ বকে, তত বা ও বকে। মনে হ'ল বুঝি কানের পোকা সব বেরিয়ে যায়।

গুরুদেব বাঙালি। রাত ন'টার পরে দ্রব ঠাকরুণকে ডাক দিলেন।

বল্লেন—তোমার বাড়ী কোথায়?

—গোপীনাথপুর, যশোর জেলা—

—কে আছে বাড়ীতে?

—নাতিরা আছে, তাদের ছেলে বৌ আছে।

—তুমি কাশীবাস করতে এসেচ?

—হ্যাঁ।

—নাম কি?

—দ্রবময়ী দেব্যা—

—দীক্ষা হয়েচে?

—না।

নীরজা চোখ কপালে তুলে বল্লেন—কি সর্ব্বনাশ! দীক্ষা হয়নি এতদিন? তা তো জানতাম না?

গুরুদেব বল্লেন—দীক্ষা নিতে হবে মা তোমাকে।

—আমার পয়সা নেই, দীক্ষা নিতে গেলে খরচ আছে। নাতিরা এগারো টাকা করে মাসে পাঠায়—তার মধ্যে ঘর ভাড়া, তার মধ্যে খাওয়া। পয়সা পাই কোথায়?

—দীক্ষা না নিলে কাশীবাসে ফল কি মা?

—ফলের জন্যে তো আসিনি, শরীরডা সারাতি এসেছিলাম।

নীরজা রাগের সুরে বল্লেন—শরীর আগে না পরকাল আগে?

দ্রব ঠাকরুণ চুপ করে রইলেন।

গুরুদেব বল্লেন—নীরজা-মার কথার উত্তর দাও—চুপ করে থাকলে হবে না।

নীরজা বল্লেন—গীতার ভক্তিযোগ সেদিন পড়ছিলাম, শুনলে তো দিদি? কর্ম্মের চেয়েও ভক্তি বড়, স্বয়ং ভগবান বলচেন--

আঃ কি বিপদ! মাগীর সব সময়েই কি আবোল-তাবোল বকুনি?

মুখে বল্লেন—আমি তো কিছু বুঝি নে, আপনারা যা বলেন। তবে এবার কিছু হবে না। নাতি সাতটাকা পাঠিয়েছিল, তা ঘর ভাড়াতেই গিয়েচে। হাতে টাকা না থাকলি—

তবুও দু'জনেই নাছোড়বান্দা। দীক্ষা নিতেই হবে।

গুরুদেব বল্লেন—কাশীবাস করচো মা, তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েচে। গুরুদীক্ষা না নিলে যে সবই মাটি। আজ আছ, কাল নেই। পৃথিবী কিছুই না—ইহকাল কিছুই না—

নীরজা বল্লেন—গুরুর মুখেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ইহকালেও তিনি, পরকালেও তিনি—

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—আ মরণ মাগীর! তবে সোয়ামী কোথায় যাবে মেয়েদের? ধ্যান ত্যাখো না—! যাই হ'ক, বহু তর্ক করেও দ্রব ঠাকরুণকে দ্রব করা গেল না। নাম দ্রবময়ী হ'লে কি হবে, ভেতরে বেজায় শক্ত। নীরজা অবিশ্যি তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি মতে একজন সত্তর বছরের মৃত্যুপথযাত্রিণীর ভালো করবারই যথেষ্ট চেষ্টা করছিলেন, সে রাজি না হ'লে তিনি আর কি করবেন?

নীরজার ভক্তি—হ্যাঁ সে দেখবার মত একটা জিনিস বটে। গুরুর পাদোদক পান না করে তিনি দাঁতে তৃণ কাটবেন না। গুরুর বাক্য বেদ-বাক্যের চেয়েও মূল্যবান তাঁর কাছে। পুরোনো একছড়া হার ছিল, সেটা বিক্রি করে এসে টাকা তুলে দিলেন গুরুদেবের হাতে।

কথাটা শুনে দ্রব ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন—অতগুনো টাকা দিয়ে দিলে গুরুদেবকে ?

—টাকা সার্থক হ'ল, দিদি—

—তোমার নিজের হার ?

—ও আমার বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ী থেকে দিয়েছিল—তিনি হাতে করে দিয়েছিলেন—

—সেই হার তুমি দিয়ে দিলে বেচে ?

—দিদি, সংসার অনিত্য, সবই অনিত্য। কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী ? সবই ভগবানের মায়া। মায়ায় সব ভুলে থাকা—গুরুই কেবল নিত্য বস্তু—

—তা তো বটে।

এ মাগীর মুখে সব সময় বড় বড় কথা। দিগে যা তোর সব কিছু গুরুর পাদপদ্মে বিলিয়ে,—তাঁর কি ? বিয়ের পরে স্বামী নিজের হাতে যে হারছড়া দিয়েছিল, তা কোনো মেয়েমানুষ এভাবে ঘুচিয়ে দিতে পারে ? গভীর রাত পর্য্যন্ত শুধু এই কথাটিই বার বার তাঁর মনে পড়ে। সে সব দিন ঝাপসা হয়ে গিয়েচে, মনের আকাশ বিস্মৃতির মেঘে ঢাকা। ওই গোপীনাথপুরের ভিটে অমন ছিল কি তখন? ফুলশয্যার রাত।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, গত আষাঢ় মাসের প্রথমে উত্তর দিকের ভাঙা পাঁচিলের গায়ে এতটুকু একটা শসাগাছ নতুন বর্ষার জল পেয়ে গজিয়েচে দেখে তিনি শুকনো কঞ্চি কুড়িয়ে একটা মাচা বেঁধে দিয়েছিলেন—এতদিনে গাছ বড় হয়েচে, কত শসার জালি পড়েচে গাছটাতে। কে যাচ্ছে সে বনের মধ্যে ? হয়তো কনকী আসে লেবু তুলতে—এক গাছ লেবু রেখে এসেছিলেন। সে-ই হয়তো শসা পেড়ে নিয়ে যায়—কে জানে ?

হঠাৎ কি একটা কুস্বরে দ্রব ঠাকরুণ চমকে ওঠেন। নীরজার ঘর থেকে শব্দটা আসচে।

মাগী এত রাত্রে করে কি ? হুস্ হুস্ করে অত জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচে কেন ? ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা লাগলো নাকি ?

দ্রব ঠাকরুণ ডাকলেন—শুনচো—ওগো—কি হয়েচে? ওগো—

নীরজা বল্লেন—ডাকচেন কেন দিদি?

—বলি ও শব্দ কিসের?

—কুম্ভকের রেচক-পূরক অভ্যেস করচি—অনেক রাত ভিন্ন হয় না কিনা,—ঠাকুর তাই বলে গেলেন।

সে আবার কি রে বাবা! মাগী তো ঘুমুতেও ছায় না রাত্তিরে!

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—যাক গে—ঘুমের ঘোরে মুখ-চাপা হয় নি তো?

—না দিদি—ঘুমুইনি এখনও। ঘুমুলে যোগের ক্রিয়া হয় না। জীবনটা যদি ঘুমিয়েই কাটাবো, তবে পরকালের কাজ করবো কখন?

—তা বেশ, বেশ।

—দিদি—ঘুমুলেন?

—না, কেন?

—নির্ব্বিকল্প সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মনে শান্তি পাচ্চি নে, পাবোও না। দেহ কি-জন্যে দিদি? ঘুমুবার জন্যে নয়। আরামের জন্যে নয়—শুধু নিজের কাজ করে যাওয়ার জন্যে। দিন কিনে নাও, শুধু দিন কিনে নাও—

দ্রব ঠাকরুণের পিত্তি জ্বলে গেল। কিন্‌গে যা দিন মাগী, যদি তোর পয়সা থাকে! রাত্তিরে একটু ঘুমুতে দে অন্তত।

শীতকাল এসে গেল। কানু বড়দিনের ছুটিতে একবার কাশী এসে পিতামহীর সঙ্গে দেখা করে গেল।

দ্রব ঠাকরুণ তাঁকে বল্লেন—কানু ভাই, অন্য একটা বাসা পাওয়া যায় না?

কানু বিস্মিত হয়ে বল্লে—কেন এখানে কি হ'ল! সত্যর মা রয়েচেন, এই তো সব চেয়ে ভালো—

—ও মাগী পাগল।

—পাগল! সে কি!

—না বাবু, বেজায় ধর্ম্মিষ্ঠি। অত ধর্ম্মিষ্ঠি আমার পোষাবে না। আমাকে তুই সরিয়ে নিয়ে যা—

কানু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে। ঠাকুরমার যেমন কাণ্ড!

বল্লে—আচ্ছা ঠাক্‌মা, শেষ বয়েসে কাশীবাস করতে এলে—না হয় তুমিও হও একটু ধর্ম্মিষ্ঠি! হ্যাঁ উনি ওই রকমেই বটে। সত্য বলছিল, মা কিছুতেই

দেশে থাকতে চান না। এই গত বোশেখ মাসে সত্যর ছোট ভাইয়ের বিয়ে গেল, ওঁর ছোট ছেলের—ওঁকে কত চিঠিপত্তর, কত অনুরোধ—কিছুতেই গেলেন না। বল্লেন, যে মায়া একবার কাটিয়েচেন, তাতে আর জড়িয়ে পড়তে চান না। ছোট ছেলে টেলিগ্রাম পর্য্যন্ত করলে, কোনো ফল হ'ল না।

দ্রব ঠাকরুণ অবাক হয়ে বল্লেন—বলিস কি রে কানু, সত্যি ?

—মিথ্যে বলচি তোমার কাছে ঠাক্‌মা ?

—আমায় এখান থেকে তুই সরিয়ে দে ভাই।

—ছিঃ—আচ্ছা, তুমি অত নাস্তিক কেন ঠাক্‌মা ? ওঁর সঙ্গে থেকে একটু ধর্ম্ম শেখো না। চিরকালই বিষয় আর সংসার নিয়েই তো কাটালে।

—হাঁপ লেগে মরে যাবো যে এখানে থাকলে—

—আবার ওই সব নাস্তিকের মত কথাবার্ত্তা—ঠাকুরমা তুমি কি ?

শীত কেটে গ্রীষ্ম এল, চলেও গেল। আবার আষাঢ় মাসের প্রথম। দেশের খবর নেই অনেকদিন। ন'ঠাকরুণের চিঠি আগে আগে আসতো—গত তিন চার মাস তাও বন্ধ। কথায় কথায় একদিন নীরজাকে কথাটা বলেই ফেল্লেন।

—দেশে কে আছে আপনার ? শুনেচি সেখানে থাকে না কেউ ?

—বাড়ীটা, গাছটা পালাটা—

—দিদি, এখনও ঐ সবের মায়া ? বিশ্বনাথের পাদপদ্মে মন সমর্পণ করুন, সব বন্ধন ঘুচে যাবে। কেউ কিছু নয়, কিছু নয়—একমাত্র তিনিই সত্যি। বলে নীরজা চোখ কপালে তুলে ওপরের দিকে চেয়ে রইলেন। দ্রব ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—ওই যাঃ, দাঁড়াও, কড়ার দুধটুকু বুঝি বেড়ালে খেয়ে গেল! নাঃ বেড়ালের জ্বালায়—যত বা বেড়াল, তত বা বাঁদর। অমন গামছাখানা সেদিন—

—দিদি, আজ আমার সঙ্গে চলুন কেদার ঘাটে। কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা করবেন উপীন কথক। শোনবার জিনিস। কাশীতে এসে কাশীখণ্ড শুনতে হয়—

—আমার শরীর ভালো না, আজ থাক্, তুমি যাও—

নীরজা নাছোড়বান্দা, অবশেষে নিয়ে গেলেন দ্রব ঠাকরুণকে। কেদার ঘাটে এর আগেও দু'তিন বার দ্রব গিয়েচেন সত্যর মার সঙ্গেই। ওপরের রানার চওড়া চাতালের একপাশে ফর্সা রোগামত কথক ঠাকুর কথকতা শুরু

করেচেন—তাঁকে ঘিরে বাঙালী মেয়েপুরুষের ভিড়। পুরুষের চেয়ে মেয়ে অনেক বেশি।

সত্যর মা জিজ্ঞেস করলেন—দিদি, প্রণামী কিছু এনেচেন তো?

—তা তো বল্লে না—আনিনি—

—আট আনার কম দেওয়া যায় না। আচ্ছা, আপনারটা আমি দিয়ে দেব এখন—

—আমার আট আনা না দিয়ে চার আনা বরং ছাও। নাতিরা ক'টাকা বা পাঠায়?

—এখানে যা দেবেন দিদি, পরকালে তোলা রইল—

বর্ষার গঙ্গায় ঢল নেমেচে। কেদার ঘাটের সামনের নদীতে কাদের বড় একটা বজরা ভেসে চলেচে, দু'তিনখানা পান্সিতে সুসজ্জিতা নরনারী নদীভ্রমণে বার হয়েচে। রামনগরের দিকে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু বাড়ীর ছাদের কানিসে তরল সোনার মত ঝিলমিল করচে রাঙা রোদ। কথক ঠাকুর সুকণ্ঠে গান ধরেচেন, কাশী সকল তীর্থের সার, মৃত্যুর সময় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্বয়ং বিশ্বনাথ কানে মন্ত্র দেন—মানুষের শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটে—এই হ'ল গানের অর্থ।

দ্রব ঠাকরুণের মন অজ্ঞাতে অনেকদূরে চলে গেল। তাঁর খয়েরখাগী গাছে কত কাঁঠাল হয়েচে এই আষাঢ় মাসে, বড্ড কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্য্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে আম গাছে আমও নিশ্চয়ই খুব ধরেছিল—নাতিরা কি গিয়েচে আম খেতে? তাদের সেদিকে দৃষ্টি নেই। বারোভূতে লুটে খাচ্চে।

রাত্রি নামলো। নীরজা বল্লেন—চলুন দিদি—

দ্রব ঠাকরুণ লক্ষ্য করেচেন সমস্ত সময় নীরজা মাগী ফোঁস ফোঁস করে কেঁদেচে। আর কেবল বলেচে—আহা-হা-হা!

যদি এ মাগীর সঙ্গ ছাড়তে পারতেন!—কিন্তু তা হবার নয়, কানু শুনবে না।

বাসায় এসে নীরজা দেখলেন তাঁর সঙ্গিনীর মন বড় খারাপ—অন্যমনস্কভাব, বিশেষ কোনো কথা বলে না।

কাশীখণ্ড শুনে আজ তা হোলে খুব ভালো লেগেচে বোধ হয়। পাষাণ বুঝি গলেচে।

নীরজা বল্লেন—কি ভাবচেন দিদি?

—একটা-গাছ কাঁঠাল দেশে। খয়েরখাগীর কাঁঠাল, সে তুমি কখনো খাওনি—খেলে বুঝতে।

—দিদি, এখনও আপনার মায়ার বন্ধন গেল না? আপনার তো দু'টো একটা গাছ, আমার তিনটে বড় বাগান—কলমের বোম্বাই, মালদ' ফজলি—মায় ন্যাংড়া পর্য্যন্ত। আমি তো ফিরেও চাইনি ওসব দিকে। ছেলেরা কাঁদে, বলে, এখন কি কাশীবাস করবার সময় হয়েচে তোমার? আমি বলি, না, সংসারের মায়ায় আর না। গানে বলে—

কেবা কার পর, কে কার আপন? (এই মরেচে, মাগী আবার শুরু ক'রেচে!) কালশয্যা পরে, মোহতন্দ্রা ঘোরে, দেখে পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

তা আমি বলি—এতকাল তো সংসারের বন্ধনে ঘুরে আশার স্বপন অনেক দেখলুম। এইবার পরকালের কথা ভাবি। আর আমার এই যে গুরুদেব, উনি দেহধারী মুক্ত পুরুষ—ওঁর কৃপায়—(নীরজা উদ্দেশে প্রণাম করলেন।)

দ্রব ঠাকরুণ মুখে বল্লেন—তা তো বটেই—

—চলুন দিদি ওবেলা বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে সেই মাইজির কাছে আপনাকে নিয়ে যাই—আপনার বয়স আমার চেয়ে বেশি, আপনার এখন উচিত গুরুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সব বন্ধন মুক্ত হয়ে একমনে কাশীবাস করা। আমাদের আর ক'দিন দিদি? শমন তো দোরে দাঁড়িয়ে—সব রকম তো দেখলুম শুনলুম।

দ্রব ঠাকরুণ মনে মনে বল্লেন—তোমার মুণ্ডু করলুম, মাগীর কথার আবার ধরণ শোনো-না! ভাটপাড়ার ভট্‌চাজ্জি এসেচেন! মুখে বল্লেন—মুংলি ব'লে একটা গাই গোরু ছিল আমার—বড্ড ন্যাওটো। যেখানে যাবো, সেখানে যাবে। আমার হাতে না খেলে তার পেট ভরতো না। এই বেশ কচি কচি বাঁশপাতা এনে মুখে দেতাম তুলি—আর—

—আঃ আবার ওই সব কথা আপনার মুখে! জড়ভরতের কথা জানেন তো? অত বড় জ্ঞানী—পূর্ব্ব জন্মে এক হরিণের মায়ায় তাঁর সব গেল! ভগবানের চিন্তা করুন—ভগবানের চিন্তা করুন—সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

দ্রব ঠাকরুণ কোনো কথা বল্লেন না। ওর কথা তাঁর একেবারেই ভালো লাগে না। মাগী যেন কি! কি বলে, কি করে! মাগী এমন পাষাণ যে, ছোট ছেলের বিয়েতে বাড়ী গেল না। মুখ দেখতে আছে ওর? ছিঃ—

সারারাত্রি স্বপ্নের ঘোরে দেখলেন তাঁর গোপীনাথপুরের ভিটেতে চালাঘরের ছাঁচতলায় ম্লান মুখে ছলছল চোখে তাঁর মুংলি দাঁড়িয়ে রয়েচে—ন' বৌ তাকে যত্ন করচে না, বুড়ী হয়েচে মুংলি, তেমন দুধ ত আর দিতে পারে না—মুংলিকে তিনি তার মায়ের পেট থেকে টেনে বার করে এত কাল নিজের মেয়ের মত পুষেছিলেন—তিনি নেই, কে ওকে দেখে? কাঁঠাল হয়েচে বটে খয়েরখাগী গাছটাতে! এত কাঁঠাল তিন চার বছরের মধ্যে হয়নি। তিনি নাইতে যাচ্ছেন নদীতে, মুখুজ্যে-গিন্নি বলচে—হ্যাঁ খুড়ী-মা, এবার তোমার গাছে কী কাঁঠাল ধরেচে! তা আমায় একটা দিও, তোমার নাতিদের খেতে দেবো—

খড় উড়ে উড়ে পড়চে বাড়ীর চাল থেকে। কানু বা বিন্দে দেশে যায়নি, ঘরও সারায়নি। এবার বর্ষায় কি টিকবে চালে খুঁচি না দিলে?

কনক বলচে—অ ঠাক্‌মা, একটা নেবু দেবা? আমার মার অরুচি হয়েচে, কিছু খেতি পারে না—

সকালে উঠে নীরজা নিজেই গঙ্গাস্নান করে এসে স্বপাক হবিষ্যান্ন চড়িয়েচেন এবং প্রতিদিনের অভ্যাসমত ইষ্টমন্ত্র জপ শেষ করে গালবাদ্য সহকারে শিবপূজা করচেন। দ্রব ঠাকরুণের একটু বেলা হয়েচে আজ উঠতে। মনও খুব ভার। তাঁর আপনার জন পড়ে রইল—তাঁর মুংলি, তাঁর খয়েরখাগী গাছটা, তাঁর ডুমুর গাছ—আর তিনি কোথায়! আরও ওই মাগীর জ্বালায়···

নীরজার গাল-বাদ্য থামলো। দ্রব ঠাকরুণকে বল্লেন—আজ বড় সুখবর পেলুম দিদি—গঙ্গাস্নানে গিয়ে গুপ্তিপাড়ার সইয়ের সঙ্গে দেখা—সেও আমার মত কাশীবাস করচে—বাঙালীটোলায় থাকে, বল্লে, গুরুদেব আসচেন সামনের সোমবারে। হরিদ্বার থেকে ফেরবার পথে আমার এখানে পায়ের ধূলো দিয়ে তবে যাবেন। সইও একই গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েচে কিনা। আজ বড় শুভদিন আমার। গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেই বেঁচে আছি, এবার এলে আপনাকে দীক্ষা নিতেই হবে দিদি, আমি ছাড়বো না। গুরুদীক্ষা না হ'লে দেহ পবিত্র হয় না, ভবসাগর পার হ'তে হ'লে গুরুর চরণরূপ ভেলা চাই আগে—নইলে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হবে যে দিদি?

দ্রব ঠাকরুণ বল্লেন—তা তো ঠিক, তা তো ঠিক—

গুরুদেবের আগমনের পূর্ব্বেই শনিবার সকালের গাড়ীতে কানু এসে হাজির হ'ল। দ্রব ঠাকরুণ নাতির কাছে কেঁদে পড়লেন—তুই আমায়

গুপীনাথপুরে নিয়ে চল্ ভাই, আমার আর কাশীবাসে কাজ নেই—বাবা বিশ্বনাথ মাথায় থাকুন। ও মাগীর কাছে আর দু'মাস থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

ফলে সোমবার কাশীতে গুরুদেবের শুভাগমনের দিন দুপুরের ট্রেনে দ্রব ঠাকরুণ দেশের ইষ্টিশানে তাঁর বোঁচকা তোরঙ্গ নিয়ে নাতির সঙ্গে এসে নামলেন।

ন'ঠাকরুণ শুনে ছুটে এলেন—ও দিদি—দিদি—

—হ্যাঁ ন'বৌ—আমার মুংলি ভালো আছে?

—ভালো নেই দিদি। ওঠে না, খায় না—তোমার যাওয়ার পর থেকেই, গোয়ালে শুয়েই থাকে।

—সে আমার মন বলেচে ভাই, তুমি কি বলবে। তাকে রাত্তিরে স্বপ্ন দেখেই তো আর টিকতে পারলাম না, চলে অ্যালাম। কানুকে বল্লাম, নিয়ে চল্ ভাই গুপীনাথপুর, মাথায় থাকুন বাবা বিশ্বনাথ—মুংলি কোথায়? ওকে কচি বাঁশপাতা খাওয়াবো নিজের হাতে, স্বপ্ন দেখিচি।

একটু পরে ন'ঠাকরুণ দড়া ধরে মুংলিকে নিয়ে এলেন। সত্যিই তার সে চেহারা নেই। সব কাজ ফেলে দ্রব ঠাকরুণ ছুটে গিয়ে তার গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। মুংলির চোখে জল পড়ে, তাঁরও চোখে জল পড়ে।

ন'ঠাকরুণ বল্লেন—আর-জন্মে ও তোমার মেয়ে ছিল দিদি—আর-জন্মের মায়ার বাঁধন—

—রক্ষে করো ন' বৌ—তুমিও বড় বড় কথা কলতে শুরু করলে নাকি, সেই মাগীর মত? মুংলি এ-জন্মেই আমার মেয়ে—আর জন্ম টন্ম ছেড়ে দাও।

—কে মাগী, কার কথা বলচো—

—সে বলবো এখন সব। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি দেশে এসে—বাবাঃ—

কানু হেসে বল্লে—নাঃ ঠাকুমাকে নিয়ে আর পারা গেল না—এমন নাস্তিক—কাশীপ্রাপ্তি অদৃষ্টে থাকলে তো?

—তুই ভাই বল্, ন' বৌ বলো—আমার এই ভিটেতেই যেন তোদের কোলে শুয়ে সকলের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে যেঁতে পারি। কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই—এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠোনের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসীতলায়—আমাকেও তোরা ওখানে—

আঁচলের খুঁট দিয়ে দ্রব ঠাকরুণ চোখের জল মুছলেন।

বেলা যায় যায়—আষাঢ়ান্ত সুদীর্ঘ দিনমানের শেষে সূর্য্য ঢলে পড়েচে পশ্চিম দিকের নিবিড় বাঁশবনের আড়ালে। ঘেঁটকোল ফুল কোথাও জঙ্গলে ফুটেচে, বাতাসে তার কটু উগ্র গন্ধ। দ্রব ঠাকরুণের মন শান্তিতে, আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হয়ে গেল। এগারো বছরের নববধূ এই বাড়ীর উঠানে পা দিয়েছিলেন, এখন তাঁর বয়েস তিন কুড়ি ছয়।

কনক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—ঠাকুমা, ভালো আছেন? এয়েচেন শুনে ছুটে দেখতি অ্যালাম—আমাদের কথা মনে ছিল?

আহ্বান

দেশের ঘরবাড়ী নেই অনেকদিন থেকেই। পৈতৃক বাড়ী যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটেতে জঙ্গল গজিয়েছে। এ অবস্থায় একদিন গিয়েচি দেশে কিসের একটা ছুটিতে।

গ্রামের চক্কোত্তি মশায় বাবার পুরাতন বন্ধু। আমায় দেখে খুব খুসি হোলেন। বল্লেন—ওঃ কতকাল পরে বাবা মনে পড়লো দেশের কথা?

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। বল্লেন, এসো, এসো, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও। বাড়ীঘর করবে না?

—আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই—

—তাতে কি? গ্রামের ছেলে গ্রামে বাস করবে, এতে আর সামান্য মাইনে বেশি মাইনে কি? আমি খড়-বাঁশ দিচ্চি, চালাঘর তুলে ফেলো, মাঝে মাঝে যাতায়াত করো। আহা নরেশের ছেলে, দেখেও সুখ। ক'দিনই বা আছি? বাস করো গাঁয়ে।

আরও অনেকে এসে ধরলে, অন্ততঃ খড়ের ঘর একটা ওঠাতে হবে।

অনেক দিন পরে গ্রামে এসে লাগচে ভালই। যাদের বাল্যকালে ছোট দেখে গিয়েচি, তাদের আর চেনা যায় না, যাদের যুবক দেখে গিয়েছিলাম, তারা হয়েচে বৃদ্ধ।

বড় আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছি, আমগাছের ছায়ায় একটি বৃদ্ধার চেহারা ভারতচন্দ্রের বর্ণিত জরতীবেশিনী অন্নপূর্ণার মত। কোনো তফাৎ নেই, ডান হাতে নড়ি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে বোধ হয় বা বাজারের দিকেই চলেছে। বগলে একটা ছোট থলে।

বুড়ীকে দেখেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এ ধরণের বুড়ীকে দেখে আমার বড় মায়া হয়—নারীরূপের এক অপূর্ব্ব পরিণতি।

জিগ্যেস করলাম—কোথায় যাবে ?

—বাজারে বাবা—

বুড়ী আমায় ভাল না দেখতে পেয়ে কিংবা না চিনতে পেরে ডান হাত উঁচিয়ে তালু আড়ভাবে চোখের ওপর ধরলে।

বল্লে—কে বাবা তুমি ? চেনলাম না তো ?

—চিনবে না। বাঁড়ুজ্যেপাড়ার নরেশ বাঁড়ুজ্যের ছেলে। আমি অনেকদিন গাঁয়ে আসিনি—

—তা হবে বাবা। আমি আগে তো এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না। তিনি থাকতি আবাব ছেলো না কোনো জিনিষের। গোলা পোরা ধান, গোয়াল পোরা গরু—

—তোমাকে তো চিনতে পারলাম না বুড়ী ?

আমার তো তেনার নাম করতি নেই বাবা। করাতের কাজ করতেন ?

বলে সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে, অর্থাৎ আমি চিনতে পেরেচি কি না। কিন্তু আমার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়, আমার বাল্যকালে কে এ গ্রামে করাতের কাজ করতো তা আমার মনে থাকবার কথা নয়। বল্লাম—তোমার ছেলে আছে ?

—কেউ নেই বাবা কেউ নেই। এক নাতজামাই আছে তো সে মোরে ভাত দেয় না। ওই আমার নাতনীকে রেখে মোর মেয়ে মারা যায়। আমার বড্ড কষ্ট, ভাত জোটে না সবদিন। বাজারে যাচ্ছি তিন পয়সার মুন কিনে আনবো—দুটো ক'টা চাল যোগাড় করিচি ও-বেলা।

বুড়ীকে পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে দিলাম।

ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে ভেবেছিলাম, কিন্তু তা চুকলো না—উপরন্তু এই বুড়ীকে কেন্দ্র করে আমার জীবনে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সুরু হোল। নিজের জীবনে না ঘটলে বিশ্বাস করতাম না এমন ঘটনা।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেচি, এমন সময় কালকার সেই বুড়ী লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে এসে হাজির উঠোনে। থাকি এক জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ী। তিনি বল্লেন—ও হোল জমির করাতীর স্ত্রী—অনেকদিন মরে গিয়েচে জমির। তোমাদের খুব ছেলেবেলায়।

বুড়ী উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলে—ও বাবা—

সে বোধ হয় চোখে একটু কম দেখে। ও বয়সে সেটা অবশ্য তেমন আশ্চর্য্যই বা কি।

বল্লাম—এই যে আমি এখানে।

—কাল পয়সা কটা পেয়ে ভাবলাম যাই দিনি বাওনপাড়ার দিকি। কে পয়সা দিলে চিনতিও পারলাম না। বিকেলবেলা চোখে ঠাওর পাইনে।

আমার খুড়োমশায় বুড়ীকে বুঝিয়ে দিলেন আমি কে। সে উঠোনের কাঁটালতলায় বসে আপন মনে খুব খানিকটা বকে উঠে গেল। তার যাবার সময় আরও দু' একটা পয়সা দিলাম।

পরদিন কলকাতা চলে গেলাম, ছুটি ফুরিয়ে গেল। আমায় জ্ঞাতি খুড়োকে কিছু টাকাও দিয়ে এলাম আসবার সময়ে, আমার জন্যে ছোটখাটো দেখে একটি খড়ের ঘর তুলে রাখবার জন্যে।

কয়েক মাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে আমার সেই নতুন-তৈরী খড়ের ঘরখানাতে এসে উঠলাম। কলকাতাতে কর্ম্মব্যস্ত এই ক'মাসের মধ্যে বুড়ীকে একবার মনেও পড়েনি বা এখানে এসেও মনে হঠাৎ হয়তো হোত না, যদি সে তার পরের দিনই সকালে আমার ঘরের নিচু দাওয়ায় এসে না বসে পড়তো।

বল্লাম—কি বুড়ী, ভাল আছো ?

ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত থেকে গোটাকতক আম খুলে আমার সামনে মাটিতে রেখে বল্লে—আমার কি মরণ আছে রে বাবা!

জিজ্ঞেস করলাম—ও আম কিসের ?

দন্তহীন মুখে একটু হাসবার চেষ্টা করে বল্লে—অ গোপাল আমার, তোর জন্যি নিয়ে অ্যালাম। গাছের আম কডা বেশ মিষ্টি, খেয়ে দেখো এখন।

আমি ওর সম্বোধনের নতুনত্বে কৌতুক অনুভব করলাম, কিন্তু কি জানি কেন বড় ভাল লাগলো। গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই,

একটা ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন করার লোকের দেখা পাইনি বাল্যকালে মা পিসিমা মারা যাওয়ার পর থেকে। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে অত বেশি বয়সের স্ত্রীলোক কেউ নেই যে আমাকে 'গোপাল' বলে ডাকে।

বুড়ী বল্লে—থাও কোথায় হ্যাঁ বাবা?

—খুড়োমশায়ের বাড়ী।

—বেশ যত্ন করে তো ওনারা?

—তা করে।

—দুধ পাচ্ছ ভালো?

—ঘুঁটি গোয়ালিনী দেয়, মন্দ না।

—ও বাবা, ওর দুধ! আদ্দেক জল—দুধ খেতি পাচ্ছ না ভাল সে বুঝিচি।

পরদিন সকাল হয়েচে সবে, বুড়ী দেখি উঠোনে এসে ডাকচে—অ গোপাল—

বিছানা ছেড়ে উঠে বল্লাম—আরে এত সকালে কি মনে করে? হাতে কি?

বৃদ্ধা হাতের নড়ি আমার দাওয়ার গায়ে ঠেস্ দিয়ে রেখে বল্লে—এক ঘটি দুধ আনলাম তোর জন্যি।

—সে কি? দুধ পেলে কোথায় এত সকালে?

—আমায় মা বলে ডাকে ওই হাজরা ন্যাটার বৌ। তারও কেউ নেই, মোর চালাঘরের পাশে ওর চালাঘর। ওরে কাল রাত্তিরে বলে রেখে দিয়েলাম, বলি বৌ আমার গোপাল দুধ খেতি পায় না। সকালে চা না কি খায়, ওরে খুব ভোরে উঠে গাই দুয়ে দিতি হবে। তাই আজ কুঁক্ড়ো-ডাকা ভোরে দেখি উঠে আমারে ডাকচে—মা ওঠো, তোমার গোপালের জন্যি দুধ নিয়ে যাও—

—আচ্ছা কেন বলো তো তোমার এসব! ছিঃ—না এসব ভালো না। এ রকম আর কখনো এনো না। কত পয়সা দাম দিতে হবে বলো। কতটা দুধ?

আমার গলার স্বর একটু রুক্ষ হয়ে উঠেছিল হয়তো, কারণ মুসলমানের বাড়ীর দুধ আমাদের গ্রামে চলে না, কে কোনদিক থেকে দেখে ফেলবে এই ছিল আমার ভয়। কেন আবার এসব ঝঞ্ঝাট জোটে!

বুড়ী আমার কণ্ঠস্বরের অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় যেন একটু ঘাবড়ে গেল, ভয়ে ভয়ে বল্লে—কেন বাবা পয়সা কেন?

—পয়সা না তো তুমি দুধ পাবে কোথায় ?

—ওই যে বল্লাম বাবা আমার মেয়ের বাড়ী থেকে—

—তা হোক তুমি পয়সা নিয়ে যাও। সেও তো গরীব লোক—

বুড়ী পয়সা নিয়ে চলে গেল বটে ; কিন্তু সে যে বেশ দমে গিয়েচে তার কথাবার্ত্তার ধরণে বেশ বুঝতে পারলাম।

মনে একটু কষ্ট হোল বুড়ী চলে গেলে, পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েচে কি ? বুড়ীর কি রকম হয়তো মন পড়ে গিয়েচে আমার ওপর, স্নেহের দান—এমন করা ঠিক হয়নি।

বুড়ী কিন্তু এ অবহেলা গায়ে মাখলো না আদৌ। প্রতিদিন সকাল হতে না হতে সে এসে জুটবে।

—অ গোপাল, এই দুটো কচি শসার জালি মোর গাছের—এই গ্যাও। নুন দিয়ে খাও দিনি মোর সামনে ?

--বুড়ী তোমার চলে কিসে ?

—নাং জামায়ের দেবার কথা, তা সে সবদিন দেয় না। ওই যারে মেয়ে বলি, ও বড্ড ভালো। লোকের ধান ভানে, তাই চাল পায়, আমারে দুটো দুটো না দিয়ে খায় না।

—একা থাকো ?

—তা একদিন মোর ঘরখানা না হয় দেখতি গেলে, অ মোর গোপাল ? আমি নতুন খাজুরপাতার চেটাই বুনে রেখে দিয়েলাম তোমারে বসতি দেবার জন্যি। বাউনের ছেলে, মোদের এঁটোকাঁটা মাদুরে কি বসবে ? তাই বলি একটা নতুন চেটাই বুনে রাখি, যখন আসবে এখানেতেই বসবে।

সেবার বুড়ীর বাড়ীতে আমার যাওয়া ঘটে উঠলো না ওর এত আগ্রহ সত্ত্বেও। নানাদিকে ব্যস্ত থাকি, তার ওপর আছে সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের দাবি। অনেকদিন পরে গ্রামে এসেছি তো ? যে ক'দিন গ্রামে থাকি, বুড়ী রোজ সকালে একবার আসতে ভুলবে না। কিছু-না-কিছু আনবেই—কখনও পাকা আম, কখনও পাতি নেবু, কখনও এক ছড়া কাঁচকলা কি এক ফালি কুমড়ো। দু-আনা চার আনা প্রায়ই দিই। একদিন একখানা কাপড় দিলাম। একটা জিনিষ লক্ষ্য করে আসচি, বুড়ী কোনোদিন আমার কাছে কিছু মুখ ফুটে চায়নি। কখনও বলেনি, পয়সা দাও কি অমুক দাও। বরং তার উল্টো, শুধু হাতে কখনও আসে না।

একবার কলকাতা থেকে কয়েকটি বন্ধু গেলেন দেখা করতে।

তাদের নিয়ে ঘরে বসে চা খাচ্চি, ষ্টোভ ধরিয়ে ঘরেই চা নিজে করেচি, পল্লীগ্রামে এত সকালে কেউ উনুন ধরায় নি। বুড়ী লাঠি ঠুক-ঠুক করতে করতে এসে হাজির। বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দিল, অ মোর গোপাল!

হঠাৎ আমার লজ্জা করতে লাগলো। কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের সামনে, ও আজ না এলেই পারতো ছাই। ভালো বিপদ!

—অ মোর গোপাল! ঘরে আছিস নাকি?

ঈষৎ বিরক্তির সুরেই উত্তর দিলাম—হ্যাঁ কেন?

—এই এয়েলাম, বলি যাই গোপালকে দেখে আসি একবার।

বন্ধুদের মধ্যে একজন জিগ্যেস করলেন—ও কে হে?

চাপা দেবার চেষ্টায় বল্লাম—ও এমনি—গাঁয়ের লোক।

আর একজন বল্লে—তোমার ডাক নাম কি গোপাল নাকি হে গ্রামে?

—হ্যাঁ—না—এই—

বুড়ী বল্লে—কাল রাত্তিরে কি গরম পড়লো। গোপাল ঘুমুতে পেরিলি কাল? মুই চোখ বুজিনি সারারাত।

বেশ করনি! ভাল বিপদেই পড়া গেল রে সকালবেলা। আজ না এলে কি চলতো না বুড়ীর?

বন্ধুটি পুনরায় বল্লে—ও গোপাল বলচে কাকে হে?

—ইয়ে—হ্যাঁ, আমাকেই বলচে—

কথা শেষ করে ঈষৎ হেসে মাথার দিকে দুটি আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করে বল্লাম—মাথাটা একটু—

বন্ধুটি বল্লেন—ও!

কথা অনুযায়ী কাজের সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে বুড়ীর দিকে চেয়ে যেমন সুরে লোকে দুর্দান্ত পাগলকে সান্ত্বনা দেবার ও স্তোকবাক্য প্রয়োগ করার চেষ্টা করে তেমনি সুরে বলি—আজ যাও, বড্ড ব্যস্ত আছি—বুঝলে? কলকাতার বন্ধুরা সব এসেচেন। হ্যাঁ—

ফল সুবিধেজনক হোল না। বুড়ী একগাল হেসে বল্লে—আজ কি এনেচি বলো দিকে গোপাল? এই ছাখো—

এতক্ষণ টের পাইনি যে বুড়ী তার পেছন দিকে একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি লুকিয়ে রেখেছে। সেটা সামনের দিকে এনে খুলতে খুলতে বল্লে—সেই

যে মেয়েটা মোরে মা বলে, সে দুটো চিড়ে কুটলো। আমি বল্লাম, ওকি কুটচিস? ও বল্লে—কামিনী-সুরু ধানের ভাল চিঁড়ে। তোমার গোপালের জন্যি দুটো নিয়ে যেও এখন, কাল বেন বেলা। আমার মনডা বড্ড খুসি হোল —তা সেও আসচে। সেও তোমারে দেখতি চায়। বড্ড দুঃখী কাঙাল মেয়েডা। ধান ভেনে চিঁড়ে কুটে একরকম করে চালাচ্ছে।

একে রামে রক্ষা নেই, বুড়ীর কথা শেষ হোতে না হোতে দেখি একটি আধফর্সা মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক অদূরে আমতলায়, এদিকেই আসচে। আরও বিপদে পড়লাম এই জন্যে যে, ঠিক সেই সময় আমার জ্ঞাতি খুড়ো মশায়কেও এদিকে আসতে দেখা গেল। সর্বনাশ! তাঁর বাড়ীতে আমার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা, আর তিনি যদি জানতে পারেন যে এদের হাতে তৈরী চিঁড়ে বা খাবার জিনিষ আমি খাই—তাহোলেই তো এ পাড়াগাঁয়ে হয়েচে! চিঁড়ে যে ওরা আজই প্রথম এনেচে একথা কি তিনি বিশ্বাস করবেন? আজ দুধ, কাল চিঁড়ে—

রুক্ষ সুরেই বল্লাম—এখন যাও না—দেখচো না ব্যস্ত আছি?

—চিঁড়ে কটা নেবার একটা কিছু দ্যাও বাবা।

—ও সব এখন নিয়ে যাও—হ্যাঁ, হ্যাঁ—পরে হবে। এখন যাও—

বুড়ী একটু অবাক হয়ে বল্লে—তা চিঁড়ে ক'টা—

খুড়োমশায় প্রায় এসে পড়েচেন দাওয়ার ধারে।

হাত নেড়ে নেড়ে ফেলবার ভঙ্গিতে বুড়ীর দিকে চেয়ে বলি—আঃ নিয়ে যাও না—ভালো জ্বালা!

খুড়ো মশায় বল্লেন—কি ওতে? কি বলচে জমিরের স্ত্রী?

—ও কিছু না। ইয়ে বিক্রি করতে এসেচে—যাও এখন—

ভগবান জানেন, বুড়ী আমার কাছে চিঁড়ের বদলে পয়সা নিতে আসেনি।

খুড়ো মশায় বল্লেন—তোমার এখানে ওর বড্ড যাতায়াত—

কথাটা চাপা দেবার জন্যে বল্লাম—আমার এই বন্ধুরা একদিন মাছ ধরবার কথা বলছিলেন, তা ভাদুড়ীদের পুকুরে কি সুবিধে হবে?

পুনরায় গ্রামে এলাম মাস পাঁচ-ছয় পরে আশ্বিন মাসের শেষে।

কয়েকদিন পরে ঘরে বসে আছি, বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কে ক্ষীণ নারীকণ্ঠে জিগ্যেস করলে—বাবু ঘরে আছেন গা?

বাইরে এসে দেখি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে যাকে বুড়ীর সঙ্গে দেখেছিলাম সেই মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটি। আমায় দেখে সলজ্জভাবে মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দেবার চেষ্টা করে সে বল্লে—বাবু কবে এয়েচেন?

—দিন পাঁচ ছয় হোল। কেন?

—আমিও তাই শোনলাম। বলি একবার যাই। আমার সেই মা পাটিয়ে দেলে, বল্লে দেখে এসো গিয়ে।

—কে?

—ওই সেই বুড়ী—এখানে যিনি আসতো। তেনার বড্ড অসুখ—এবার বোধ হয় বাঁচবে না। গোপাল কবে আসবে, গোপাল কবে আসবে—অস্থির, আমারে রোজ শুধোয়। আমি বলি তিনি কলকাতায় চাকৃরী করেন, সব সময় কি আসতে পারেন? কি মায়া আপনার ওপর, আর জন্মে বোধহয় পেটে ধরেল। এ জন্মে তাই এত টান—একবার দেখে আসুন গিয়ে। বড্ড খুশি হবে তাহলি—

উদাসীনভাবে বল্লাম—ও!

মন তখন অন্য চিন্তায় বিব্রত। এবার কাউন্সিল ইলেকসনে দুটি বন্ধুর পক্ষ থেকে ভোট সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে লোককে অনুরোধ করবার গুরুভার নিয়ে এসেচি। কাল থেকেই বেরুতে হবে, ওদের মোটর আসবে। কিভাবে কি করা যায়, সেকথাই চিন্তা করছিলাম। কোথায় কোন বুড়ী অসুখ হয়ে আছে, ওসব দেখবার সময়াভাব।

স্ত্রীলোকটি বল্লে—ওবেলা যাবেন বাবু?

—আচ্ছা—তা—এখন ঠিক বলতে পারচিনে—

স্ত্রীলোকটি অনুনয়ের সুরে বল্লে—একবার যাবেন বাবু ওবেলা। হয়তো বুড়ী বাঁচবে না—

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার পথে দেখতে গেলাম বুড়ীকে। খুব উঁচু দাওয়া, সেকালের প্রণালীতে তৈরি পাঁচচালা ঘর। বুড়ীর স্বামীর আমলে আমার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে এ ঘর তৈরী হয়েছিল, তখন এদের অবস্থা যে ভাল ছিল, এই প্রশস্ত পাঁচচালা ঘরখানাই তার নিদর্শন। কিন্তু ঘরখানার সংস্কার হয়নি অনেকদিন, খড় উড়ে পড়চে চালা থেকে, দড়ি বাখারি ঝুলচে, মাটির দাওয়া নানা স্থানে ভেঙে পড়েচে, বাঁশের খুঁটি নড়বড় করচে।

বুড়ী শুয়ে আছে একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর, মাথায় তেলচিটা মলিন

বালিশ। বুড়ীর সেই পাতানো মেয়েটি পাশে বসেছিল, আমায় দেখে বুড়ীকে বল্লে—অ মা, কে এসেচে ছাখো—অ মা—

আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বুড়ী চোখ মেলে আমার দিকে চাইলে। পরে আমাকে চিনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করতেই আমি বল্লাম—উঠো না, উঠো না—ওকি ?

বুড়ী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বল্লে—ভাল আছ অ মোর গোপাল ? বসতে দে গোপালকে—বসতে দে—

—বসবার দরকার নেই, ব্যস্ত হয়ো না। থাক্—

—ওখানা কেন দিচ্চিস্ ? গোপালের ওই খাজুরের চটখানা পেতে দে—

পরে ঠিক যেন আপনার মা কি পিসিমার মত অনুযোগের সুরে বলতে লাগলো—তোর জন্যি খাজুরের চটখানা কদ্দিন আগে বুনে রেখেলাম। ওখানা পুরণো হয়ে ভেঙে যাচ্চে। তুমি একদিনও এলে না গোপাল—অসুখ হয়েচে তাও দেখতে আসো না—

আমি বল্লাম—আচ্ছা, চুপ করে শুয়ে থাকো। ব্যস্ত হয়ো না।

ইতিমধ্যে পাড়ার অনেক লোক এসে জড়ো হোল, আমি এসেচি দেখে। কেউ কেউ বল্লে—বুড়ী কেবল আপনার কথা বলে বাবু। আপনাকে দেখবার বড্ড ইচ্ছে। বুড়ী বোধ হয় এবার বাঁচবে না।

বুড়ীর দুচোখ বেয়ে জল পড়চে গড়িয়ে। আমায় বল্লে—গোপাল যদি মরি, আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস্—

পাশের লোককে জিগ্যেস্ করলাম—সে কি ?

—জানেন না বাবু? মাটি দেবার সময় নতুন কাপড় কিনে পরিয়ে দিতে হয়—

—ও বুঝেচি।

আমাকে পেয়ে বুড়ী খুব খুশি হয়েচে। কত কি বলতে লাগলো—ওর নাৎজামাই লোক কেমন খারাপ, এমন যে অসুখ একবার চক্ষু দিয়ে দেখেও যায় না। ঘর ? তা দশ বছর খড় পড়েনি চালে। পচে গলে গিয়েচে পুরনো খড়। নাৎজামাইকে বলেছিল, সে জবাব দিয়েচে, অত বড় হাতী ঘর আমি ছাইতে পারবো না। পাশে একটা ছোট কুঁড়েঘর-মত বেঁধে থাকো।

বুড়ী চোখের জল মুছে বলে—তা থাকতি পারি হ্যাঁ বাবা ? কি নোকের পরিবার আমি। আজই না হয় কপাল পুড়েচে। তা বলে কুঁড়েঘরে থাকতি পারি মুই ?

সান্ত্বনা দেবার সুরে বল্লাম—কথা ঠিকই তো।

—বলো তুমি, গোপাল!

ঘাড় নেড়ে বলি—সত্যিই তো।

আজও সে চালাঘর, সেই ম্লান সন্ধ্যা, ছেঁড়া মাদুরে শোওয়া বুড়ীকে আমার মনে পড়ে। ছেঁচতলায় একটা শীর্ণ লাউগাছ, পেছনে কয়েক ঝাড় বাঁশ, এক আধটা খেঁকি কুকুরের আওয়াজ পাড়ায়। শান্ত ছায়া নেমে এসেচে সামনের সারা উঠোনটাতে। কতগুলো মেয়ে পুরুষ দেখতে এসে দাওয়ার ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

আসবার সময় বুড়ীর পাতানো মেয়েটির হাতে কিছু দিয়ে এলাম পথ্য ও ফলের জন্যে। হয়তো আর বেশীদিন বাঁচবে না। এই অসুখ থেকে উঠবে না। বুড়ী কিন্তু সে যাত্রা সেরে উঠলো। দিব্যি সেরে উঠলো। আমি কলকাতায় চলে যাবার আগে দু-একবার আমার কাছে লাঠি ধরে গেল। বসে বসে আপনার মনে কত কি বকে, তারপর চলে আসে।

বছর-দুই কাটলো। এই দু-বছরের মধ্যে যখনই গিয়েছি গ্রামে, বুড়ী এসে বসে, কিছু না কিছু নিয়ে আসবেই। অসুখটা থেকে উঠে বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, সে দুর্ব্বলতা ওর আর সারলো না।

আমি বলতাম—কেন আসো রোজ রোজ অতদূর থেকে?

—এই পাকা নোনাডা ভাবলাম গোপালকে দিয়ে আসি—

—তা হোক, তুমি কষ্ট করে এসো না এরকম।

—তুই তো আমাকে দেখতি যাবি নে কোনদিন—

—সময় পেলেই যাবো। এখন বাড়ী যাও।

কখনও বুড়ী বলতো, অ গোপাল, তুই বিয়ে করলি নে কেন?

—মেয়ে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বয়েস হয়ে গিয়েচে।

—কিচ্ছু বয়েস হয়নি। কাঁচা ছেলে তোমরা। (আমার বয়েস তখন চল্লিশ)।

—বেশ।

—ওই মুখুয্যেদের বাড়ী একটা বড় মেয়ে আছে, তোমার সঙ্গে মিল হবে। বলে দেখবানি ওদের।

—আমার ঘটকালি করবার লোকের যখন দরকার হবে, তখন তোমায় ডেকে পাঠাবো। এখন যাও।

কিন্তু বুড়ী আমার কথা শোনে না। একদিন মুখুয্যেবাড়ীর নরু আমায় ডেকে বল্লে—ওহে, একটা কথা বলি। আজ জমির করাতির বৌ-বুড়ি বাড়ীর মেয়েদের কাছে গিয়ে বলচে কি গোপালের সঙ্গে তোমাদের পুঁটির বিয়ে দাও। মেয়েরা তো অবাক, গোপাল কে? শেষে জানা গেল—তুমি। ওরা তো শুনে আশ্চর্য্য। তা তুমি কিছু বুড়ীকে বলেছিলে নাকি এ সম্বন্ধে?

আমি নিজেকে নিতান্তই বিপন্ন ও অসহায় বোধ করলাম। বল্লাম, সে কি কথা? কক্ষনো না। তুমি কি বিশ্বাস কর—

—না—না বিশ্বাস অবিশ্যি করিনি। যাই হোক যদি কিছু বলেও থাকো বুড়ীকে বারণ করে দেবে আর না বলে। গ্রাম ভাল নয়, ও নিয়ে মেয়েটার নামে একটা কথাকথি যদি হয়—

—নিশ্চয়। তুমি বিশ্বাস করো ভাই, আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি নে।

বুড়ী তারপর দিন যেমন সকালে এসেচে বকলুম ওকে। কে তাকে এসব কাণ্ড করতে বলেচে? ঘটকালি করতে ডেকেছিল কেউ তাকে? গাঁয়ে এই নিয়ে শেষে একটা কথা উঠবে, পাড়াগাঁ জায়গা খারাপ। তুমি বাপু এখানে আর এসো না।

বুড়ী ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে বল্লে—বকিস্ নে অ গোপাল, মোরে বকিস নে। তা তুই ও মেয়েডারে বিয়ে না করিস—অন্য কোনো মেয়ে বিয়ে কর। পুঁটিরে তোর পছন্দ হয়নি, না?

ধমকে উঠে বল্লাম—আবার ওই সব কথা?

নিতান্ত সরলা সেকেলে বুড়ী, কিছু বোঝেও না।

সত্যিই এই ঘটনা নিয়ে গ্রামে একটু কথাবার্ত্তার সৃষ্টি হোল। বুড়ীর ওপর খুব চটে সকালবেলাটা আর ঘরেই থাকিনে, পাছে বুড়ী এসে জ্বালাতন করে। দশ-বারোদিন পরে একদিন দুপুরে ঘুমিয়ে উঠেচি, বাইরে বুড়ীর গলা শোনা গেল—অ মোর গোপাল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লাম—কি? আবার এসেচ কেন এখানে?

—একটা বাতাবী নেবু নিয়ে এয়েলাম তোমার জন্যি—

—দরকার নেই বাতাবী নেবুতে। যাও এখন—

বিরক্তি নিতান্ত অকারণ নয়। মাত্র চার-পাঁচদিন আগে মুখুয্যেবাড়ীর ঘটনা নিয়ে আমার জ্ঞাতি খুড়ো আমায় দুকথা শুনিয়ে দিয়েচেন।

বছরখানেক আর গ্রামে যাইনি এর পরে। বোধ হয় দেড় বছরও হোতে পারে। একবার শেষ শরতে পূজোর ছুটীর পর কাশী থেকে বেরিয়ে ফিরে কলকাতায় এসে দেখি তখনও দিন-দুই ছুটী হাতে আছে। গ্রামেই গেলাম এই দুদিন কাটাতে। গ্রামে ঢুকতেই প্রথমে দেখা পরশুসর্দারের বৌ দিগম্বরীর সঙ্গে। দিগম্বরী অবাক হয়ে বল্লে—ও মা, আজই তুমি এলে বাবাঠাকুর? সে বুড়ী যে কাল রাতে মারা গিয়েচে। তোমার নাম করেল বড্ড। ওর সেই পাতানো মেয়ে আজ সকালে বলছেল—

আমি এসেচি শুনে বুড়ীর নাৎজামাই দেখা করতে এল, বাবু এসেচেন? সাহায্য করুন, কাফনের কাপড় কিনতি। যা দাম কাপড় চোপড়ের।

আমার মনে পড়লো বুড়ী বলেছিল সেই একদিন—আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস্ বাবা। ওর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর বারাণসী থেকে আমায় কিভাবে আহ্বান করে এনেচে। আমার মন হয়তো ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারে নি।

কাপড় কিনবার টাকা দিলাম। নাৎজামাই বলে গেল—মাটি দেওয়ার সময় একবার যাবেন এখন বাবু। বেলা বারোটা আন্দাজ যাবেন—

শরতের কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা বনঝোপ ও মাকাল লতা-দোলানো একটা প্রাচীন তিত্তিরাজ গাছের তলায় বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হচ্চে। আমি গিয়ে বসলাম। আবদুল, শুকুর মিঞা, নমর, আমাদের সঙ্গে পড়তো আবেদালি, তার ছেলে গণি—এরা সকলে গাছের ছায়ায় বসে। প্রবীণ শুকুর মিঞা আমায় দেখে বল্লে—এই যে বাবাঠাকুর এসো। তামুক খাবা? বুড়ীর মাটি দেওয়ার দিন তুমি কনে থেকে এলে, তুমি তো জানতে না? তোমায় যে বড্ড ভাল-বাসতো বুড়ী। তোমার কাছে কাফনের কাপড় নিয়ে তবে ওর মহাপ্রাণীডা ঠাণ্ডা হোল। খাও তামুক—

একটা গরুর গাড়ীর পুরোণো কাঠামোর ওপর বৃদ্ধাকে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুইয়ে রেখেচে। দুজন জোয়ান ছেলে কবর খুঁড়চে। কবর দেওয়ার পরে সকলে এক এক কোদাল মাটি দিলে কবরের ওপর। শুকুর মিঞা বল্লে—ছাও বাবাঠাকুর তুমিও ছাও—তুমি দিলে ওর মহাপ্রাণী ঠাণ্ডা হবে—

দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো—অ মোর গোপাল!

একটি ভ্রমণ কাহিনী

আপিসে পানের আর জর্দার কৌটা দুই-ই ফেলেএসেছেন গোপীকৃষ্ণবাবু। বৌবাজারের মোড়ে এসে মনে পড়লো। ছাতিটা আজ আবার আনেন নি, বৃষ্টি হবে না ধারণা ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ছাতি না এনে ভুল করেছেন, মেঘ জমে আসছে সেণ্ট্রাল এভিনিউর বড় বড় বাড়িগুলোর মাথায়। পানের কৌটো ফেলা চলে না, টেবিল থেকে কে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। আবার আপিসে ফিরলেন, ইনচার্জ বাবু তখনও কাজ করছেন একমনে, অথচ কেউ নেই ডিপার্টমেণ্টে, খোসামুদে কোথাকার, মরুক খেটে! দেড়শো টাকা মাইনের মত কাজ দেখানো চাই তো সাহেবদের, নইলে যদি তাড়িয়ে দেয়? দিনকাল ভালো না। তাঁদের যে পঞ্চাশটি টাকা, সেই পঞ্চাশটি টাকা। কেউ নেবে না, কেউ বাড়তি দেবেও না! এই যুদ্ধের বাজার। চালানো যে কত দায় হয়ে উঠেছে, সে বোঝে যে চালায়। পঞ্চাশটি টাকা মাইনে, একপয়সা উপরি নেই। ওভারটাইম খাটলে একটাকা দৈনিক পাওয়া যায় বটে। কিন্তু ওভারটাইম কদিন হয় মাসে? আপিস থেকে রেশন দেয় তাই রক্ষে, নইলে না খেয়ে মরতে হোত সপরিবারে। খিদে পেয়েছে বড়। মোড়ের ওই দোকানখানায় এবার পানের কৌটো নিতে আসবার সময় দেখে এসেছেন, বেশ বড় বড় কচুরী ভাজছে। নিশ্চয় চারপয়সায় একখানা। খেতে ইচ্ছে তো হয়, পয়সায় কুলোয় কই? একটা দোকানে বসে আধ পেয়ালা চা দুপয়সা দিয়ে কিনে খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়েই আপাততঃ খিদের শান্তি করলেন গোপীকৃষ্ণবাবু।

পাশের ওই লাল বাড়িটা তখন মেস ছিল, পঞ্চাশের দুই ধন্বন্তরি বোসের লেন। গোপীকৃষ্ণবাবু মনে মনে হিসেব করলেন। তেত্রিশ বছর আগের কথা। বঙ্গবাসী কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়েন উনি তখন। সে-সব দিনের কথা—

হায়রে হায়, সেই বিপিন, কানু, বিনোদবাবু, শীল, মতি, ক্যাঙ্‌লা, ট্যারা শম্ভু, সুশোভন মিত্তির, কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি কত ভাবের আদান-প্রদান। কত বড় বড় আশা ছিল মনে, বোম্বেতে গিয়ে চাকুরী করবো, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না, সাহেব হয়ে যাবো, এমন কি পার্শী মেয়েকে বিয়ে করবো। পার্শী মেয়েকে বিয়ে করবার বড় সখ ছিল তখন, কে জানে কেন? প্রথম যৌবনের নেশায় ইডেন গার্ডেনে দু-চারটি সুন্দরী পার্শী তরুণীকে বেড়াতে দেখবার ফলেই বোধ হয়। আর একটা বড় সখ ছিল, বিলেত যাবার। সেটা অবিশ্যি তখনই একটু দুরাশা মতই ছিল, তবুও নিতান্ত দুরাশা ছিল না। সম্মুখে বিস্তৃত জীবন পড়ে আছে। কেন হবে না, হোলেও তো হতে পারে। এখন কিন্তু তার আকাশকুসুমত্ব যতটা ফুটে বেরিয়েছে তখন ততটা হয় নি।

ট্যারা শম্ভু (শম্ভুনাথ চক্রবর্তী, এম বি—হোমিও—স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, বিনামূল্যে সমাগত দরিদ্র রোগীগণের চিকিৎসা করেন) বৌবাজারের মোড়ে একটা ছোট্ট ঘরে ডিস্‌পেন্‌সারী ফেঁদে বসে আছেন আজ বহু বৎসর—বিশেষ কিছু হয় বলে মনে হয় না।

গোপীকৃষ্ণবাবু মাঝে মাঝে আপিস ফেরতা সেখানে বসে চা খান, চায়ের পয়সা বাঁচে। আজও গেলেন। শম্ভু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় রোগীর ভিড় নেই এই একটা সুবিধে। শম্ভু বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, গোপীবাবুকে দেখে কাগজ রেখে বললে—এসো, এসো, একটা খবর দেখেছ—জাপানীরা আবার ছ মাইল—

—আরে ভাই ওসব রেখে দাও। নিজেরা মরছি নানান্ তালে, আবার পরের খবর রাখতে গেলে বাঁচি কেমন করে? চা খাওয়া ফিনিশ?

—না, বোসো, চা আনাই।

—কেন স্টোভ কি হোল?

—পিন পাচ্ছি নে, স্টোভটার কি যে হয়েছে, কাল থেকে—চা আনাই। ও মধু—। ডিসপেন্সারীর চাকর মধু পাশের দোকান থেকে দু-পেয়ালা চা নিয়ে এলঘরের কেট্‌লি নিয়ে গিয়ে। দু-পেয়ালা ভর্তি করে কেট্‌লিতে একটু বাড়তি চা রইল, সেটুকু আবার পরে ঢেলে দিলে। চা খেতে খেতে শম্ভুডাক্তার ও গোপীকৃষ্ণবাবু বিদেশ ভ্রমণের গল্প করেন—অর্থাৎ ভ্রমণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, করা উচিত বা করলে ভালো হয় সেকথা বলেন। এটা এঁরা দুজনে প্রায়ই করে থাকেন, দুই বন্ধুরই খুব বেড়ানোর সখ কিন্তু সংসার নিয়ে জড়িয়ে

পড়েছেন, টাকা পয়সায় কুলোয় না, কোথাও কখনও যাওয়া ঘটে না, বলেই সুখ। শম্ভু ডাক্তার পশ্চিমে গিয়েছে মগরা পর্য্যন্ত, তাও অনেক কাল আগে, সেখানে ছিল মাসীর বাড়ি। গোপীকৃষ্ণ তার চেয়ে একটু বেশি, বর্ধমান পর্য্যন্ত। দুই বন্ধুর পশ্চিম ভ্রমণের এই পর্য্যন্ত ইতি।

তবে প্রতি বৎসর পূজোর আগে দুজনে বসে বিদেশ-ভ্রমণের প্ল্যান আঁটেন নানারকম—এবার কোথাও যাওয়া যাক—বুঝলে! কত পয়সা তো কত দিকে খরচ হচ্ছে। টাকা চল্লিশ হোলে একবার কাশীটা ঘুরে আসা হয়। তখন তর্ক বাধে দুজনে। কাশী না গয়া কিংবা সাঁওতাল পরগণা। অবশেষে সেদিন ব্যাপার মুলতুবী থাকে। পরদিন আবার সুরু হয় আলোচনা—কি বল, তা গেলে ভাগলপুরই ঠিক করা যাক্? পাহাড় কখনও দেখা হয় নি। ভাগলপুরে কি পাহাড় আছে? ঠিক 'সংবাদ দুজনের কেউ জানেন না। এমনিভাবে পূজো এসে পড়ে, এই একমাসে বহু নাম উচ্চারিত হয় ভ্রমণ-সম্পর্কে—পেশোয়ার, কাশ্মীর থেকে শুরু করে দিল্লী, জয়পুর, বৃন্দাবন, শিলং এমন কি, বীরভুম জেলার নলহাটি পর্য্যন্ত। শেষ পর্য্যন্ত কোনও বার কোথাও যাওয়া ঘটে না, শম্ভু ডাক্তারের তিন মাসের দোকানভাড়া বাকী পড়তে বাড়িওয়ালা নালিশের ভয় দেখায়, গোপীকৃষ্ণবাবুর ছোট ছেলে টাইফয়েডে পড়ে—যায় সব ভেস্তে।

বহু বৎসর ধরেই এমন চলছে। তবুও এঁরা ছাড়বার বা দমবার পাত্র নন। শ্রাবণ মাসের শেষ থেকে শুরু করে পূজোর সময় পর্য্যন্ত ভ্রমণের সম্বন্ধে আলোচনা এঁদের কামাই নেই। এতে তো পয়সা খরচ হয় না, অথচ টাইমটেবিল ঘেঁটে পাঁচটা দূরের নাম পড়ে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

আজও গোপীকৃষ্ণবাবু চা খেতে খেতে বললেন—আর মাসখানেক বাকী পূজোর। এবার কিন্তু কোথাও যাওয়া নিতান্ত দরকার। ঠিক করে ফেলা যাক্ আজই বুঝলে? টাইম টেবিল আছে তো? টাইম টেবিল তৈরি। যারা কখনও কোথাও বেড়ায় না, তাদের টেবিলে সর্বদা টাইমটেবিল মজুদ থাকে। শম্ভু ডাক্তার খাপ্ থেকে চশমা খুলে টাইম টেবিলের পাতা ওলটান।

—আচ্ছা, চিত্রকুট জায়গাটা নাকি খুব ভাল। তুমি জানো কিছু?

এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখায়। গোপীকৃষ্ণবাবু বলেন—হাঁ—তা বেশ ভাল জায়গা।

ভাড়াটা দেখ হে—আবার ভাই আর অমত কোরো না। চলো চিত্রকূটই যাওয়া যাক্।

গোপীকৃষ্ণবাবু ন্যায্যপক্ষেই বলতে পারতেন, তাঁর মতামতের অভাবেই যে এতকাল ভ্রমণ বন্ধ আছে, একথা সত্যি নয়। কিন্তু তিনি কোনও প্রতিবাদ করেন না। চিত্রকূটের ভাড়া বেরুলো টাইম টেবিল খুঁজে। শম্ভু ডাক্তার বললেন—ওর ওপর ধরো আরও কুড়িটে টাকা—খাওয়া দাওয়া—পান সিগারেট—যুদ্ধের বাজার, বুঝলে না?

—সে তো বটেই।

—তা হোলে এবার আর অমত কোরো না। এখন থেকে রেডি হওয়া যাক্, কি বলো? পূজো তো এলো। দুই বন্ধুতে আরও ঘণ্টা দুই বসে ভ্রমণের নানা পরামর্শ করেন। বাড়ি থেকে খাবার তৈরি করে নেওয়া উচিত। সব জিনিস আক্রা। বেডিং কি কি সঙ্গে নেওয়া যায়? শম্ভু ডাক্তার মুখে মুখে লেগে বলতে গেলেন—ধরো একটা মশারি, বালিশ—

গোপীকৃষ্ণবাবু অধীর ভাবে বললেন—আহা—আহা—মুখে কেন, কাগজে লিখে ফেলো না? কাজ পাকা করা দরকার। মশারি, বালিশ—তারপর? গায়ে দেবার কম্বল—

—কম্বল।

—সুজনি।

একজন লোক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললে—এটা কি ডাক্তারখানা?

শম্ভু ডাক্তার হাতের কলম ফেলে ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ডাক্তারখানা—ডাক্তারখানা—

—কি দরকার?

লোকটা বললে—হোমিওপ্যাথিক?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—হোমিওপ্যাথিক—ভাল হোমিওপ্যাথিক—কার অসুখ?

—অসুখ কারো না। এমনি জিগ্যেস করছি—

সে চলে গেল। শম্ভুবাবু আবার এসে টেবিলে বসে কলম ধরলেন, বিরক্তির সুরে বললেন—মিছিমিছি জ্বালায়! যেমন সব কাণ্ড—হাঃ—তারপর বলো সুজনি—

রাত দশটার সময় ব্যাপারটি অমীমাংসিত ও মুলতুবী রেখে দুই বন্ধু বাড়ি রওনা হন। কথা হয় আগামীকাল আবার বিকেলে একত্র হয়ে পুনরায়

আজকার থেই ধরা হবে। চলবে পরামর্শ। বাড়ি ফিরে গোপীকৃষ্ণবাবু আহারাদি করে শয়ন করেন, কিন্তু উত্তেজনায় ঘুম আসে না! চিত্রকূট কতদূর না জানি। কত পাহাড় জঙ্গল দিয়ে যাওয়া। অনেক দূরের ট্রেণ-জার্নি। কত মজা হবে রাস্তায়! ভাল কথা, এক টিন ভাল সিগারেট নিতে হবে সঙ্গে। কত পয়সা তো কত দিকে যাচ্ছে! জীবনের একটা সুখ। বড় বড় পাহাড় দেখা যাবে পথে। পাহাড়ই কখনও দেখা হয় নি। ছুটির আর কতদিন দেরী? গোপীকৃষ্ণবাবু ক্যালেণ্ডার দেখলেন উঠে। ছাব্বিশ দিন বাকী মোটে। টাকার যোগাড় দেখতে হয় এখন থেকেই।

গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রীর পিত্রালয় কোলাঘাটের কাছে। তাঁর এক শ্যালক মিলিটারিতে কি চাক্‌রী পেয়ে কানপুর চলে গিয়েছিল, আজ দুদিন যাবৎ চিঠি এসেছে যে সে শ্যালকটি বাড়ি এসেছে। তার সঙ্গে একবার দেখা করতে যাওয়া দরকার। গোপীবাবুর স্ত্রী স্বামীকে তাগাদা দিতে লাগলেন। কবে সেখানে যাওয়া হচ্ছে? এবার পূজোর সময়ে কোলাঘাট নিয়ে চল। কতদিন তো যাওয়া হয় নি। ভাইটার সঙ্গেও দেখা হবে। গোপীকৃষ্ণবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন—হ্যাঁ, যাচ্ছি এখন তোমার সেই অজ্ গণ্ডমুখ্খু ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে সেই ধপ্‌ধপি জায়গায়—

গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী ঝঁঝালো সুরে বলে উঠলেন—হোক গণ্ডমুখ্খু, তোমার চেয়ে আর তোমার সেই হোমাপ্যাথি জল-বেচা ডাক্তার বন্ধুর চেয়ে অনেক ভালো। সে তবুও আছে কানপুরে—দেড়শো টাকা রোজগার করছে। তুমি বি-এ পাশ করে ষাট টাকায় ঘসছো। আজ সেই আমার বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত। বেলুড়ের ওদিক কখনও মাড়ালে না দুজনে। তোমাদের চেয়ে সে অনেক ভালো।

মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক করে কোনও লাভ নেই। গোপীকৃষ্ণবাবু চুপ করে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন আবার আপিস থেকে ফিরবার পথে তিনি গেলেন শম্ভু ডাক্তারের ওখানে। চা পানের পর আবার দুজনে নিবিড় পরামর্শ শুরু। কত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়, তার একটা নিট হিসেব করে ফেলতে হবে। শম্ভু ডাক্তার বলেন—আশু সাণ্ডেল কাল এসেছিল তুমি যাওয়ার পরে। তার মুখে শুনলাম পথে নিমিয়াঘাট বলে একটা ষ্টেশনে নেমে পরেশনাথ পাহাড়ে ওঠা যায়। চলো না কেন এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাক্।

—পরেশনাথ পাহাড় ?

—হ্যাঁ। হাইয়েষ্ট হিল অন দি বেঙ্গল প্লেন। সেটা দেখা—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—খুব ভাল। তাই যাওয়া যাবে।

—টাকাটার হিসেব ধরো এবার। যাতায়াতে ধরো—রেলভাড়া, খোরাকী—

—টুকিটাকি জিনিস পত্তর কেনা—

—কিনতে গেলে হাতী কেনা যায়—জিনিস কেনা বাদ ছাও। শুধু নিট খরচ যেটা—

এইভাবে সেদিনও কেটে গেল। পরদিন আবার পরামর্শ সভা বসে। এদিন কথা ওঠে কি কি জিনিস সঙ্গে নেওয়া যাবে। মশারি নেওয়া যাবে কি না এ তর্কের সেদিন কোনও মীমাংসা হোল না। শম্ভু ডাক্তার বলেন যেখানেই যাও, মশা থাক না থাক মশারি সঙ্গে থাকাই ভালো। মশা কামড়ালেই ম্যালেরিয়া হয়, ফাইলেরিয়া হয় আরও কত কি। মশারি নেওয়াটা এসেনশিয়াল। গোপীবাবুর মতে অতদূর পশ্চিমে পাহাড়ের দেশে মশা-ফশা নেই—এ কি আর বাঙলাদেশের খানাডোবাভরা পাড়াগাঁ ? মিছেমিছে ভারবোঝা বাড়ানো। ট্রাভেল লাইট। একগাদা বোচকাবুচকি ঘাড়ে করে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না।

রাত দশটা। দুই বন্ধু সভা ভঙ্গ করে সেদিনের মত যে যার বাড়ি চলে গেলেন।

আবার পরদিন দুজনে মিশলেন। আজকার তর্কের বিষয় খাবার জিনিস কি-কি সঙ্গে নেওয়া যাবে। বাড়িতে লুচি-পরোটা করে নেওয়াই ভালো। খাওয়ার জিনিসের আগুন দর। এক টাকার খাবার খেলেও পেট ভরে না। কি কি খাবার নেওয়া যায়। লুচি না পরোটা। আলুর তরকারী নেওয়ার দরকার নেই, বড্ড দাম আলুর। কুমড়োর ছোঁকা আর কচুর ঘন্ট দিব্যি তরকারী।

আরও কয়েক দিন এই ভাবে কাটবার পরে পূজো নিকটে এসে পড়লো। গোপীকৃষ্ণবাবুর মনে আনন্দ আর ধরে না। স্ত্রীকে বললেন—সব ঠিক যেন থাকে। ছোট মশারিটা শেলাই করে দাও। আর একটা ছোট ঘটি—

দিন-সাতেক পরে পূজোর ছুটি হবে। গোপীকৃষ্ণবাবুর ডাক পড়লো একদিন বড়বাবুর ঘরে। বড়বাবু বললেন—একটা কথা বলি। পূজোর বোনাসের লিস্ট হয়েছে, তাতে কিন্তু আপনার নাম নেই।

—আজ্ঞে কেন ?

—আর বছর আপনারা ক'জন লিফট্ পেয়েছিলেন। এ বছর আবার তাদের বোনাস দিলে অন্য সবার ওপর অবিচার করা করা হয়। তাই ঠিক হয়েছে—

—সার, এ কেমন যুক্তি হোল ? কাজে সন্তুষ্ট হয়েই তো আপনারা লিফট্ দিয়েছিলেন, এ বছর তবে এমন কি অপরাধ হলো আমাদের—

বাঙালীর আপিস। যা মনিবের রায়, সেই অনুসারে কাজ হবে। মনিব যা ভালো বোঝেন। যুক্তি-টুক্তি এখানে খাটবে না। হোলও তাই। অন্য সকলে দেড় মাসের মাইনে বোনাস পেয়ে গেল, গোপীকৃষ্ণবাবুর অদৃষ্টে জুটলো শুধু মাইনেটি। সেইদিনই গোপীবাবু অগ্রিম কিছু টাকার দরখাস্ত করলেন, মঞ্জুর হলো মাত্র পনেরোটি টাকা। তাও বজায় রাখা গেল না, দেশের বাড়ি থেকে চিঠি এসে হাজির, বৃদ্ধা পিসিমা লিখছেন—চৌকিদারী ট্যাক্স বাকী পড়েছে অনেক দিনের, এবার না দিলে ঘরবাড়ী ক্রোক হবে। পত্রপাঠ আটটাকা তের আনা ছ' কোয়ার্টারের ট্যাক্স বাবদ যেন পাঠানো হয়। গোপীকৃষ্ণবাবু প্রথমে রাগ করেছিলেন, যায় যাক্‌গে ক্রোক হয়ে। ভারি তো ভাঙা পৈতৃক বাড়ি, মশা আর জঙ্গলে ভর্তি, কেন পিসিমা বাঁশ, আম, কাঁঠালের উপস্বত্ত ভোগ করছেন, চৌকিদারি ট্যাক্সটা তিনি দিতে পারেন না ? আমার ঘাড়ে কেন চাপিয়েছেন ? আমি কি সেখানে বাস করি ? পাঠাবো না টাকা।

পরে তাঁর স্ত্রী বোঝালেন চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে কি লাভ ? তাঁরই দুটি ছেলে, বেঁচে থাকলে ও সম্পত্তি তাদেরই থাকবে। বুড়ী পিসীমা চোখ বুজবেন আজ বাদে কাল, বাড়িঘর বজায় রাখবার গরজ তাঁর তত থাকবার কথাও নয়।

শম্ভু ডাক্তারের বৈঠকখানায় গোপীকৃষ্ণবাবু ঢুকলেন একটু মন-মরা ভাবে। দেখলেন শম্ভু ডাক্তারের মনের অবস্থাও তেমন সুবিধে নয়। চা এল, ভ্রমণ বিষয়ে কোনও কথাই ওঠে না, অন্যান্য কথাই চলে। গোপীবাবু সাহসে ভর করে বললেন—তারপর যাওয়া সম্বন্ধে কি ঠিক করলে ? শম্ভু ডাক্তার বললেন —ভাই, এ মাসে যা কিছু পেয়েছিলাম, সব গেল ছেলেমেয়ের কাপড়চোপড় কিনতে। আগে তো ভাবিনি অত টাকা কাপড়ে খরচ হবে, একখানা করে কাপড় কিনতে তেতাল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। আর হাতে টাকা নেই।

তবে পাঁচদিন এখনও বাকী, দেখি যদি এর মধ্যে কোনও শক্ত কেস্-টেস এসে যায় ভগবানের দয়ায়—

গোপীকৃষ্ণবাবুও নিজের টানাটানির কথা ব্যক্ত করেন। তবে এখনও পাঁচদিন বাকি ঐ যা ভরসা। যদিও এটা মনকে চোখ ঠারা মাত্র, পাঁচ দিনে গোপীকৃষ্ণবাবু কি আর ত্রিশ হাজার টাকা লটারিতে পাবেন, তা কিছু নয়।

শম্ভু ডাক্তার বললেন—আচ্ছা, চিত্রকূট যদি না-ও হয়—অতদূর—

—টাইম টেবিলে একটা জায়গা বলছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, লুপ লাইনের কাজরা স্টেশন থেকে ছ' মাইল। সিনারি বেশ বলে লিখছে—

—আচ্ছা আমার শালী বলছিল, গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনের নিমিয়াঘাট বলে একটা স্টেশন থেকে পরেশনাথ পাহাড় যাওয়া যায়। তাই যাবে? খরচ কম হয়।

আবার রাত দশটা পর্য্যন্ত আলোচনা। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম না পরেশনাথ পাহাড়? কোন্‌টা সস্তা। হিসেব করে টাইম টেবিল পড়ে দেখা গেল তাতেও পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা খরচ পড়বে জন পিছু। তার কমে হবে না।

—ও একরকম করে জোগাড় হয়ে যাবে এখন, বললেন, শম্ভুবাবু।

আশ্চর্যের বিষয়, রোগী এবং রোগ দুই হঠাৎ কলকাতা সহরে বড্ড কমে গেল। সারাদিনে আগে তবুও দুটো টাকাও হোত, এখন পাঁচ আনার নক্স-ভমিকাও বিক্রি হয় না। রোগী দেখা দূরের কথা ওযুধ বিক্রি পর্যন্ত বন্ধ। তার ওপর শম্ভু ডাক্তারের মামাতো ভাই বিধু এসে হাজির সঙ্গে তার স্ত্রী। দেশে চলছে না আদৌ, এতবড়ো ডাক্তার পিস্‌তুতো ভাই থাকতে তারা কি না খেয়ে মরবে?

গোপীকৃষ্ণবাবুর অবস্থাও যে ভালো তা নয়। ইতিমধ্যে একদিন তাঁর ভাইঝি জামাই দুই ইলিশ মাছ পাঁচ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে হাজির। গোপীবাবুর স্ত্রী এসে বললেন—ওগো শুনছো, জামাইয়ের ও মাছের টাকা দিয়ে দিও যাবার সময়।

গোপীবাবু রেগে উঠে বললেন—কেন? আমি কি বলেছিলাম আমার বাসায় মাছ কিনে না আনলে আমরা সবাই না খেয়ে মরতে বসেছি? পাঁচ টাকা খরচ করে একজোড়া মাছ না আনলে চলছিল না?

—ছিঃ ওকথা বলতে নেই। জামাই মানুষ, এনে ফেলেছেন যখন, তখন সে দাম দিতেই হবে। সবাই মিলে মাছটা তো খাওয়া হয়েছে? জামাইএকা খান নি।

—খাননি তাই কি? আমার সংসারে এক পো খয়রা মাছ কিনলে চলে

যায় ছ' আনা দিয়ে। পাঁচ টাকার মাছ কিনে একদিন খেয়ে আমার লাভটা কি হোল বলতে পারো ?

যতই উল্টো তর্ক করুন, তাঁকে শেষ পর্যন্ত সুবোধের মত মাছের দামটা জামাতা বাবাজির হাতে গুঁজে দিতে হোল যখন তিনি যাচ্ছেন। মিটে গেল ব্যাপার। আটটা টাকা বুক করে রাখা ছিল, তার মধ্যে ইলিশ মাছের ঠ্যালায় গেল পাঁচটা টাকা অকারণে বেরিয়ে।

শম্ভু ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতে বসে দুই বন্ধু কথা বলছেন। এবার কিন্তু ভ্রমণের আলোচনা নয়, কোথাও যাওয়া তাঁদের হবে না দুজনেই বুঝেছেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনের বস্তাপচা আটা ময়দার কথা উঠেছে। ভ্রমণের সম্বন্ধে একটা কথাও কেউ বলেন নি আজ। কাল ষষ্ঠী।

হঠাৎ গোপীকৃষ্ণবাবু উস্‌খুস্ করতে করতে পকেট থেকে একখানা রঙীন কার্ড বের করে বললেন—হ্যাঁ—এই বলছিলাম কি, আমাদের আপিসের বঙ্কু সরকার কাল আপিস বন্ধের দিন এখানা দিয়ে গেল। ওদের গ্রাম লাঙলপোতায় সর্বজনীন দুর্গোৎসব হবে তারই নেমন্তন্ন। রামায়ণ গান হবে, চণ্ডী হবে দু'রাত। যাবে ? বেশি দূর নয়, বারাসাত ষ্টেশনে নেমে দু মাইল। চলো, পূজোর ছুটিটা তবুও কলকাতার বাইরে—আর সে বেশ জায়গা, ছেলে-ছোকরাদের দল মিলে রাস্তা করেচে, ঘাট করেচে, জঙ্গল কেটেচে। একটা পুরোণো শিবমন্দির আছে নাকি অনেককালের। তাহলে কাল সকাল সাতটায় শেয়ালদ থেকে দত্তপুকুর লোক্যাল ছাড়বে—ওতেই চলো যাওয়া যাক্। দেখবার মত জায়গা।

শম্ভু ডাক্তার উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন,—বেশ, বেশ, সে বেশ বেড়ানো হবে এখন। চলো তাই, আমি ঠিক সময়ে রেডি হয়ে ষ্টেসনে হাজির হবো কাল।

পরবর্তী তিনদিন দুই বন্ধুর পরম আনন্দে লাঙলপোতায় কাটে।

সত্যি বেশ জায়গা। অনেক কিছু দেখবার আছে। একটা পুরোনো শিবমন্দির। চৌধুরীদের বড় মজা দীঘি। গাঁয়ের ছেলে-ছোকরাদের নিজেদের তৈরী মেটে রাস্তা। শনিবারে-সোমবারে হাট বসে—বেগুন কুমড়ো-ঝিঙে রাঙা আলু বিক্রী হয়। রামায়ণ গান হোল নবমীর রাত্রে। পরদিন হোল গ্রামের দলের কেষ্ট যাত্রা। খাওয়া-দাওয়াও কদিন বেশ হোল। বঙ্কু সরকার অতিথি বৎসল লোক।

খুব খুশি গোপীকৃষ্ণবাবু ও শম্ভু ডাক্তার।

নস্তুমামা ও আমি

ছেলেমানুষ তখন আমি। আট বছর বয়স।

দিদিমা বলতেন তোর বিয়ে দেব ওই অতুলের সঙ্গে।

মামার বাড়ীতে মানুষ, বাবা ছিলেন ঘর-জামাই—এসব কথা অবিশ্যি আরও বড় হোলে বুঝেছিলাম।

অতুল আমার দিদিমার সইয়ের ছেলে, কোথায় পড়ে, বেশ লম্বামত আধফর্সা গোছের ছেলেটা। আমাদের রান্নাঘরে বসে দিদিমার সঙ্গে আড্ডা দিত। অতুলকে আমার পছন্দ হোত না, কেমন ধারা যেন কথাবার্তা। আমায় বলতো—এই পাঁচী যা এখানে কি? ঐ দিকে গিয়ে খেলা করগে যা—

কখনো বল্‌তো—অমন দুষ্টুমি করবি তো বাঁশবনে লম্বা শেয়ালটা আছে, তার মুখে ফেলে দিয়ে আসবো বলে দিচ্চি—

অতুলকে সবাই বলতো ভাল ছেলে। লেখা-পড়ায় বছর বছর ভালো হয়ে ক্লাসে উঠতো। আমার ছোট মামার সঙ্গে কি সব ইংরিজি মিংরিজি বলতো—যদি তার কিছু বুঝি!

এই সই জন্যেই হয়তো অতুলকে আমার মোটেই ভাল লাগতো না। তা সে যতই ভাল হোক, লোকে তাকে যতই ভাল বলুক।

ভালো আমার লাগতো মুখুয্যে বাড়ীর নস্তুকে। কি সুন্দর ফর্সা চেহারা, ননী ননী গড়ন, ডাগর চোখ-দুটি, বেশ হাসি হাসি মুখখানি। বয়সও অতুল মামার মত অত বেশি নয়, আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড় হবে। অতুল মামার বয়েস হয়তো ছিল ষোলো সতেরো।

নস্তু হাসলে তার মুখ দিয়ে যেন মুক্তো ঝরতো—দিদিমার সেই গল্পের মত। এমন সুন্দর মুখ আমার আট বছরের জীবনে এ অজ পাড়াগাঁয়ে ক'টাই বা

দেখেছি! দিদিমার কাছে এসে বসে মাঝে মাঝে সেও গল্প করতো, সে যা বলতো তা যেন মধুর, অতি মধুর। আমি হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে একমনে ওর কথাগুলো যেন গিলতাম। অতুলও তো কথা বলে, কিন্তু তার কথা এত ভালো লাগতো না তো?

দিদিমা বলতেন—অতুলের সঙ্গে পাঁচীর বিয়ে দেবো, বেশ মানাবে।

আমি মুখ ভারি করে বলতাম—ছাই মানাবে।

দিদিমা হেসে বলতেন—ওমা মেয়ের কাণ্ড ছ্যাখো। কেন মানাবে না রে?

—তুমি তো সব জানো!

—তবে তোর মতটা কি শুনি? কাকে বিয়ে করবি তুই?

—ওই নন্তুকে।

দিদিমা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলতেন—এর মধ্যেই মেয়ে নিজের বর বেছে নিয়েচে! ধন্যি যা হোক, এ কালের মেয়ে কি না! শুনলে সই, নন্তু নাকি ওর বর হবে।

অতুলের মা হেসে বলতেন—কেন রে, অতুলকে তোর পছন্দ হয় না কেন?

—অতুল মামার বয়েস বেশি।

—বেশি আর কত? ষোল বছর।

—তা যাই হোক ষোল বছরের বুড়োকে আমি বুঝি বিয়ে করবো? নন্তু ছেলেমানুষ।

দিদিমা বলতেন—ছ্যাখো সই এ কালের মেয়ের কাণ্ড। নন্তুর বয়স বারো, ওকেই বেশি পছন্দ। তোমার আমার কাল চলে গিয়েচে। তেরো বছর বয়সে আমার বিয়ে হোল, উনি তখন বিয়াল্লিশ, দোজপক্ষে আমায় ঘরে আনলেন। তোমারও তো—

অতুলের মা বল্লেন—আমার অত না! উনি তখন উনত্রিশ, আমার এগারো।

—দোজপক্ষ তো বটে।

—শুধু তাই? সতীন বেঁচে।

—আমায় ভগবান সেদিক থেকে নিষ্কণ্টক করেছিলেন তাই খানিক রক্ষে।

মাঝে মাঝে নন্তুকে অনেকদিন দেখতাম না। আমাদের পাড়ায় সে আসতো না খেলতে। আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো, ছুটে যেতাম মুখুয্যে বাড়ীতে।

নসু মামা উঠোনে বসে কঞ্চি কেটে খেলাঘরের বেড়া বাঁধছে। সঙ্গে আরও তিন-চারিটি ছেলে, ওরই বয়স।

আমি বলতাম—ও নসু মামা, আমাদের বাড়ী যাও নি যে?

—কি রোজ রোজ যাবো? তুই এতদূর এলি যে? আসতে ভয় করে না।

—না।

—খেলা করবি?

—হুঁ।

অন্য ছেলেগুলো তখুনি বলে উঠতো—মেয়ে মানুষ আবার আমাদের সঙ্গে খেলবি কেন? যা তুই পুঁটি, মান্তিদের সঙ্গে খেলগে যা।

নসু বল্‌তো—খেলুক আমাদের সঙ্গে—তাতে কি?

হাবু বলতো—ও কি দা দিয়ে কঞ্চি কেটে আনতে পারবে? কি খেলা হবে ওকে নিয়ে? যা তুই—

আমাকে কাঁদো কাঁদো দেখে নসু এসে হাত ধরতো। বলতো—কেন ওকে অমন কচ্ছিস তোরা? ও কেন কঞ্চি কাটতে যাবে? মেয়েমানুষ, চুপ করে বসে থাকবে। বোস তুই পাঁচী—

আমি অমনি কৃতার্থ হয়ে উঠোনের একপাশে বসে পড়তাম। নসু মামা খেলতে খেলতে হয়তো একটা পেয়ারা ছুঁড়ে দিতো আমার দিকে। বসে বসে পেয়ারা চিবুতাম। অনেক্ষণ পরে বলতাম--নসু মামা খিদে পেয়েচে—

হাবু অমনি বলে উঠতো—ঐ শোনো কথা। ও সব হ্যাঙ্গাম—

নসু মামা বলতো—তুই চুপ কর হাবু। খিদে পেয়েচে? চল পিসিমার কাছে, দুটো চালভাজা খাবি তেলনুন দিয়ে? না একটা কচি শশা পেড়ে দেবো—

আমি বলতাম—না, তুমি আমার বাড়ী দিয়ে এসো। আমি বাড়ী গিয়ে ভাত খাবো। একলা যেতে ভয় করে।

হাবু অমনি চোক পাকিয়ে বলে—তবে একলা এলি কি করে? কে এখন তোর সঙ্গে যাবে পৌঁছে দিতে। উঃ, ভারি পাজি মেয়ে—

নসু আমার আগে আগে বাড়ী পৌঁছে দিতে আসতো, ধূলো মাটির পথের ধারে কত কেঁচোর মাটি, কত বেনে-বৌ গাছে গাছে, পাকা বকুল পড়ে থাকতো বকুল তলায়। নসুকে পাকা বকুল খাওয়াতে ইচ্ছা করতো,

আমি বড্ড ভালবাসি পাকা বকুল। নস্থ মামাকে কুড়িয়ে খাওযাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে বলতো দুর, ও কষা কষা লাগে। তুই খা, আমি খাবো না। নস্থকে খেতে দিয়ে যেন আমার তৃপ্তি, সে সুযোগ ও আমায় দিত কই।

এইভাবে সারা শৈশব ও বাল্যকাল কেটে গেল সেই আমার ছেলেবেলাকার অতি পরিচিত মামার বাড়ীর গ্রামের গাছপালার ছায়ায় ছায়ায়, চৈত্র মাসের পাখী-ডাকা শীতল সকালবেলাকার মত। তার পরেই জীবনের রোদ খরতর হয়ে উঠলো ক্রমশ। ফুল-ফোটা পাখী-ডাকা বসন্তপ্রভাত গেল ধীরে ধীরে মিলিয়ে। বাতাস গরম হয়ে উঠলো।

সেই গাঁ, সেই ত ঘরা শেখহাটি এখনও আছে। মাঝে মাঝে এখনও সেখানে যাই, কত বদলে গিয়েচে সে জায়গা। সে মামার বাড়ী নেই, সে দিদিমাও নেই।

বাবা কোথায় কাদের আড়তে কাজ করতেন। সামান্য ক'টি টাকা মাইনে পেতেন, দিদিমার সঙ্গে সংসারের খরচপত্র নিয়ে তাঁর প্রায়ই ঝগড়াতর্ক হোত। বাবা রাগ করে চলে যেতেন বাড়ী থেকে, দু-একমাস কোন খবর আসতো না, মা কান্নাকাটি করতেন, হঠাৎ বাবা একদিন এসে হাজির হোতেন। দিন এভাবেই চলতো।

তেরো বছর বয়সে আমার বিয়ে হোল আড়ংঘাটার কাছে এক গ্রামে। বিয়ের দিনকতক আগে নস্থদের বাড়ী গিয়েছিলাম। নস্থর মার শরীর খারাপ, নস্থ রান্নাঘরে ভাত রাঁধচে। উনুনের আঁচে ওর ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে গিয়েচে। ওদের বাড়ীর কোনো বিলিব্যবস্থা নেই। অনেকগুলো ভাই নস্থর, তারা কেউ বাইরে পড়ে, কেউ কাজ করে। নস্থর মার শরীর চিররুগ্ন, সংসারের রান্নাবান্নার ভার নস্থ মামার ওপর। আজ অনেকদিন থেকেই নস্থর এই অবস্থা দেখচি।

নস্থর অবস্থা দেখে সত্যিই কষ্ট হোল। নস্থর মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই, ভাইয়েরা সব স্বার্থপর, সংসার চালানোর ভার ওর ওপর ফেলে দিয়ে সবাই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে আছে।

নস্থ মামা আমায় দেখে হেসে বল্লে—আয় পাঁচী, বোস। কাল দই পেতেছিলাম, দইটা বসেনি। উনুনের পাড়ে রেখে দেবো, কি বলিস?

যত সব মেয়েলি গল্প নস্থর। সাধে কি ওকে সকলে বলে জনার্দন মুখুয্যের বিধবা মেয়ে ?

আমায় বল্লে—কাল বুঝলি, এককাঠা মুগের ডাল ভাজলাম, ভাঙলাম। বেলা গেল ডালডুল করতে। গা-হাত-পা ব্যথা।

বল্লাম—তুমি ডাল ভাজলে ? সত্যি ?

—হ্যাঁরে। নইলে কে করবে ? আবার কাল একগাদা ময়লা কাপড় সোডা-সাবান দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে।

দুঃখিত সুরে বল্লাম—ও সব মেয়েলি কাজ। তুমি ও সব কর কেন ? আমায় ডাকলে না কেন ? আমি ডাল ভেজে দিতাম।

নস্থ বল্লে—আহা ! আমি না-পারি কি ? তোকে আবার ডাকতে যাব কেন ?

—লেখাপড়া করবে না নস্থ মামা ? এসব কাজ কি তোমার সাজে ? পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া কর।

—আমায় কে পড়াবে ? দাদারা এক পয়সা দেবে না। তা ছাড়া মার শরীর খারাপ, আমি বাড়ী থেকে গেলে রান্নাবান্না কে করে বল। পড়াবার খরচ জুটলেও আমার পড়া হোত না।

আমি বসে বসে ওর কুটনো কুটে দিলাম। আমার বিয়ের কথা বল্লাম। নস্থ মামা বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলে না। ও যদি একটুও আগ্রহ প্রকাশ করতো, শুনতো কোথায় আমার বিয়ে হচ্চে ইত্যাদি, তা হোলে আমার ভাল লাগতো। কিন্তু নাঃ, সে সুখ আমার অদৃষ্টে নেই। নস্থ মামা একটা কথাও জিগ্যেস করলে না সে সম্বন্ধে।

আমার বিয়ের রাত্রে নস্থ নেমন্তন্ন খেয়ে এল পেট পুরে, কিন্তু না এল একবার বিয়ে দেখতে, না একবার বাসর ঘরে উঁকি মেরে দেখলে। আমার মনটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ও যদি আসতো তবে খুব ভাল লাগতো। মনের মধ্যে ডুব দেবার বয়স আমার নয় তখন, তবুও কি যেন একটা হয়ে গেল, এত বাজনা, এত খাবার দাবার, এত লোক জনের যাতায়াত, আমার নতুন কাপড় গয়না—কিছুই ভালো লাগলো না। মনে উৎসাহ নেই।

আগেই বলেচি আমার বিয়ে হয়েছিল আড়ংঘাটার কাছে শিকারপুর। স্বামীর বয়সও সতেরো আঠারোর বেশি নয়, রোগা চেহারা, মাথার চুল-ওঠা। বিয়ের পরে জানা গেল স্বামী ম্যালেরিয়ার পুরোনো রোগী। মাসে দুবার

ম্যালেরিয়া জ্বর বাঁধা আছেই। আড়ংঘাটার যুগলকিশোর ঠাকুরের মেলার সময় ময়রার দোকান খোলেন আমার খুড়শ্বশুর, স্বামী তাড়ু দিয়ে সন্দেশ-মুড়কী ভিয়েন করেন।

শ্বশুরবাড়ীতে যাবার সময় মনে খানিকটা কৌতুহল নিয়ে যে না গিয়েছিলাম এমন নয়। না জানি কেমন বাড়ী-ঘর, কেমন খাওয়া দাওয়া। গিয়ে দেখি পুরোনো আমলের ইঁট-বের করা কোঠা বাড়ী, দুটি মাত্র ঘর, ছোট একটা বারান্দা তবে সব ঘরগুলির সামনে সান বাঁধানো টানা রোয়াক এবং রান্নাঘরটীও কোঠা। খুব বড় একটা আম গাছ সমস্ত বাড়ীর উঠোন জুড়ে ঘুপসি করে রেখেচে।

আমার শাশুড়ী গর্ব্বের সুরে বল্লেন—আমের সময় তো আসচে, দেখো বৌমা। এমন আম এ অঞ্চলে নেই আমার বাগানে যা আছে, ডাক সাইটে বাগান, কর্ত্তা করে রেখে গিয়েছিলেন, এস্তেক গোয়াড়ি, এস্তেক শান্তিপুর, কোথা থেকে কলমের চারা এনে না পুঁতেচেন?

আমের সময় এল, কোথা থেকে ব্যাপারীরা এসে বাগান কিনে নিলে। দু' এক ঝুড়ি আম যা আমাদের বাড়ী এল, তা থেকে দুটো একটা জুটল আমার ভাগ্যে। শাশুড়ী নিতান্ত বাজে কথা বলেন নি, আম ভালো।

স্বামীর সঙ্গে আলাপ জমলো মন্দ নয়। ক্রমে তাঁকে ভালও লাগলো।

আমায় বল্লেন—তুমি কি খেতে ভালবাসো?

আমি লজ্জা-টজ্জার ধার ধারিনে, বলে ফেল্লাম—তেলে ভাজা খাবার।

স্বামী বল্লেন—দূর! অমন বোকা মেয়ে কেন? ভালো খাবারের নাম করো।

—গজা। জিলিপি।

—কেন খাজা?

—সে আবার কি গা? আমাদের গাঁয়ে শুনিনি তো।

উনি হো হো করে হেসে বল্লেন—পাড়াগেঁয়ে ভূত। আমাদের এ সহর বাজার জায়গা। কাল খাজা আনবো লুকিয়ে। কিন্তু সাবধান মা যেন টের না পায়। বকবে। আমি নিজে খাজা ভিয়েন করি।

সেই থেকে মাঝে মাঝে স্বামী লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার আনেন। কোনোদিন খাজা, কোনোদিন মিহিদানা। আমরা দু'জনে লুকিয়ে খাই। স্বামী বলেন—সবাইকে দিতে গেলে চলে না। খুড়তুতো ভাইয়েরা হাঁসের পাল, সবার মুখে দিতে গেলে তোমার আমার মুখে একটুকরো উঠবে কি না উঠবে।

শ্বশুরবাড়ী ভাল লাগলো না বটে তবে স্বামীকে কিছুটা ভাল লাগলো এই খাবার খাওয়া থেকে। উলোর জাতের মত বড় মেলা এ অঞ্চলে নেই, সে সময় ময়রার দোকানে কাজ বেশি। উনি ফেরেন অনেক রাতে। হাতে বড় বড় ঠোঙায় খাবার ভর্তি। উনি হেসে বলতেন—খাও, খাও, খুব খাও—এসো দুজনে পেটভরে খাই।

একদিন কি করে খুড়শ্বশুর টের পেলেন লুকিয়ে খাবার আনার ব্যাপারটা। এ নিয়ে খুব ঝগড়া হোল বাড়ীতে। আমাকে আর ওঁকে যথেষ্ট অপমান গালগালাজ সহ্য করতে হোল।

খুড়শাশুড়ি বল্লেন—অমন নোলায় সাত ঝাঁটা মারি। লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার খেয়ে দোকানটা শেষ করে দিলে গো? এমন অলক্ষি বৌ তো কখনও দেখিও নি, শুনিও নি। লজ্জাও করে না গুরুজনকে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে।

স্বামীকে রাত্রে বল্লাম—আর ওসব এনো না। ছাখো তো কি কাণ্ড বাধালে?

স্বামী বল্লেন—না আনবে না! আমায় কি মাইনে দেয় কাকা? বিনি মাইনের চাকর করে তো রেখেচে। পেটেও দুটো খাবো না? ঠিক আনবো লুকিয়ে তুমি দেখো। কেমন করে ধরবে কাকা তা দেখবো।

স্বামীর শরীর ভাল নয় অথচ ঘোর পেটুক। আমার কথা শুনতেন না। খাবার চুরি বন্ধ হ'ল না। রোজ রাত্রে একগাদা বাসি লুচি আর রসগোল্লার রস আনেন। নিজে খান, আমাকেও যথেষ্ট দেন। ওঁর পেটের অসুখ ছাড়ে না। আমার বারণ শোনেন না মোটে।

বলেন—খেয়ে যা উঠিয়ে নিতে পারি। কাকা এক পয়সা উপুড় হাত করবে না।

আমি বল্লাম—আমি বাপের বাড়ী যাবো আষাঢ় মাসে, আমায় নতুন কাপড় কিনে দেবে না?

উনি ঠোঁট উল্টে বল্লেন—কে দেবে? কাকা? তা দেখে আর বাঁচলাম না!

—সত্যি আমার নতুন কাপড় হবে না? বাপের বাড়ীতে কিন্তু সবাই নিন্দে করবে।

—যদি আমি দিতে পারতাম, সব হোত। আমার কি ইচ্ছে করে না তোমায় কাপড় দিতে? কোথায় পাবো?

—তাই তো। অনেকের নিন্দে শুনতে হবে তাই ভাবচি।

আষাঢ় মাসে বাপের বাড়ী এলাম। স্বামীও আমার সঙ্গে এলেন। তাঁকে দেখে গ্রামের সমবয়সী মেয়েরা নানা রকম নিন্দাবাদ করতে লাগলো।

আমায় একদিন রায়বাড়ীর মেজ গিন্নি বল্লেন—হ্যাঁ পাঁচী, জামাই নাকি তাড়ু ঘোঁটে ময়রার দোকানে ?

আমি অতশত বুঝি নে, বল্লাম—হ্যাঁ। খুব ভাল খাজা তৈরী করে। সবাই হাতের সুখ্যাতি করে মাসীমা।

মেজগিন্নি হেসেই খুন। তাঁর যে বড় পুত্রবধূ বাপের বাড়ী থেকে আসতে চায় না, বাপের বাড়ীর গ্রামে কোন প্রতিবেশী ছেলের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত, এসব কথা তিনি তখন ভুলে গেলেন। আমার স্বামীর খাবারের দোকানে কাজটাই প্রবল দোষের ও নিন্দের কারণ হয়ে উঠলো তাঁর কাছে। আমার স্বামীকে গ্রামের লোকে নতুন জামাই বলে খাতির আদর করলে না। আমার তাতে মনে বড় দুঃখ হোল। নতুন জামাইকে সকলে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়, আমার স্বামীকে সবাই যেন কেমন হেনস্থা করলে।

নসু মামা ঠিক তেমনি ভাত রাঁধচে। আমি তার ওখানে গিয়ে বসে গল্প করে একটু যা আনন্দ পেতাম। একটা জিনিস দেখলাম নসু ধর্ম্মে কর্ম্মে মন দিয়েচে এই বয়সেই। চন্দন ঘসচে দেখে বল্লাম—দিদিমা পূজো করেন বুঝি আজকাল? নসু হেসে বল্লে, মা নয়। পূজো করবো আমি। রোজ শিব গড়িয়ে পূজো করি! মানুষ হয়ে জন্মে শুধু খেয়ে যাবো শূওরের মত?

আমার হাসি পেলো ওর মুখে তত্ত্বকথা শুনে। নসু মামা আমাকে শসা কেটে খেতে দিল, নিজেই নারকোলের নাড়ু করেচে ঘরে, তা দিলে, চা খেতে দিলে।

বছর দুই-তিন কাটলো। আমার স্বামীর শরীর সারলো না। ক্রমেই যেন আরও খারাপ হয়ে উঠেচে। শাশুড়ী ও খুড়শাশুড়ী বলেন—ওই অলুক্ষুণে বৌ এসে বাছার শরীর একদিনও ভাল গেল না।

শাশুড়ী বললেন—সংসারের কোনো জিনিসে আঁট নেই তা দেখেছ লক্ষ্য করে?

কথাটা নিতান্ত মিথ্যে নয়, এ আমিও স্বীকার করচি। সত্যিই যেন আমার কোনো জিনিসে কোন আসক্তি নেই। ভাল কাপড় নয়, গহনা নয়—কোনো কিছুতে না। আমার স্বামী বলেন—পয়সা জমাও না কেন?

যা মাঝে মাঝে হাতে এনে দিই, জমিও। তোমার আখেরে ভাল হবে।

ওসব কথা আমি শুনেও শুনিনি কোনো দিন। কার আখেরে কি হবে সে ভেবে ফল কি?

আমার একটি ছেলে হোল, কয়েক মাস পরে মারাও গেল। স্বামীর অসুখ সারে না। সংসারে খেটেই মরি, মুখের মিষ্টি কথা কেউ বলে না। স্বামী আমায় নানারকম সাংসারিক উপদেশ দেন। তাঁর যে রকম শরীর, কবে মরে যাবেন তখন কি উপায় হবে? আমি যেন কিছু কিছু হাতে রাখি। এ কথা আমি যখন শুনি তখনই মনে থাকে তারপর আর মনে থাকে না।

সেই মাঘ মাসে আমি বাপের বাড়ী এলাম। গ্রামে এসে শুনি নস্তু মামার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, সে দিন-রাত পূজো-আচ্চা নিয়ে থাকে, কারো সঙ্গে কথা বলে না, কি রকম যেন। আমি গিয়ে দেখা করলাম বিকেলের দিকে। নস্তু মামা বললে—কি খবর পাঁচী, কখন এলি?

—কাল এসেছি। ভাল আছ?

—ভাল আছি। খুব আনন্দে আছি।

—সবাই তোমাকে পাগল বলচে যে?

নস্তু মামা মৃহু হেসে চুপ করে রইল। তারপর আমার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—আমি আসল বস্তু পাওয়ার চেষ্টায় আছি। এতে যে যা বলে বলুক। আমি পাগলই হই আর ছাগলই হই—হি-হি—হি-হি—হ্যাঁরে পাঁচী?

শেষের কথাগুলো আমার কানে একটু অসংলগ্ন-মত ঠেক্‌লেও নস্তু মামার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কি যেন একটা ওর মধ্যে আমি পেলাম, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখেনি। ওর মুখের চেহারা যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েচে। লোকে টাকাকড়ি, ঘর-জমি আঁকড়ে পড়ে আছে দেখচি আমার চারিপাশে, খুড়শাশুড়ীকে দেখেচি গাছের সামান্য একটা আম যদি গাছের তলা থেকে কোনো বাড়ীর ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে যায় তবে ঝগড়া করে মাত করেন। গাঁয়ের মধ্যে দেখচি এক হাত জমি হয়তো এগিয়ে বেড়া দিয়েচে কেউ, তাই নিয়ে মামলা-মোকদ্দামা দু'তিন বছর ধরে চলেচে। এমন আব-হাওয়ার মধ্যে নস্তু মামা মানুষ হয়েও স্বতন্ত্র, ওর কাপড়ে চোপড়ে, খাওয়ায়, বিষয় আশয়ে কোনো আশক্তি নেই, পৈতৃক বিষয় আছে, কিন্তু ভায়েদের দিয়ে

বসে আছে সর্ব্বস্ব, একটা পয়সাও চায় না। আমার স্বামী এসে দু'চার দিন রইলেন। স্বামীর ওপর আমার কেমন একটা মায়া হয়। এর মুখের দিকে কেউ যেন চায় না। আমার শাশুড়ী ছাড়া—তাও তিনি বুড়ো হয়েছেন, দেওরের কাছে কোনো কথা তাঁর খাটে না।

আমাদের গ্রামেও তাঁর তেমন খাতিরযত্ন নেই।

বল্লেন—এই গাঁয়ে একটা ঘর করলে ভাল হয়।

আমি বল্লাম—কেন, শ্বশুরবাড়ী বাস করবে? কেউ কিছু বলবে না?

—বলুক গে। কাকার ওখানে আর ভালো লাগে না।

—দেখ ভেবে।

—তোমাদের গাঁয়ের লোকগুলো যেন কেমন কেমন। ভাল করে কথাই বলে না।

আমার রাগ হোল, বললাম—তাড়ুঘোঁটা জামাইকে কে খাতির করবে শুনি?

স্বামী হেসে চোক টিপে বল্লেন—ইঃ! রোজ রোজ রাত্তিরে খাজা খাওয়ার সময় তো খুব ভাল্ল লাগে?

দু' একদিন পরে উনি চলে গেলেন। যাবার সময় আমার হাতে তেরো আনা পয়সা দিয়ে বলে গেলেন—এই পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খেও। মাস-খানেক থাকো, তারপর এসে নিয়ে যাবো।

আর আসেন নি তিনি। সেই মাসের শেষের দিকে পুরনো আমাশা রোগে তিনি আমার সিঁথির সিঁদুর আর হাতের শাঁখা ঘুচিয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন। বাবা চিঠি পেয়ে আমাদের প্রথমে কিছু বলেন নি, তারপর দু'দিন পরে মাকে একদিন বল্লেন—হ্যাঁ একটা কথা, জামাইয়ের বড় অসুখ, চিঠি পেয়েচি।

মা আড়ষ্ট স্বরে বলে উঠলেন—সে কি গো! এতক্ষণ বলনি কেন? হাটে চিঠি পেলে? কই দেখি চিঠি?

বাবা আমতা আমতা করে বল্লেন—তা—ইয়ে মনে ছিল না। তা নয়—ইয়ে—

আমি কান-খাড়া করে পাশের ঘরে বসে সব শুনচি। আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করচে। মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে যেন। জিব শুকিয়ে আসচে। আমি বুঝতে পেরেচি সব। বাবা অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ লোক, জামাইয়ের

অসুখ-সংবাদে চুপ করে বসে থাকবার মানুষ নন। মা ছুটে হাঁপিয়ে বাবার কাছে এসে বল্লেন—তার কাছে এখুনি চলে যাও। মেয়ের যাবার কথা লেখেনি? ওকেও নিয়ে যাও—

বাবা শুষ্কমুখে বল্লেন—আর সেখানে গিয়ে কি হবে গিন্নি। সব শেষ হয়ে গিয়েচে!

মা মেজের ওপর আছড়ে আছড়ে পড়লেন আর্ত্ত চীৎকার করে। আমি কিন্তু বেশ সহজ ভাবেই কথাটা শুনলাম কারণ আমি আগেই বুঝতে পেরেচি বাবা কি বলবেন।

এইভাবে আমার বিবাহিত জীবনের ইতি হয়ে গেল। কি করবো, আমার অদৃষ্ট। বাবা তো বুড়োহাবড়া স্বামীর হাতে আমায় দেননি, ছোকরা দেখেই দিয়েছিলেন, আমার কপালের লেখা, কারো দোষ নেই। আমার কিন্তু বিশেষ কোন দুঃখ নেই মনে। বিশেষ কিছু যে হারিয়েচি, বিশেষ কোন অভাব বোধ নেই। লোকে বলচে আমার নাকি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। কি সর্ব্বনাশ হোল কিছু বুঝতে পারচি নে। মাছ খেতে পাবো না, না-ই বা পেলাম, একাদশী করতে হবে, করবো। ভালো খাওয়া বা পরার দিকে আমার কখনো কোন ঝোঁক নেই। তবে মানুষটার ওপর মায়া জন্মেছিল বটে, তাকে আর দেখতে পাবো না, এইটুকু যা কষ্ট।

বিধবা হওয়ার পরে আমি অনেকবার শ্বশুরবাড়ী গেলাম।

শাশুড়ীর সেবা করি, মুখরা যায়ের সংসারে পুত্রহীনা বৃদ্ধার বড় কষ্ট, যত দূর পারি সেটুকু ঘোচাবার চেষ্টা করি। একাদশীর দিন শাশুড়ী-বৌয়ে নিরম্বু উপোস করি, সন্ধ্যের সময় তাঁর পায়ে তেল মালিশ করি।

খুড়শাশুড়ী সর্ব্বদা শোনান, আমি অলুক্ষণে বৌ, আমায় ঘরে এনেই তাঁর সোনার চাঁদ ছেলে, দুধের বাছা মারা গেল।

ভাসুরপোর ওপর এমন স্নেহ ভাসুরপোর জীবদ্দশায় কোনোদিন দেখেচি বলে মনে করতে পারলাম না। আশ্চর্য্য!

একবার বাপের বাড়ী এসে শুনলাম নন্টু মামা বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েচে। ছ'মাস পরে খবর এল হালিসহরের এক কালীমন্দিরে সে আছে, গঙ্গার তীরে দুখানা ভাঙা মন্দির। সেখানে সে পুজো-আচ্চা নিয়েই নাকি আছে।

খবরটা দিলে ও পাড়ার বুধো গয়লার মা, ঘোষপাড়ার দোল দেখে দেশে ফিরবার পথে সে হালিসহরে গিয়েছিল, সেইখানেই দেখা হয়েচে। আমি মনে মনে ভাবলাম ওর পক্ষে ভালই হয়েচে। কি জানি কেন আমার মনে হয় নসু মামা যা করে তাই ভালো।

এইভাবে দিনের পর দিন কাটে। বৃদ্ধা শাশুড়ীকে কত যত্নে আগলে নিয়ে বেড়াই, বাপের বাড়ী গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারি নে, পাছে বুড়ীর কষ্ট হয়। একদিন শাশুড়ী বল্লে—চল মা, সান্যাল মহাশয়ের বাড়ী ভাগবত শুনে আসি—

—সে কে মা ?

—পাড়ার বুড়ো সান্যাল দাদা, ত্থাখোনি বুড়োকে ?

সান্যাল মশায়ের বাড়ী গেলাম। ওঁর অবস্থা বেশ ভাল বলে মনে হোল বাড়ীঘর দেখে, শুনলাম দুই ছেলে কলকাতায় চাকুরী করে, তাদের স্ত্রীপুত্র তাদেরই সঙ্গে কলকাতার বাসায় থাকে। সান্যাল মশায় বিপত্নীক। বয়স ছিয়াত্তর বছর, নিজেই বল্লেন। একটি বিধবা বোন বাড়ীতে থাকে ও রান্না-বান্না করে। আমাদের দেখে খুব যত্ন করলেন, আমাদের সামনে ভাগবত ব্যাখ্যা করে শোনালেন।

সেই থেকে সান্যাল মশায়ের বাড়ীতে রোজ যাই। আমায় তিনি বড় ভালবাসেন, যোগবাশিষ্ঠ ও ভাগবত তাঁর প্রিয় বই। যদি দু'দিন না যাই, সান্যাল মশায় আমার শ্বশুরবাড়ী আসবেন। আমার শাশুড়ী তাঁর বৌমা। ডেকে বলেন—ও বৌমা ?

বৃদ্ধা শাশুড়ী মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে বলেন—কি দাদা ?

—নির্ম্মলা (আমার ভাল নাম) কোথায় ? ডেকে দাও।

আমি বের হয়ে এসে বলি—কি দাদু ?

—দাদু কি রে, তোমার জ্যাঠামশাই হই। তোমার শ্বশুরের চেয়ে এগার বছরের বড় আমি। আমার ওখানে ক'দিন যাওনি কেন ? আজ অবিশ্যি যাবে।

আবার নিয়মিত ভাবে যাই। সান্যাল মশায় আজকাল আর কোন শ্রোতা চান না, আমার মধ্যে কি যে দেখেচেন—আমাকে পেয়ে খুব খুসি। যোগবাশিষ্ঠ পাঠ জমে না আমি না গেলে।

একদিন তাঁকে বল্লাম—জ্যাঠাবাবু, আমি তো মুখ্যু মেয়েমানুষ, আমার মধ্যে কি পেলেন আপনি ?

—কি পেলাম কি জানি। কিন্তু তুমি গেলে মা আমার গীতা আর যোগবাশিষ্ঠ জ্যান্ত হয়ে উঠে। ওদের শ্লোকের মধ্যে থেকে নতুন ভাষ্য বেরিয়ে আসে। আনন্দ যদি শাস্ত্র-আলোচনার উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটার ষোল-আনাই পাই তুমি আস্‌লে মা।

আমি হেসে বল্লাম—তা হোলে বলুন জ্যাঠামশাই আমার মত শ্রোতা আপনি অনেকদিন পান নি ?

—সত্যি মা, এতদিন জানতাম না যে লোককে শুনিয়ে এত আনন্দ হয়। নিজেই চর্চ্চা করতাম এই পর্য্যন্ত। আজ কিন্তু অন্যরকম বুঝচি। উপযুক্ত শ্রোতা পেলে—

আমারও ভাল লাগে বলেই যাই। কেমন যেন মন বদলে যাচ্ছে, যে মন আমার কোনো কালেই সংসারে ছিল না—তা আরও নিরাসক্ত হয়ে পড়েচে। বন্ধনের মধ্যে কেবল বৃদ্ধা শাশুড়ী। বৃদ্ধা কাঁদেন, আমি বসে যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ শোনাই। কিন্তু তাতে তাঁর মন ভেজে না। ঘোর বিষয়ী মন। এ বয়সেও কাঁটালের ভাগ নিয়ে, সজনে ডাটার ভাগ নিয়ে, খুড়শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া। আমি বলি—মা, কি হবে আপনার এঁচড় আর সজ্‌নে-ডাঁটার চুলচেরা ভাগে। ওর কি সার্থকতা ? ভগবানের নাম করুন।

বাতাবী লেবু ফুটলো ফাগুন মাসে—পথে পথে অপূর্ব্ব সুগন্ধ ছড়িয়ে। ঘেঁটুফুলে বাঁশবনের তলা ভর্ত্তি হয়ে গেল। কোকিলের ডাকে মন উদাস হয়ে ওঠে, কত কথা ভাবি। বাল্যকালের কথা, মা বাবার কথা, স্বামীর কথা—জীবনে কিছু না পেয়েই যেন সব কিছু পেয়েচি। যদি কোনো হিসাবী বিষয়ী লোক বলে, কি পেয়েচ, হিসেব দেখাও—হয়তো কিছু দেখাতে পারবো না—কারণ বাইরে আমার অর্দ্ধমলিন সরু পাড় ধুতি আর দুগাছি অতি সরু বিবর্ণ সোনার চুড়ির মধ্যে কেউ কোনো লাভের সন্ধানই খুঁজে পাবে না, কিন্তু আমার মন বলে কি এক জিনিষের ঠিকানা মিলেচে, যার দরুণ অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার আজ আমার কাছে খোলা। অন্য সব কিছু যেন তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে।

একদিন আমায় শাশুড়ী বল্লেন, ও বৌমা, তোমাদের গাঁয়ের কে একটি ছেলে আমাদের গ্রামে হরি কলুর বাড়ীতে এসে চাকরী করচে। বামুনের ছেলে, দিব্যি চেহারা। কিন্তু বাপু, কলুবাড়ী জল তোলে, গরুর জাব কাটে,

এ আবার কেমন কথা। বড্ড গরীব বোধ হয়। আমি দেখিনি, কে কাল বলছিল ঘাটে। বল্লে, বৌমার দেশের লোক।

যে দিন শুনলাম, সেইদিনই পথে নস্থু মামার সঙ্গে দেখা। কিন্তু প্রথমটা চিনতে পারিনি। নস্থু মামার মাথায় বড় বড় চুল, পরণে শাড়ী, আধ ঘোমটা দেওয়া, হাতে কাঁচের চুড়ি, মেয়েলি বেশ অথচ মুখে ঈষৎ গোঁফ, দাড়ি। আমার হাসি পেল ওর এই অপরূপ বেশ দেখে। আমায় দেখে মেয়েলি সুরে বল্লে—ও পাঁচী, ভাল আছিস ত ভাই ?

আমি অবাক হয়ে বল্লাম—তোমার এ কি বেশ নস্থু মামা ?

নস্থু মামা অদ্ভুত হাসি হেসে বল্লে—এই ! থাকলেই হোল একরকম।

—তুমি নাকি কলুবাড়ী বাসন মাজো জল তোলো ?

—দোষ কি ?

—তুমি যা ভালো বোঝো।

বৃদ্ধা শাশুড়ী সেই শ্রাবণ মাসে দেহ রাখলেন। দিন-দশেক জ্বরে ভুগে গভীর রাত্রে মৃত্যুর কিছু পূর্বে অশ্রুভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাকে কার কাছে রেখে যাচ্চি মা ?

বৃদ্ধার আকুল সুরে মনে ব্যথা বাজল আমার। তাঁর জ্বরশীর্ণ হাত-দুটি ধরে বল্লাম—কেন আমার সোনার চুড়ি আছে, এক বিঘে আমন ধানের জমি আছে—ভাবনা কি মা আমার ? কিছু ভেব না আমার জন্যে।

বিষয়ী লোককে বিষয়ের ভাষায় সান্ত্বনা দিই। আমি জানি যাঁর কাছে আমি আছি, তিনি আমায় কোনোদিন ফেলবেন না, চরণে স্থান দেবেনই।

নস্থু মামার সঙ্গে দেখা আবার একদিন। সে একগাদা কাপড় সেদ্ধ নিয়ে ঘাটে যাচ্ছে কাচতে। আমি বল্লাম—ও সব কাজ আমায় দেও নস্থু মামা। আমি তোমায় করতে দেবো না।

জোর করে সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে নিজে কেচে দিলাম। আমার চোখের সামনে ও সব খাটুনি খাটতে দেবো না ওকে। বল্লাম—হরি কলুর বাড়ী গোয়াল—পরিষ্কার আমি করে দেবো।

—না পাঁচী, লক্ষীটি, লোকে কি বলবে ?

—আমি গ্রাহ্য করি নে।

—আমি করি।

—মিথ্যে কথা, তুমি কিছু গ্রাহ্য কর না, কলুবাড়ী বাসন মাজচো অথচ—

—পাঁচী, এ সব তুই বুঝবি নে। ওসব করিস নে কক্ষনো।

ওর কথা সান্ন্যাল জ্যাঠাকে বলতে তিনি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওকে দেখবার জন্যে। হরি কলুর বাড়ীর পেছনে একটা পুকুর, পুকুরের চারিধারে আম কাঁঠালের বাগান। তারই একটা গাছতলায় দেখা গেল ও চোখ বুজে বসে। সেই থেকে সান্ন্যাল মশায়ের সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেল। যোগবাশিষ্ঠের দলে ভিড়ে পড়লো।

সান্ন্যাল জ্যাঠা বলেন—ছেলেটি শুদ্ধসত্ব।

শীতের প্রথমে কলুপাড়ায় কলেরা দেখা দিলে। একদিনে আঠারোটার কলেরা হোল, পাঁচটা মরে গেল। নস্তুমামা কি ভীষণ পরিশ্রম করে সেবা সুরু করলে। হরি কলুর ছোট ভাই ওর সেবাতেই নাকি বেঁচে উঠলো। রাত্রে ঘুমোয় না, নিজের হাতে রোগীদের গা ও বিছানা পরিষ্কার করে।

কলেরায় কলুপাড়া উজোড় হয়ে গেল—ধরলে কিছু দূরে মুচিপাড়াকে। ভয়ে তখন মুচিপাড়ার অনেক লোক পালিয়েছে। বুড়ো হিরু মুচি একদিনের অসুখে মারা গেল। কিন্তু তখন এমন ভয় হয়ে গিয়েছে সকলের, মড়া ঘরের মধ্যে পড়ে রইল সারাদিন, কেউ ফেলতে চায় না। সন্ধ্যের পর নস্তু মামা একা গিয়ে ঠ্যাঙে দড়ি বেধে সেই মড়া ফেলে দিয়ে এল খালের ধারে শ্মশানে।

যোগবাশিষ্ঠের আসরে একথা শুনে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আমিও যাবো, নস্তু মামাকে সাহায্য করবো। লোকে যে যা বলে বলুক গে।

জ্যাঠামশায় হেসে বল্লেন—মা, এ কাজ তোমার নস্তু মামার। তোমার জন্যে নয়। সব কাজে অধিকারী ভেদ আছে।

—কেন? আমার অধিকার জন্মায় নি?

—তোমার বুড়ো শাশুড়ী মরে গিয়েছে, জগতে আরও কি বুড়ো হাবড়া নেই?

—আপনি বলুন নস্তু মামাকে। ও আমাকে নিতে চায় না কোনো কাজে। আমি যাবো জ্যাঠামশায়।

এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন নস্তু মামা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। কলুপাড়ার সবাই হায় হায় করতে লাগলো। খুড়শাশুড়ী বল্লেন—ভালই হোল, চলে গেল, সুবুদ্ধি হয়েচে। বামুনের মুখ অমন করে হাসাতে হয়? ছিঃ ছিঃ—

তারপর মুখ টিপে হেসে বল্লেন—বৌমার বাপের বাড়ির লোক। খুব কষ্ট হয়েচে বৌমা তোমার—না? যখন তখন দেখা হোত তো! অন্য গাঁ থাকতে

এ গাঁয়ে এসেছিল সেজন্তেই হয়তো, তবুও তো দেশের ঘরের লোক আছে একটা।

ছিলে-খোলা ধনুকের মত সটাং সোজা হয়ে বলে উঠি—নিশ্চয়ই। আমার কষ্ট তো হবারই কথা।

হরি কলু একদিন সান্যাল জ্যাঠার কাছে বল্লে—অমন মানুষ হয় না। ছোট ভাইটা বেঁচে উঠলো, পায়ে ধরতে গেলাম, বলি তুমি ব্রাহ্মণ, আমার ঘরে হেনস্থা কাজ আর করতে দেবো না। দু'মাসের মাইনে বাকি, একটা পয়সাও নিয়ে গেল না যাবার সময়। হঠাৎ পালিয়ে গেলেন। আমায় যেন ক্ষ্যামা করেন তিনি।

হাত জুড়ে সে উদ্দেশ্যে প্রণাম করলে।

আবার ফাগুনে বনে বনে ফুল ফুটেচে, আবার কোকিলের ডাক পথে পথে। মুচুকুন্দ চাঁপার সুগন্ধে ঘাটের রানা ভুর ভুর করে। আমি একদিকে যেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। জ্যাঠামশায়ের বৈঠকখানায় যোগবাশিষ্ঠ শুনতে যাই রোজ বিকেলে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে রিক্ত হয়েই বোধহয় সেখানে পৌছুতে হয়।

বিপদ

বাড়ি বসিয়া লিখিতেছিলাম। সকাল বেলাটায় কে আসিয়া ডাকিল—জ্যাঠামশাই? একমনে লিখিতেছিলাম, একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম—কে?

বালিকাকণ্ঠে কে বলিল—এই আমি, হাজু।

—হাজু? কে হাজু?

বাহিরে আসিলাম। একটি ষোল সতেরো বছরের মলিন বস্ত্র পরনে মেয়ে একটি ছোট ছেলে কোলে দাঁড়াইয়া আছে। চিনিলাম না। গ্রামে অনেকদিন পরে নতুন আসিয়াছি, কত লোককে চিনি না। বলিলাম—কে তুমি?

মেয়েটি লাজুক স্বরে বলিল—আমার বাবার নাম রামচরণ বোষ্টম। এইবার চিনিলাম। রামচরণের সঙ্গে ছেলেবেলায় কড়ি খেলিতাম। সে আজ বছর পাঁচ ছয় হইল ইহলোকের মায়া কাটাইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছে সে সংবাদও রাখি। কিন্তু তাহার সাংসারিক কোনো খবর রাখিতাম না। তাহার যে এতবড় মেয়ে আছে, তাহা এখনই জানিলাম।

বলিলাম—ও! তুমি রামচরণের মেয়ে? বিয়ে হয়েচে দেখ্চি। শ্বশুর-বাড়ি কোথায়?

—কালোপুর।

—বেশ বেশ। এটি খোকা বুঝি? বয়েস কত হলো?

—এই দু'বছর।

—বেশ। বেঁচে থাক। যাও বাড়ির মধ্যে যাও।

—আপনার কাছে এইচি জ্যাঠামশাই। আপনি নোক রাখবেন?

—লোক? না, লোক তো আছে গয়লা বৌ। আর লোকের দরকার নেই তো। কেন? থাকবে কে?

—আমিই থাকতাম। আপনার মাইনে লাগবে না, আমাদের দুটো খেতে দেবেন।

—কেন তোমার শ্বশুরবাড়ি?

মেয়েটি কোনো জবাব দিল না। অত শত হাঙ্গামাতে আমার দরকার কি? লেখার দেরী হইয়া যাইতেছে। সোজাসুজি বলিলাম—না, লোকের এখন দরকার নেই আমার।

তারপর মেয়েটি বাড়ির মধ্যে ঢুকিল এবং পরে শুনিলাম সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। চাল লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

মেয়েটির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ একদিন দেখি, রায়েদের বাহিরের ঘরের পৈঠায় বসিয়া সেই মেয়েটি হাউমাউ করিয়া এক টুকরা তরমুজ খাইতেছে। যে ভাবে সে তরমুজের টুকরাটি ধরিয়া কামড় মারিতেছে, 'হাউমাউ' কথাটি সুষ্ঠু ভাবে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ঐ কথাটাই আমার মনে আসিল। অতি মলিন বস্ত্র পরিধানে। ছেলেটি ওর সঙ্গে নাই। পাশে পৈঠার উপরে দু-এক টুকরা পেঁপে ও একখণ্ড তালের গুড়ের পাটালি। অনুমানে বুঝিলাম আজ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে রায়-বাড়ি কলসী-উৎসর্গ ছিল, এসব ফলমূল ভিক্ষা

করিতে গিয়া প্রাপ্ত। কারণ মেয়েটির পায়ের কাছে একটা পোটলা এবং সম্ভবত তাহাতে ভিক্ষায় পাওয়া চাল।

সেদিন আমি কাহাকে যেন মেয়েটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি যায় না, কারণ সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ, দু'বেলা ভাত জোটে না। চালাইতে না পারিয়া মেয়েটির স্বামী উহাকে বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিয়াছে, লইয়া যাইবার নামও করে না। এদিকে বাপের বাড়ির অবস্থাও অতি খারাপ। রামচরণ বোষ্টমের বিধবা স্ত্রী লোকের বাড়ি ঝি-বৃত্তি করিয়া দুটি অপোগণ্ড ছেলেমেয়েকে অতি কষ্টে লালন-পালন করে। মেয়েটি মায়ের ঘাড়ে পড়িয়া আছে আজ এক বছর। মা কোথা হইতে চালাইবে, কাজেই মেয়েটিকে নিজের পথ নিজেই দেখিতে হয়।

একদিন আমাদের বাড়ীর ঝি গয়লা-বৌকে কথায় কথায় জিগ্যেস করাতে সে বলিল—হাজু নাকি আপনার বাড়ি থাকবে বলেছিল?

—হ্যাঁ। বলেছিল একদিন বটে।

—খবরদার বাবু, ওকে বাড়িতে জায়গা দেবেন না, ও চোর।

—চোর? কি রকম চোর?

—যা সামনে পাবে, তাই চুরি করবে। মুখুজ্যেবাড়ি রাখেনি ওকে, যা তা চুরি করে খায়, দুধ চুরি করে খায়, চাল চুরি করে নিয়ে যায়—আর বড্ড খাই খাই—কেবল খাবো। ওর হাতীর খোরাক জোগাতে না পেরে মুখুজ্যেরা ছাড়িয়ে দিয়েচে। এখন পথে পথে বেড়ায়।

—ওর মা ওকে দেখে না?

—সে নিজে পায় না পেট চালাতি। ওকে বলেচে, আমি কনে পাবো? তুই নিজেরটা নিজে করে খা। তাই ও দোরে দোরে ঘোরে।

সেই হইতে মেয়েটির উপর আমার দয়া হইল। যখনই বাড়ি আসিত, চাল বা ডাল, দু-চারটে পয়সা দিতাম। বার দুই দুপুরে ভাত খাইয়াও গিয়াছে আমার বাড়ি হইতে।

মাসখানেক পরে একদিন আমার বাড়ির সামনে হাউ হাউ কান্না শুনিয়া বাহিরে গেলাম। দেখি, হাজু কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়ির দিকেই আসিতেছে। ব্যাপার কি? শুনিলাম মধু চক্রবর্ত্তী নাকি তাহার আর কিছু রাখে নাই, তাহার হাতে একটি ঘটি ছিল, সেটিও কাড়িয়া রাখিয়া দিয়াছে—তাহাদের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, এই অপরাধে।

রাগ হইল। আমি গ্রামের একজন মাতব্বর, এবং পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী ; তখনই মধু চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। মধু একখানা রাঙা গামছা কাঁধে হন্তদন্ত হইয়া আমার বাড়ি হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—মধু, তুমি একে মেরেচ ?

—হ্যাঁ দাদা, এক ঘা মেরেচি ঠিকই। রাগ সামলাতে পারিনি, ও আস্ত চোর একটি। শুনুন আগে, আমাদের বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়েচে, গিয়ে উঠোনের লঙ্কা গাছ থেকে কোঁচড় ভরে কাঁচা পাকা ঝাল চুরি করেচে প্রায় পোয়াটাক। আর একদিন অমনি ভিক্ষে করতে এসে, দেখি বাইরের উঠোনের গাছ থেকে একটা পাকা পেঁপে ভাঙচে, সেদিন কিছু বলিনি—আজ আর রাগ সামলাতে পারিনি দাদা। মেরেচি এক চড়, আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না।

—না, খুব অন্যায় করেচ। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা ওসব কি ? ইতরের মত কাণ্ড। ছিঃ—যাও, ওর কি নিয়ে রেখেচ, ফেরত দাও গে যাও।

হাজুকেও বলিয়া দিলাম, সে যেন আর কোনোদিন মধু চক্রবর্ত্তীর বাড়ি ভিক্ষে করিতে না যায়।

এই সময় আকাল স্থরু হইয়া গেল। ধান-চাল বাজারে মেলে না, ভিখিরীকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া বন্ধ। এই সময় একদিন হাজুকে দেখিলাম ছেলে কোলে গোয়ালাপাড়ার রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিয়া নির্বো-ধের মত চাহিয়া বলিল—এই যে জ্যাঠামশায়। যেন মস্ত একটা সংবাদ দিতে অনেকক্ষণ হইতে আমাকে খুঁজিতেছে।

—এই। আপনাদের বাড়িও যাবো।

—বেশ। আমাদের বাড়িতে প্রসাদ পাবি আজ—বুঝলি ?

হাজু খুব খুশি। খাইতে পাইলে মেয়েটা খুব খুশি হয় জানি। কাঁটালতলার ছায়ায় রোয়াকে সে যখন খাইতে বসিল, তখন দুজনের ভাত তাহার একার পাতে। নিছক খাওয়ার মধ্যে যে কি আনন্দ থাকিতে পারে তাহা জানিতে হইলে হাজুর সেদিনকার খাওয়া দেখিতে হয়। স্ত্রীকে বলিয়া দিলাম—একটু মাছটাছ বেশি করে দিয়ে ওকে খাওয়াও··· ।

একদিন বোষ্টমপাড়ার হরিদাস বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের পাড়ার হাজু শ্বশুরবাড়ি যায় না কেন ?

—ওকে নেয় না ওর স্বামী।

—কারণ ?

—সে নানান্ কথা। ওর নাকি মস্ত পেটুক, চুরি করে হাঁড়ি থেকে খায়। দুধের সর বসবার জো নেই কড়ায়, সব চুরি করে খাবে। তাই তাড়িয়ে দিয়েচে।

—এই শুধু দোষ ? আর কিছু না ?

—এই তো শুনিচি, আর তো কিছু শুনিনি। তারাও ভাল গেরস্ত না। তাহোলে কি আর ঘরের বৌকে কেউ তাড়িয়ে দেয় খাওয়ার জন্যে ? তারাও তেমনি।

কিছুদিন আর হাজুকে রাস্তাঘাটে দেখা যায় নি। একদিন তাদের পাড়ার বোষ্টমবৌ বলিল—শুনেচেন কাণ্ড ?

—কি ?

—সেই হাজু আমাদের পাড়ার, সে যে বনগাঁয়ে গিয়ে নাম লিখিয়েচে।

আমি দুঃখিত হইলাম। এদেশে নাম লেখানো বলে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাকে। হাজু অবশেষে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিল। খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নয় এমন কিছু, তবু দুঃখ হয় গ্রামের মেয়ে বলিয়া। এখানেই এ ব্যাপারের শেষ হইয়া যাইত হয়তো, কারণ গ্রামে সব সময়ে থাকি-ও না, থাকিলেও সকলের খবর সব সময় কানেও আসে না।

পঞ্চাশের মন্বন্তর চলিয়া গেল। পথের পাশে এখানে ওখানে আজও দু-একটা কঙ্কাল দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলা হইতে আগত বুভুক্ষু নিঃস্ব হতভাগ্যেরা পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এ জেলায় মন্বন্তরের মূর্তি অত তীব্র ছিল না। যে দেশে ছিল, সে দেশ হইতে নিঃস্ব নরনারী এখানে আসিয়াছিল, আর ফিরিয়া যায় নাই।

পৌষ মাসের দিন। খুব শীত পড়িয়াছে। মহকুমার শহরে একটা পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গিয়াছি, ফিরিবার পথে একটা গলির মধ্য দিয়া বাজারে আসিয়া উঠিব ভাবিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে কে ডাকিল—ও জ্যাঠামশায় !

বলিলাম—কে ?

—এই যে আমি—

আধ অন্ধকার গলিপথে ভাল করিয়া চাহিবার চেষ্টা করিলাম। একটা

চালাঘরের সামনে পথের ধারে একটি মেয়ে রঙীন কাপড় পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাপড়ের রঙ অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, আমি শুধু তাহার মুখের আবছায়া আদল ও হাত ছুটি দেখিতে পাইলাম।

কাছে গিয়া বলিলাম—কে ?

—বারে, চিনতে পারলেন না ? আমি হাজু।

হাজু বলিলেও আমার মনে পড়িল না কিছু। বলিলাম—কে হাজু ?

সে হাসিয়া বলিল—আপনাদের গাঁয়ের। বারে, ভুলে গেলেন ? আমার বাবার নাম রামচরণ বৈরাগী। আমি যে এই শহরে নটী হয়ে আছি।

এমন স্বরে সে শেষের কথাটি বলিল, যেন সে জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং সে জন্য সে গর্ব অনুভব করে। অর্থাৎ এত বড় শহরে নটী হইবার সৌভাগ্য কি কম কথা, না যার তার ভাগ্যে তা ঘটে ? গ্রামের লোক, দেখিয়া বুঝুন তার কৃতিত্বের বহরখানা।

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিল—আসুন না, দয়া করে আমার ঘরে।

—না, এখন যেতে পারবো না। সময় নেই।

—কেন, কি করবেন ?

—বাড়ি যাবো।

সে আবদারের স্বরে বলিল—না। আসতেই হবে। পায়ের ধুলো দিতেই হবে আমার ঘরে। আসুন—

কি ভাবিয়া তাহার সঙ্গে ঢুকিয়া পড়িলাম তাহার ঘরে। নিচু রোয়াক খড় ছাওয়া, রোয়াক পার হইয়া মাঝারিধরণের একটি ঘর, ঘরে একখানা নিচু তক্তপোষের ওপর সাজানো গোছানো ফর্সা চাদর পাতা বিছানা। দেওয়ালে বিলিতি সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ছবি ছু-তিনখানা। মেমসাহেব অমুক সিগারেট টানিতেছে। একখানা ছোট জলচৌকির ওপর খানকতক পিতল-কাঁসার বাসন রেড়ির তেলের প্রদীপের অল্প আলোয় ঝক্-ঝক্ করিতেছে। মেজেতে একটা পুরনো মাছুর পাতা। বোষ্টমের মেয়ে, একখানা কেষ্টঠাকুরের ছবিও দেওয়ালে টাঙানো দেখিলাম। ঘরের এক কোণে ডুগিতবলা এক জোড়া, একটা হুঁকো, টিকে-তামাকের মালসা, আরও কি কি।

হাজু গর্ব্বের স্বরে বলিল—এই দেখুন আমার ঘর—

—বাঃ, বেশ ঘর তো। কত ভাড়া দিতে হয় ?

—সাড়ে সাত টাকা।

—বেশ।

হাজু একঘটি জল লইয়া আসিয়া বলিল—পা ধুয়ে নিন—

—কেন? পা ধোয়ার এখন কোনো দরকার দেখচিনে। আমি এখুনি চলে যাবো।

—একটু জল খেয়ে যেতে হবে কিন্তু এখানে জ্যাঠামশায়।

এখানে জলযোগ করিবার প্রবৃত্তি হয় কখনো? পতিতার ঘরদোর। গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল। বলিলাম—না, এখন কিছু খাবো না। সময় নেই—

হাজু সে কথা গায়ে না মাখিয়া বলিল—তা হবে না। সে আমি শুনচি নে—কিছুতেই শুনবো না—বসুন—

তাহার পর সে উঠিয়া জলচৌকি হইতে একটা চায়ের পেয়ালা তুলিয়া আনিয়া সযত্নে সেটা আঁচল দিয়া মুছিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল—দেখুন, কিনিচি—আপনাকে চা করে খাওয়াবো এতে—চা করতে শিখিচি।

ড্রেসডেন চায়না নয়, অন্য কিছু নয়, সামান্য একটা পেয়ালা। হাজুর মনস্তুষ্টির জন্য বলিলাম—বেশ জিনিস, বাঃ—

ও উৎসাহ পাইয়া আমাকে ঘরের এ জিনিস ও জিনিস দেখাইতে আরম্ভ করিল। একখানা আয়না, একটা টুকনি ঘটি, একটা সুদৃশ্য কৌটা ইত্যাদি। এটা কেমন? ওটা কেমন? সে এসব কিনিয়াছে। তাহার খুশি ও আনন্দ দেখিয়া অতি তুচ্ছ জিনিসেরও প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। এতক্ষণ ভাবিতেছিলাম, ইহাকে এ পথে আসিবার জন্য তিরস্কার করি এবং কিছু সদুপদেশ দিয়া জ্যাঠামশায়ের কর্তব্য সমাপ্ত করি। কিন্তু হাজুর খুশি দেখিয়া ওসব মুখে আসিল না।

যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহিতৈষী সাধু হইতে পারে; কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা পিরিচে—যার বাবাও কোনোদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া, ছোট করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা আমার জোগাইল না।

সঙ্কল্প ঠিক রাখা গেল না। হাজু চা করিয়া আনিল। আর একখানা কাঁসার মাজা রেকাবিতে স্থানীয় ভাল সন্দেশ ও পেঁপে কাটা। কত আগ্রহের সহিত সে আমার সামনে জলখাবারের রেকাবি রাখিল।

সত্যিই আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছিল।

এমন জায়গায় বসিয়া কখনো খাই নাই। এমন বাড়িতে।

কি হাজুর আগ্রহভরা সরল মুখের দিকে চাহিয়া পাত্রে কিছু অবশিষ্ট রাখিলাম না। হাজু খুব খুশি হইয়াছে—তাহার মুখের ভাবে বুঝিলাম।

বলিল—কেমন চা করিচি জ্যাঠামশায় ?

চা মোটেই ভালো হয় নাই—পাড়াগেঁয়ে চা, না গন্ধ, না আস্বাদ। বলিলাম —কোথাকার চা ?

—এই বাজারের।

—তুই নিজে চা খাস ?

—হুঁ দুটি বেলা চা না খেলে সকালে কোনো কাজ করতে পারিনে, জ্যাঠামশায়।

আমার হাসি পাইল। সেই হাজু !·····

ছবিটি যেন চোখের সামনে আবার ফুটিয়া উঠিল। রায়বাড়ির বাহিরের ঘরের পৈঠার কাছে বসিয়া খোলাসুদ্ধ তরমুজের টুকরা হাউমাউ করিয়া চিবাইতেছে। সেই হাজু চা না খাইলে নাকি কোনো কাজে হাত দিতে পারে না।

বলিলাম—তা হোলে এখন উঠি হাজু। সন্দে উৎরে গেল। আবার অনেকখানি রাস্তা যাবো।

হাজুর দেখিলাম, এত শীঘ্র আমাকে যাইতে দিতে অনিচ্ছা। গ্রামের এ কেমন আছে, সে কেমন আছে জিজ্ঞাসাবাদ করিল। বলিল—একটা কথা জ্যাঠামশায়, মাকে পাঁচটা টাকা দেবো, আপনি নিয়ে যাবেন ? লুকিয়ে দিতে হবে কিন্তু টাকাটা। পাড়ার লোকে না জানতে পারে। মার বড় কষ্ট। আমি মাসে মাসে যা পারি মাকে দিই। গত মাসে একখানা কাপড় পাঠিয়ে দিলাম।

—কার হাতে দিয়ে দিলি ?

—বিনোদ গোয়ালা এসেছিল, তার হাত দিয়ে লুকিয়ে পাঠালাম।

—তোর ছেলেটা কোথায় ?

—মার কাছেই আছে। ভাবচি, এখানে নিয়ে আসবো। সেখানে খেতে-

পরতে পাচ্চে না। এখানে থাওয়ার ভাবনা নেই জ্যাঠামশায়, দোকানের খাবার খেয়ে তো অছেদ্দা হোল। সিঙ্গেড়া বলুন, কচুরি বলুন, নিমকি বলুন—তা খুব। এমন আলুর দম করে ওই বটতলার খোট্টা দোকানদার, অমন আলুর দম কথনো থাই নি। এই এত বড় বড় এক একটা আলু—আর কত রকমের মশলা—আপনি আর একটু বসবেন? আমি গিয়ে আলুর দম আনাবো? খেয়ে দেখবেন।

নাঃ, ইহার সরলতা দেখিয়াও হাসি পায়। রাগ হয় না ইহার উপর। বলিলাম—না, আমি এথন যাচ্চি। আর ওই টাকাটা আমি নিয়ে যাবো না, তুমি মনিঅর্ডার করে পাঠালেও তো পারো। অন্য লোকে দেবে কি না দেবে—বিনোদ যে তোমার মাকে টাকা দিয়েচে কিনা, তার ঠিক কি?

হাজুর এ সন্দেহ মনে উঠে নাই এতদিন। বলিল—যা বলেচেন জ্যাঠামশাই, টাকাটা তো এর ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই। মা পায় কি না পায় তা কি জানি।

—এ পর্যন্ত কত টাকা দিয়েচ?

—তা কুড়ি পঁচিশ টাকার বেশি। আমি কি হিসেব জানি জ্যাঠামশাই? মা কষ্ট পায়, আমার তা কি ভালো লাগে?

—কার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিস?

হাজু সলজ্জ মুখে চুপ করিয়া রহিল। বুঝিলাম আমাদের গ্রামের লোকজন ইহার নিকট যাতায়াত করে।

বলিলাম—আচ্ছা, দে সেই পাঁচটা টাকা। চলি—

—আবার আসবেন জ্যাঠামশায়। বিদেশে থাকি, মাঝে মাঝে দেখে শুনে যাবেন এসে।

গ্রামে ফিরিয়া হাজুর মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া টাকা পাঁচটি তাহার হাতে দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কেউ তোমাকে কোনো টাকা দিয়েছিল?

হাজুর মা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কই না। কে দেবে টাকা?

বিনোদ ঘোষের নাম করিতে পারিতাম। কিন্তু করিলে কথাটা জানাজানি হইয়া পড়িবে। বিনোদ ভাবিবে আমারও ওখানে যাতায়াত আছে এবং হাজুর প্রণয়ীদের দলে আমিও ভিড়িয়া গিয়াছি এই বয়সে। কি গরজ আমার?

তুচ্ছ

আমি সকালে উঠে বসে কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটচি, এমন সময়ে একটি তেরো চৌদ্দ বছরের ছোট মেয়ে রাঙা শাড়ী পরে আমাদের বাড়িতে ঢুকলো। আমাদের গ্রামেরই মেয়ে নিশ্চয়, তবে এ'কে কোথাও দেখিনি বলে চিনতে পারলাম না। মেয়েটির এই অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েচে, ওর কপালে সিঁদুর, হাতে সোনা বাঁধানো শাঁখা। শ্যামবর্ণ, একহারা চেহারার মেয়ে। মুখখানি বেশ ঢলঢল, বড় বড় চোখ দুটি। কানে দুটি সোনার দুল। জিজ্ঞেস করলুম —কার মেয়ে তুই রে?

মেয়েটি সামান্য একটু হেসে মাটির দিকে চোক রেখে বল্লে—বিশ্বনাথ কামারের।

—বিশুর মেয়ে? বেশ, বেশ। তোর দেখচি বিয়ে হয়েচে এই বয়সে। কোথায় শ্বশুরবাড়ি?

মেয়েটির খুব লজ্জা হোল শ্বশুরবাড়ির কথায়। সে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বল্লে—নারানপুর।

—কোন্ নারানপুর? ঘিবে-নারানপুর?

—হ্যাঁ।

—কদ্দিন বিয়ে হয়েচে?

—এই ফাল্গুন মাসে।

—শ্বশুরবাড়ি থেকে এলি কবে?

—পরশু এসেচি কাকাবাবু।

—আচ্ছা যা বাড়ির মধ্যে যা।

গ্রামের মেয়ে বাপের বাড়ি এসেচে, এ পাড়া ও পাড়ায় সব বাড়ি ঘুরে

বেড়াচ্চে। বড় স্নেহ হোল খুকিটির ওপর। এই গ্রামেরই মেয়ে, আহা!

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি মেয়েটি মাঝের ঘরের মেজেতে চুপ করে বসে আঁচল নিয়ে নাড়চে। কেউ ওর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, কেউ ওর সঙ্গে কথা বলচে না। প্রথম প্রথম হয়তো কথা বলেছিল মেয়েরা, এখন আর ওর কাছাকাছি কেউ নেই, ও একাই বসে আছে। কামারদের মেয়ে, তার সঙ্গে কে কথা বলে বেশিক্ষণ?

আমায় দেখে মেয়েটি বল্লে—কাকাবাবু, ও কিসের ছবি?

—ও আমার ফটো।

—আপনার ছবি?

মেয়েটি ফটো কথা বোধ হয় বুঝতে পারেনি। বল্লুম—হ্যাঁ আমার ছবি।

—কে করেচে কাকাবাবু?

মেয়েটি এতক্ষণ বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টিতে ঘরের দেওয়ালের কতকগুলো ফটো, সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মেমসাহেব, ক্যালেণ্ডারের ছবিগুলোর দিকে চেয়ে দেখছিল। পল্লীগ্রামের ঘরের দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় বা রেমব্রাণ্টের ছবি অবিশ্যি টাঙানো ছিল না।

—ও মেমসায়েব কি করচে কাকাবাবু?

—সিগারেট খাচ্চে।

—ওমা, মেয়েমানুষ সিগারেট খায়?

—মেমসায়েবরা খায়। দেখেচিস্ কখনো মেমসায়েব?

—হুঁ।

—কোথায়?

—রানাঘাট ইষ্টিশানে। আড়ংঘাটা যাচ্ছিলাম যুগলকিশোর দেখতে, তাই দেখি রেলগাড়িতে বসে আছে। সাদা ধপ ধপ করচে একেবারে।

দেখলুম ও একা বসে থাকলেও দেওয়ালের ওই অকিঞ্চিৎকর ছবিগুলো দেখে বেশ আমোদ পাচ্চে। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমি আবার ঢুকলাম ঘরে কি কাজে। মেয়েটি সেখানে ঠায় বসে আছে সেই ভাবেই। ওকে কেউ গ্রাহ্যও করচে না বাড়ির মেয়েরা। তাতে ওর কোনো দুঃখ নেই, দিব্যি একা একা বসে আছে। চলেও যায় নি।

ও যে আমাদের ঘরে ঢুকে মেজের ওপর বসে আছে, এই আনন্দে ও ভরপুর। দিব্যি লাল রং দেওয়া মাজাঘসা মেজে, ঘরের বিছানা আসবাবপত্র

দামী নয়, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে যে শ্রেণীর ছবি, সে তো বলাই হোল। একখানা টেবিল, একটা চেয়ারও আছে। টাটার টেবিল ল্যাম্প আছে একটা। কতকগুলো মাটির পুতুল—যেমন গণেশ-জননী, গরু, হরিণ, টিয়াপাখী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি—একটা কাঠের তাকে সাজানো আছে।

গৃহসজ্জার এই সামান্য রূপই ওর চোখে আশ্চর্য্য ঠেকেচে, খুকির চোখ দেখলে তা বোঝা যায়। আমার কষ্ট হোল ওকে কেউ আদর করে ওর সঙ্গে কথা বলচে না। ও সেটা আশাও করেনি। আমাদের গ্রামে তেমন ব্যবহার কামার কুমোরদের মেয়েদের সঙ্গে কেউ করে না। ওরা ঘরে ঢুকে বসতে পেয়েচে, এতেই ওরা অত্যন্ত খুশি আছে।

আমি তেল মেখে নাইতে যাবো। নারকোল তেল আজকাল পাওয়া যায় না বলে বাড়ির মেয়েদের ফরমাজ মত গন্ধতেলের বোতল আসে দোকান থেকে—হেন কল্যাণ, তেন কল্যাণ।

আমি বোতল থেকে তেল বের করে মাথায় মাখচি দেখে ও চেয়ে রইল।

আমি বল্লাম—গন্ধতেল একটু মাখবি খুকি?

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। এমন কথা কেউ ওকে বলে নি, কোনো ব্রাহ্মণ-বাড়ির কর্ত্তা তো নয়ই।

বল্লে—হ্যাঁ!

—সরে আয় দিকি মা।

তারপর তার চোখদুটির অবাক দৃষ্টিকে অবাকতর করে দিয়ে আমি নিজের হাতে তার মাথায় খানিক গন্ধতেল মাখিয়ে দিলাম, খোঁপা বাঁধা চুলের ওপর ওপর। ও হেসে ফেল্লে। অনাদৃতা আদর পেয়ে লজ্জা পেলে।

বল্লাম—কি রকম গন্ধ?

—চমৎকার, কাকাবাবু!

—কি তেল বল দিকি?

—জানি না।

—খুব ভাল গন্ধতেল।

ভারি খুশি হয়েচে ও।

বল্লে—আসি তা হোলে কাকাবাবু? বেলা হয়েচে—

—এসো মা। আবার এসো একদিন—

চলে গেল খুকী। কতটুকু আর তেল দিলাম ওর মাথায়। কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীজলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্য্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা। সুন্দর দিনটা।

সিঁদুরচরণ

সিঁদুরচরণ আজ দশ বারো বছর মালিপোতার বাস করচে বটে কিন্তু ওর বাড়ি এখানে নয়। সেদিন রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে সিঁদুরচরণ কোথা থেকে এসেচে তা নিয়ে কথা হচ্ছিল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মশায় তামাক টানতে টানতে বললেন—"কে, সিঁদুরচরণ? ওর বাড়ি ছিল কোথায় কেউ জানে না, তবে এখানে আসবার আগে ও খাবরাপোতায় প্রায় দশ বছর ছিল। তার আগে অন্য গাঁয়ে ছিল শুনিচি, গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোই ওর পেশা।"

পেশা হয়তো হতে পারে, কারণ সিঁদুরচরণ গরিব লোক।

জীবনে সে ভাল জিনিসের মুখ দেখেনি কখনো। কেউ আপনার লোক ছিল না, সম্প্রতি মালিপোতাতে এসে বিয়ের চেষ্টাও করেছিল। অজ্ঞাতকুলশীলকে কেউ মেয়ে দেবার আগ্রহ দেখায় নি। মালিপোতার এক বুনো মালী আজকাল ওর সঙ্গে একত্র স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করে। তার বয়স ওর,চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। দেখতে মোটাসোটা, মিশকালো রং, মাথার চুলে এখনও পাক ধরেনি বটে তবে ধরবার বেশি দেরিও নেই। বুনো বলে এদেশে সেই সব কুলি মজুরের বর্তমান বংশধরদের, যারা একশো বছর আগে নীলকুঠির আমলে রাঁচি, হাজারিবাগ, গিরিডি, মধুপুর প্রভৃতি থেকে এসেছিল নীলকুঠির আমলে মজুরি করতে। এখন তারা বেমালুম বাঙালী হয়ে গিয়েচে ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার সব রকমে। পূর্বপুরুষের বোংগা পুজো ভুলে গিয়েচে কতকাল, এখন হরিসংকীর্তন করে ঘরে ঘরে, মনসা-পূজো, ষষ্ঠী-পূজো করে, কালীতলায় মানত করে।

এখন যদি এদের জিজ্ঞেস করা যায়—তোরা কোন্ দেশ থেকে এসেছিলি রে? তোদের আপনজন কোথায় আছে?

ওরা বলবে—তা কি জানি বাবু!

—পশ্চিম থেকে এসেছিলি, না?

—শুনেচি বাপ-ঠাকুরদার কাছে। ওদিকের কোথা থেকে আমাদের পাঁচ ছ' পুরুষের আগে এসে বাস করা হয়। সে সত্য যুগের কথা।

সিঁদুরচরণ এ-হেন বুনো মালীকে নিয়ে দিব্যি ঘর করতে থাকে। তার নাম কাতু—হয়তো 'কাত্যায়নী'র অপভ্রংশ হবে নামটা। কিন্তু ওর অপভ্রংশ নামটাই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে পাওয়া—ভাল নাম তাকে কেউ দেয় নি।

সিঁদুরচরণ পরের গোরু চরিয়ে আর পরের লাঙ্গল চ'ষে জীবনের চল্লিশটি বছর কাঠিয়ে দেওয়ার পরে বিঘে তিনেক জমি ওটবন্দি বন্দোবস্ত নিলে। তার জমিতে পরের বছর দশ মণ পাট হোল। সেবার বাইশ টাকা পাটের মণ। পাট বিক্রি করে সেবার এত পেলে সিঁদুরচরণ, অত টাকা একসঙ্গে তার তিন পুরুষে কখনো দেখেনি। দশ টাকার নোট বাইশখানা।

কাতু বললে—হ্যাঁ গো, দশ হাত ফুলন শাড়ির দাম কত?

—কেন, নিবি?

—দাও গিয়ে এবার। অনেকদিন যে ভাবচি। বড্ড শখ।

—এই বয়সে ফুলন শাড়ি পরলি লোকে ঠাট্টা করবে না?

কথাটা কিঞ্চিৎ রূঢ় হয়ে পড়লো, মনে হোল সিঁদুরচরণের। অল্প বয়সে ওকে দেবার লোক কে ছিল? আজ বেশি বয়সে সুবিধে যখন হোলই তখন অল্পবয়সের সাধটা পূর্ণ করতে দোষ কি? তারপর ঘোষেদের দোকান থেকে একখানা ফুলন শাড়ি শুধু নয়—তার সঙ্গে এলো একখানা সবুজ রংয়ের গামছা।

কাতু খুশিতে আটখানা। বললে—শাড়িখানা কী চমৎকার—না?

—খুব ভাল। তোর পছন্দ হয়েচে?

—তা পছন্দ হবে না? যাকে বলে ফুলন শাড়ি।

—আর গামছাখানা কেমন?

—অমন গামছাখানা কখনো দেখিই নি। ও কিন্তু মুই ব্যাভার করতি পারবো না প্রাণ ধোরে। তাহলি খারাপ হোয়ে যাবে।

—খারাপ হয় আবার কিনে দোবো। আমার হাতে এখন কম ট্যাকা না!

সেদিন কামার-দোকানে বসে তিনকড়ি বুনোর মুখে কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নান

করতে যাবার বৃত্তান্ত শুনলো সিঁদুরচরণ। বাড়ি এসে কাতুকে বললে—কাতু, তুই থাক্, আমি দুদিন দেশ বেরিয়ে আসি—

—কোথায় যাবা ?

—একদিকে বেরিয়ে আসি—

—আমারে নিয়ে যাবা না ?

—তুই যাস তো চল্—ভালই তো—

দুজনে জিনিসপত্র একটা বোঁচকাতে বেঁধে তৈরি হোল। কিন্তু যাবার দিন কাতুর মত বদলে গেল হঠাৎ। সে বললে—তুমি যাও, আমি যাবো না। গোরুটার বাছুর হবে এই মাসের মধ্যে। যদি আসতি দেরি হয়, বাছুরটা বাঁচবে না।

—তুই যাবিনে ?

—আমার গেলি চলবে কেমন করে ? বাছুরটা মরে গেলি সারা বছরটা আর দুধ খেতি হবে না। তুমি যাও, আমি যাবো না।

সুতরাং সিঁদুরচরণ একাই রওনা হোল বোঁচকা নিয়ে। রেলগাড়িতে সামান্যই চড়েচে সে, একবার কেবল বেনাপোল গিয়েছিল গোরুর হাট দেখতে। সেই জীবনে একবার মাত্র রেলগাড়ি চড়া। পরের চাকুরি করতে করতে সারা জীবন কেটেচে।

স্টেশনে গিয়ে রেলে চড়ে যেতে হবে। সিঁদুরচরণ কাপড়ের খুঁটে শক্ত করে গেরো বেঁধে দুখানা দশ টাকার নোট নিয়েচে। কেউটেপাড়ার কাছে পাঁচু বুনোর দো-চালা ঘর রাস্তার ধারে। ওকে দেখে পাঁচু জিজ্ঞেস করলে—ও সিঁদুরচরণ, কনে চলেচ এত সকালে ?

—একটু ইষ্টিশানে যাবো।

—কোথায় যাবা ?

—বেড়াতি যাবো রানাঘাটের দিকি।

—তামাক খাও বসে।

সিঁদুরচরণ তামাক খেতে বসলো। কাছেই একটা বাঁশনি বাঁশের ঝাড়—সিঁদুরচরণ সেদিকে চেয়ে ভাবলে—এই বাঁশনি বাঁশের ঝাড়টা এদেশে, আবার অন্য দেশেও গিয়ে কি এমনি দেখা যাবে ? সে আবার না জানি কি রকম বাঁশনি বাঁশ। এই রকম কেঁচো, এই রকম কচুর ফুল কি অন্য জায়গাতেও আছে ? দেখতে হবে বেড়িয়ে। সত্যি, বড় মজা দেশবিদেশে বেড়ানো !

সিঁদুরচরণ ষ্টেশনে পৌঁছবার কিছু পরে টিকিটের ঘণ্টা পড়লো ঢংঢং করে। একজন ওকে বললে—যাও গিয়ে টিকিট করো। গাড়ি আসচে।

টিকিটের জানালায় গিয়ে ও বললে—ও বাবু একখান্ৱা টিকিস্ ছান মোরে—

টিকিটবাবু বললে—কোথাকার টিকিট ?

—ছান বাবু, রানাঘাটেরই ছান আপাতোক একখানা।

গাড়িতে উঠে সিঁদুরচরণের ভীষণ আমোদ হোল। সে আমোদ রূপান্তরিত হোল বার বার ওর ধূমপান করবার ইচ্ছায়। ঘন ঘন বিড়ি খায়, এই ধরায়, এই খায়। কয়েকটি বিড়ি খেতে খেতেই রানাঘাটে গাড়ি এসে পড়াতে ও আশ্চর্য হ'য়ে পড়লো। ষোল মাইল রাস্তা যে এত অল্প সময়ে এসে পড়বে, তা ও ভাবেই নি।

রানাঘাটে নেমে এখন কোথায় যাওয়া যায় ? এমন অনেক দূরে যেতে হবে, যেখানে কখনো সে যায়নি।

ষ্টেশনের এপারে একটা উঁচুমত রোয়াক বাঁধানো জায়গা খুব লম্বা। তার দুধারে রেল লাইন পাতা। সেই লম্বা রোয়াকের ওপর লম্বা একটা টিনের চালা। অত বড় টিনের চালার তলায় বা রোয়াকটার অন্যদিকে লোকে পান, বিড়ি, চা, খাবার ইত্যাদি বিক্রি করচে—লোকজনে কিনচে। যেন একটা মেলা বসে গিয়েচে। মড়িঘাটায় গঙ্গাস্নানের যোগের সময় এরকম মেলা সে দেখেচে।

একদল উত্তুরে লোক তার সঙ্গে একই ট্রেন থেকে নেমে বিড়ি টেনে আড্ডা জমিয়েচে টিনের চালার নিচে। ও সেখানে গিয়ে বললে—কনে যাবা ?

তারা বললে—মুকসুদাবাদ ; বেলডাঙা।

—সে কনে ?

—উত্তুরে।

—কোথায় গিয়েলে ?

—পাট কাচতে গেছলাম ওই কানসোনা, তালহাটি, মেহেরপুর।

মেহেরপুর গ্রাম সিঁদুরচরণের বাড়ির কাছে। লোকগুলো সেখান থেকে আসচে শুনে সিঁদুরচরণের মনে হোল এই দুর বিদেশ বিভুঁইয়ে এরাই তার পরম আত্মীয়। সে বললে—মেহেরপুরের নসিবদ্দি সেখরে চেন ?

—তেনার বাড়িতেই তো ছিলাম আমরা। বছর বছর তেনার পাট কাচি। পত্তর দিয়ে আমাদের তিনি নিয়ে আসে।

—মুইও তারে খুব চিনি।

—আপনি কতদূর যাবা?

—বেড়াতে বেরিইচি যেতদূর যাওয়া যায় তেতদূর যাবো।

ওদের মধ্যে একজন বললে—তবুও কদ্দুর যাওয়া হবে? আমার সঙ্গে বাহাদুরপুর চলো। আমি সেখানে যাবো।

—সে কনে?

—কেষ্টনগর ছাড়িয়ে।

—তবে পয়সা নিয়ে মোর টিকিসখানা তোমার সঙ্গে করে নিয়ে এসো ভাই।

—ছাও ট্যাকা।

—কত নাগবে?

—এগারো আনা।

আধঘণ্টা পরে লোকটা টিকিট কেটে এনে তার হাতে দিলে। সিঁদুরচরণ পুঁটুলির মধ্যে থেকে কাতুর দেওয়া ধুপি-পিঠে খেতে লাগলো এবং তার সঙ্গীকে দিলে। ধুপি-পিঠে আর কিছুই নয় শুধু চালের গুঁড়োর পিঠে, জলে সিদ্ধ। গুড় দিয়ে ভিন্ন সে কঠিন ইটের মত জিনিষ গলা দিয়ে নামে না—কিন্তু গুড় সে সঙ্গে করে আনেনি কাপড়চোপড়ে লেগে যাবে বলে। ওর সঙ্গী বল্লে—একটু রসগোল্লার রস কিনে আনবা? এ বড্ড শক্ত।

—হ্যাগা উত্তরের গাড়ি কখন আসবে?

—এই এল। তামুক খেয়ে ল্যাও তাড়াতাড়ি।

একটু পরে আরাম করে বসে ওরা তামাক খেতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে উত্তরের অর্থাৎ মুশিদাবাদের ট্রেন এসে হাজির। চা, পান, পাঁউরুটির ফিরিওয়ালাদের চীৎকারে প্ল্যাটফর্ম মুখরিত হয়ে উঠলো। যাত্রীরা ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগলো গাড়ীতে ওঠবার চেষ্টায়। হতভম্ব ও কিং-কর্তব্যবিমূঢ় সিঁদুরচরণের হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে তার নতুন সঙ্গী তাকে একটা কামরায় ওঠালে।

গাড়ি রানাঘাট ছেড়ে দিলে। সিঁদুরচরণ এক কল্কে তামাক সেজে হাঁপ ছেড়ে বললে—বাবাঃ—এর নাম গাড়ি চড়া? কি কাণ্ড!...

সিঁদুরচরণের মনে হোল কাতুকে কতদূরে ফেলে সে অজানা বিদেশ বিভুঁইয়ের দিকে চলেচে। না এলেই যে ছিল ভাল! কে জানে বাড়ির

বার হোলেই এসব হাঙ্গামা ঘটবে। বিদেশের লোক কি রকম তারই বা ঠিক কি? তার টাকা ক'টা কেড়ে নিতেও পারে।

তার সঙ্গী তাকে বলে বলে দিচ্চে—এই উলো, এই বাদকুল্লো, এই কেষ্টলগর।

—কেষ্টলগর? কই দেখি দিকি? নাম শোনা আছে বহুৎ দিন যে।

সিঁদুরচরণ বিশেষ কিছুই দেখতে পেলে না। গোটাকতক টিনের গুদোম, খানকতক ঘোড়ার গাড়ি, দু-চারটি কোঠাবাড়ি। তাই দেখেই সে মহা খুশি। মস্ত জায়গা কেষ্টনগর। দেশে ফিরে গল্প করার মত কিছু পাওয়া গেল বটে। কাতুকে নানাছাঁদে গল্প শোনাতে হবে বাড়ি ফিরে।

আরও একটা স্টেশন গেল। পরের স্টেশনেই বোধহয়—তার সঙ্গী বললে—নামো, নামো, বাহাদুরপুর।

সিঁদুরচরণ বোঁচকা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লো। তখন সন্ধ্যা হয় হয়; সে চেয়ে দেখে—ধূ ধূ মাঠের মধ্যে ছোট্ট স্টেশন—চারিধারে কূলকিনারা নেই এমন বড় মাঠ। দূরে দূরে দু-চারটে তালগাছ, বাঁশবন।

সিঁদুরচরণের বুকের মধ্যটা হু-হু করে উঠলো।

কোথায় কাতু, কোথায় তাদের মালিপোতা। সব ফেলে সে আজ এ কোথায় কতদূরে এসে পড়েচে!

মনে মনে বললে—এ্যান্ধারা বিদেশেও মানুষ আসে! ভগবান এ তুমি কোথায় নিয়ে ফেললে মোরে!

ওর সঙ্গী বললে—চলো।

ও বলে—কনে যাবো?

—মোদের গাঁয়ে চলো। এখেন থেকে দু-কোশ পথ।

—সেখানে যাবো?

—যাবা না তো এখানে থাকবা কোথায়? খেতে দেতে হবে তো?

—কি নাম তোমাদের গাঁ?

—গোয়ালবাথান। নাগরপাড়া।

অগত্যা সিঁদুরচরণ চললো নাগরপাড়া, তার নতুন সঙ্গীর বাড়ি। ক্রোশ দুই হাঁটবার পরে এক গাঁয়ে ঢুকবার মুখেই ছোট্ট চালাঘর। সেখানে গিয়ে তার বন্ধু বললে—এই মোদের বাড়ি। ভাত-পানি খাও, হাত-মুখ ধোও।

সিঁদুরচরণ বললে—ভাত-পানি খাব কি, মুই কনে এসে পড়েচি তাই শুধু ভাবতি লেগেচি।

—কদ্দুর আসবা আবার!

—কোথায় ছেলাম আর কনে আলাম! উঃ! এ পিরথিমির কি সীমেমুড়ো নেই? হ্যাগা আর কদ্দুর আছে ইদিকি?

—আরে তুমি কি পাগল নাকি? কী বলে আর কী করে! ল্যাও ভাত-পানি খাও।

ভাত খেয়ে সিঁদুরচরণ গ্রামের মাঠের দিকে বেড়াতে গেল।

বড় বড় মাঠ, দূরে তাল গাছ। এতবড় মাঠ তাদের দেশে সে কখনো দেখেনি, আর চারিদিকেই আকের খেত। উই কি একটা গ্রাম দেখা যায়। ওর পরও পিরথিম্ আছে ওদিকে? বাব্বাঃ!

একজন লোককে বললে—হ্যাগা, ইদিকে এত আকের চাষ কেন?

—কেন, বেলডাঙায় চিনির কল আছে। আক সেখানে মণ দরে বিক্রি হয় গো—

—সব আক?

—এ কী আক তুমি দেখচো, বেলডাঙার ওদিক ষাট সত্তর একশো বিঘের এক এক বন্দ, শুদ্দু—আক।

ওর বন্ধুর বাড়িতে দিন দুই থাকার পরে আকের জমির মজুর দরকার হয়ে পড়লো। ওদের পরামর্শে সিঁদুরচরণও আকের ক্ষেতে আক কাটবার কাজে লেগে গেল। আট আনা রোজ। সিঁদুরচরণদের দেশে মজুরের রেট সওয়া পাঁচ আনা। সে দেখলে মজুরির রেট বেশ ভালই। দুদিনে একটা টাকা রোজগার, হবেই বা না কেন, কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে এসে পড়েচে—এখানে সবই সম্ভব।

নাগরপাড়ার ওপারে বোরগাছি, তার পাশে ধুব্‌লি। এই দুই গ্রামে থেকে অনেক মজুর আসতো আকের ক্ষেতে কাজ করতে। ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে সিঁদুরচরণের খুব ভাব হয়ে গেল। সে বললে—আমাদের গেরামে যাবা? সেখানে ঘোষ মশায়দের বাড়িতে একজন কিষান দরকার। দশ টাকা মাইনে, খাওয়া পরা।

সিঁদুরচরণের কাছে এ প্রস্তাব লোভনীয় বলে মনে হোল। তাদের দেশে

কৃষাণদের মাইনে মাসে পাঁচ টাকার বেশি নয়, খাওয়া পরার কথাই ওঠে না সেখানে। এবার পাটের দাম বেশি হওয়াতে কৃষাণদের রেট এক টাকা বেড়েচে মাসে—তাও কতদিন এ চড়া রেট টিকবে তার ঠিক নেই। হাতে কিছু টাকা করে নেওয়া যায় এদেশে থাকলে। কিন্তু এতদূর বিদেশে সে থাকবে কতদিন ?

সে জবাব দিলে—না ভাই, আমার যাওয়া হবে না।

—চাকরি করবা না ?

—মরতি যাবো কেন বিদেশে পড়ে ? মোদের গাঁয়ে চাকরির অভাবডা কী ?

খেয়ে দেয়ে হাতে দুপয়সা জমছে যখন, তখন পরের চাকরি করতে যাবার দরকার নেই। রোজ রোজ মজুরি চলে। আজকাল একদিনও সে বসে থাকে না। ভাল একখানা রঙিন গামছা কিনে ফেললে তেরো পয়সা দিয়ে বাহাদুরপুরের হাটে একদিন।

রঙিন গামছাখানাই হোল কাল—এখানা কিনে পর্য্যন্ত তার কেবলই মনে হতে লাগলো কাতু যদি তাকে এ গামছা-কাঁধে না দেখলো তবে আর গামছা কেনার ফলটা কি ? সবুজ গামছাখানা তো সেদিন কিনেছিল সে কাতুর জন্যে।

একদিন কাজকর্ম সেরে বিকেলে সে মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েচে। একটা বড় ঘোড়া-নিম গাছ ছায়া ফেলেচে অনেকখানি ফাঁকা মাঠে। সেখানে বসে চুপি চুপি কোমর থেকে গেঁজে খুলে পয়সাকড়ি উপুড় করে সামনে ঢেলে গুনে দেখলে, ঊনিশ টাকা তেরো আনা জমেচে মজুরি করে।

সামনে একটা খালে তেরো চোদ্দ বছরের সুন্দরী মেয়ে শামুকগুগলি তুলচে। ও বললে—কি তোলচো ও খুকি ?

মেয়েটা বিস্ময়ের সুরে বললে—কি ?

—তোলচো কী ?

—গুগ্‌লি।

—কি হবে ?

মেয়েটি সলজ্জহাস্যে বললে—খাবো।

—কি জাত তোমরা ?

—বাউরি।

—বাড়ি কনে ?

মেয়েটি আবার ওর দিকে যেন খানিকটা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে আছে—তারপর আঙুল দিয়ে দূরের দিকে দেখিয়ে বললে—নটবরপুর।

আর কোন কথা হয় না। মেয়েটা আপন মনে গুগ্‌লি তুলতে থাকে। সিঁদুরচরণ বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কাতুর কথা বড় মনে হয়, আর থাকা যায় না। এ কোন্ মুল্লুক, কতদূর, বিদেশ বিভুঁই, সেখানে বাউরি বলে জাত বাস করে। কেউ বাপ-পিতেমোর জন্মে শুনেচে বাউরি বলে কোনো জাতের কথা, যারা খালে বিলে গুগ্‌লি তুলে খায় ?

ওর মনটা হু হু করে ওঠে নতুন করে। বুকের মধ্যে কী যেন একটা মোচড় খায়। যদি এই বিদেশে সে মারা যায় ?

কাতুর সঙ্গে তাহ'লে দেখাই হবে না।

কাতু সজ্‌নে-তলায় গোরু বেঁধে খিচুলি কেটে দিচ্চে, সন্দের পিদিম ঘরে ঘরে সবে জ্বালা সুরু হয়েচে, এমন সময় রাস্তা কাঁপিয়ে রব উঠলো—বল হরি হরিবোল। ব্যাপারটা নতুন নয়—এই পথ দিয়েই দূর দেশের সমস্ত মড়া পোড়াতে নিয়ে যায় কালীগঞ্জের বা চাঁদুড়ের গঙ্গাতীরে।

কাতুদের পাড়ার কে একজন জিজ্ঞেস করলে—কনেকার মড়া ?

—সনেকপুর।

—কি জাত হ্যাঁগা ?

—সনেকপুরের বিপিন ঘোষের নাম শুনেচ ? তেনার ছেলে। কাতু বিপিন ঘোষের নাম শোনেনি, কিন্তু বড় কষ্ট হোল শুনে। কারো জোয়ান ছেলে মারা গেল—বাপ মায়ের কী কষ্ট ! এ লোক যে কোথায় গেল আজ মাসখানেকের ওপর হবে তা কেউ জানে না। খবর পত্তর কিছুই নেই। শিবির মা গাই দুইতে এসে দেখলে ও চালাঘরের ছেঁচতলায় বসে কাঁদচে। শিবির মা অবাক হয়ে বললে—কানচিস কেন রে ?

—মনটা বড্ড কেমন করচে।

—দূর ! বাছুরটা ধর্। ইদিক আয় দিনি !

—একটা মড়া নিয়ে গেল দেখলি ? বিপিন ঘোষের ছেলে।

—নিয়ে গেল তা তোর কি ? মর্ মাগী ! বাছুর ধর্। এখুনি পিইয়ে যাবে।

শিবির মা পাড়ায় গিয়ে রটিয়ে দিলে সিঁদুরচরণ কাতুকে ফেলে পালিয়েচে। আর আসবে না, এতদিনে বোঝা গেল। অনেকে সহানুভূতি দেখালে। কেউ কেউ বললে—বিয়ে করা সোয়ামী নয় তো। গিয়েচে তা কী হবে। গরুটা রয়েচে, অমন ভাল বক্‌না বাছুরটা হয়েচে, ওরই রইল।

আরও দিন-পনেরো কাটলো…

কাতুর চোখের জল শুকোয় না। রোজ সন্ধ্যেবেলা মন হু হু করে। এমন বক্‌না-বাছুর হোল গোরুটার, বার দোয়া শেষ করে আজ সেই গোরু দেড় সের দুধ দিচ্চে দুবেলায়—ও এসে দেখুক। নইলে ঘরে আগুন ধরিয়ে সে চলে যাবে একদিকে, যেদিকে দুচোখ যায়।

পাড়ার ছিচরণ সর্দার আজকাল ওর বাড়ি বড় যাতায়াত সুরু করেচে। ঠিক যে সময়টিতে কেউ থাকে না, ভর সন্ধ্যেবেলাটি, বাঁশবনে রোদ মিলিয়ে গিয়েচে—ছিচরণ এসে বলবে—ও কাতু!

—কি?

—ঘরে আছিস্?

—কেনে?

—একটু তামুক খাওয়া।

—তামুক নেই গো।

—পান সাজ্ একটা।

—পান কনে পাবো? মানুষ ঘরে না থাকলি ও সব থাকে? তুমি এখন যাও।

ছিচরণ সর্দার দমবার পাত্র নয়। তার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েচে আজ দু'বছর। অবস্থা ভালো, এক আউড়ি ধান ঘরে তুলেচে গত ভাদ্র মাসে। এবার চড়া পাটের বাজারে ত্রিশ মণ পাট বিক্রি করেচে। লোকে খাতির করে চলে ওকে। শিবির মা রোজ গাই দুইতে এসে ছিচরণের ঐশ্বর্যের ফিরিস্তি কাতুকে শুনিয়ে যায় অকারণে। ছিচরণ নিজে দু-এক দিন অন্তর আসে; কাতু বসতে না বললেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প জমাবার চেষ্টা করে। কাতুর ভাল লাগে না এসব। আর কিছুদিন সে দেখবে—তারপর গোরু বাছুর বিক্রি করে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে একদিকে।

সেদিন ছিচরণ আবার এসে হাজির। ডাক দিলে—ও কাতু!

—কি ?

—বাবাঃ, তা একটু ভাল করে কথা বল্‌লি কি তোর জাত যাবে ?

তুমি রোজ রোজ ভস্‌-সন্দেবেলা এখানে আস কেন ?

—তার দোষটা কি ?

—না, তুমি এসো না ! লোকে কি মনে করবে !

একটা কথা বলি তোর কাছে। আমার সংসারডা তো গিয়েচে তুই জানিস্‌। একা থাকতি বড্ড কষ্ট হয়।

—তা কী করবো আমি ?

ছিচরণের আর বেশি কথা বলতে সাহস হোল না, আমতা আমতা করে বললে—না না—তাই বলচি।

কাতু বললে—এখন তুমি এসো গিয়ে।

ছিচরণ তবুও যায় না। বলে—ওরে দাঁড়া। যাবো, যাবো, থাকতি আসিনি। এই দু বিশ ধান কর্জ দেলাম পাঁচুরে। বলি হয়েচে দেড় পৌটি ধান, তা লোকের উপকারে লাগে তো লাগুক। ধান ঝেড়ে দিয়ে থুয়ে এই আসচি। বড্ড কষ্ট হয়েচে আজ।

কাতু ঝাঁঝালো স্বরে বললে—কষ্ট জুড়োবার আর কি জায়গা নেই গাঁয়ে ?

—তোর সঙ্গে দুটো কথা বল্‌লি আমার মনটা জুড়োয় সত্যি বলচি কাতু। তোরে দেখে আসচি ছেলেবেলা থেকে। আমি যখন গোরু চরাই তখন তুই এতটুকু। তোর বয়েস আমার চেয়ে সাত আট বছরের কম।

—বেশ, তা এখন যাও। বয়েসের হিসেব কসতি কে বল্‌চে তোমারে ?

হ্যাঁরে, সিঁদুরচরণ তোরে ফেলে এম্‌নিই পালালো, না পয়সাকড়ি কিছু দিয়ে গিয়েচে ? চলা-চলতির একটা ব্যবস্থা চাই তো ?

—সে জন্যে তোমার দোরে গিয়ে কেঁদে পড়েলাম মুই, জিজ্ঞেস করি ?

ছিচরণ বেগতিক দেখে আস্তে আস্তে চলে গেল। কাতু কাঁদতে বসলো। তার বয়েস হয়েচে একথা সত্যি, প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি কি তার চেয়েও বেশি। ঘরসংসার বলে জিনিসের মুখ এই ক'বছর দেখচে, সিঁদুরচরণের কাছে থেকে। আবার কোথায় যাবে এই বয়েসে ? একটা পেট চলে যাবে, ভিক্ষে করা কেউ কেড়ে নেবে না। দুদিনের গেরস্থালি, ভেঙেই যদি যায় —আর কোথাও গেরস্থালি বাঁধবে না, সব ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বে।

শিবির মা এসে দোরে দাঁড়ালো, কাতু জানে ও কেন আসে। আসে একটা নিয়ে অবিশ্যি। বললে—একটু হলুদবাটা দেবা ?

—নিয়ে যাও।

—হ্'সের হলুদ এনেছিলাম ছিচরণ সর্দারের বাড়ি থেকে। তা ফুরিয়ে গিয়েচে। ওর ঘরে কোনো জিনিসের অভাব নেই! হলুদ বলো, ঝাল বলো, পেঁজ বলো, সরষে বলো—সব মজুদ। গুড় আমাদের দেয় বছরে একখানা ক'রে। ওর ঘরে চার পাঁচ মণ গুড় হয় ফি-বছর।

কাতু বললে—তা এখন হলুদ-বাটনা নেবা ?

শিবির মা বললে—হলুদ-বাটনা ছাও একটু। মাছ রাঁধবো।

—তবে নিয়ে যাও।

—তোমার শরিল খারাপ হলি দেখাশোনা করে কে তাই ভাবচি!

—সে ভাবনা তোমায় ভাবতি কেডা গলা ধরে সেধেচে শুনি? গা-জ্বালা কথা শুনলি হয়ে আসে।

ঠিক সেই সময় উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কে ডাক দিলে—ও কাতু।

কাতু চমকে উঠেই পরক্ষণে দাওয়া থেকে ছুটে নেমে এসে বললে—তুমি! ওমা, আমি কনে যাবো!

শিবির মা অন্যদিক দিয়ে পালানোর পথ খুঁজে পায় না শেষে।

এই হোল সিঁদুরচরণের বিখ্যাত ভ্রমণের ইতিহাস। এরপর থেকে মালিপোতা গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত ভ্রমণকারী বলে সে গণ্য হয়ে রইল। দশবার ধরে এ গল্প করেও তার ভ্রমণকাহিনী আর ফুরোয় না। লোকে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলে—ওই লোকটা বাহাদুরপুর গিয়েল। জোয়ান বয়েসে ও বড্ড বেড়িয়েচে দেশ-বিদেশে।

অবিশ্যি সিঁদুরচরণকে দেখতে নিতান্ত সাধারণ লোকের মতই। তার মধ্যে যে অত বড় গুণ লুকিয়ে আছে তা তাকে দেখে বোঝবার উপায় ছিল না। মানুষের কীর্তিই মানুষকে অমর করে।

সিঁদুরচরণের খ্যাতি আমার কানেও গিয়েছিল। ঝুম্‌রির বাগানের মধ্যে দিয়ে সিঁদুরচরণ হাট থেকে সেদিন ফিরচে, আমি বল্লাম—সিঁদুরচরণ নাকি বাহাদুরপুর গিয়েছিলে?

সিঁদুরচরণ বিনম্র হাস্যের সঙ্গে বললে—তা গিয়েলাম বাবু। অনেকদিন আগে।

—বটে ! আচ্ছা, সে কতদূর ?

—আপনি কেষ্টলগর চেন ?

—না চিনলেও নাম শোনা আছে।

—কোন্ দিকি জানো ?

—তা কি করে জানবো, আমি কি সেখানে গিয়েচি ?

—বাহাদুরপুর কেষ্টলগরের দু'ইষ্টিশান পরে।

কথা শেষ করেই সিঁদুরচরণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, বোধ হয় এই দেখবার জন্য যে, তার কথা শুনে আমার মুখের চেহারা কি রকম হয়।

তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প

সন্ধ্যা হইবার দেরী নাই। রাস্তায় পুরানো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে, এখানে কি? চল চল জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি, তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোন নি? মস্ত বড় গুণী।

হাত দেখানোর ঝোঁক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভাল জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি? যা বলে তা সত্যি হয়? আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না। বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে? দু'টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ীর গায়ে টিনের সাইনবোর্ডে লেখা আছে—

তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ—

এইখানে হাত দেখা ও কোষ্ঠী বিচার করা হয়।

গ্রহ শান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি।

আসুন দেখিয়া বিচার করুন। বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ী!

হাসিয়া বলিলাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত, তার এই বাড়ী?

বাহিরের দরজার কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষী-মশায় বাড়ী আছেন?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোন উত্তর শোনা গেল না। তারপর দরজা খুলিয়া গেল, একটা ছোট ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ ক'রে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার কিনা দেখতে, এবার ডেকে নিয়ে যাবে। আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরে ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন ভিতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্তপোশের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিত মশায় আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশী হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ বয়সেও গায়ের রঙের জলুস আছে। মাথার চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ত্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নীচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তাব্যঞ্জক। চোখ দুটী বড় বড় উজ্জ্বল, জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল—উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য্য-সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে-আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশী। আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন, এখন তাহার যেন অনেকখানি হারাইয়া গিয়াছে, এই ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ নিবিষ্ট মনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনরই শ্রাবণ, তেরশ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তেরশ সাতাশ সাল, ঐ পনরই শ্রাবণ, ঠিক? কিন্তু জন্মমাসে বিয়ে ত

হয় না ; আপনার হলো কেমন ক'রে, এ রকম ত দেখি নি।

কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিন মনে ছিল, এইজন্য যে আমার জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটু গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না। সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু'বছরের তাও এক ব্রিজ খেলার আড্ডায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্ত্তার কোন অবকাশ নাই।

তারপর বৃদ্ধ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর বর্ত্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে প'ড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মস্ত বড় ফাঁড়া গিয়েছিল, তের বছর বয়সে।

কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল, বর্ত্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থ নষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, বরং আর কিছু ক্ষতি যোগ আছে।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম, মাত্র দু'দিন আগে কলুটোলা ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোট সুদ্ধ মনিব্যাগটি খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধহয় থট রীডিং জানে। কিন্তু আর ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে ? এটুকু বোধহয় ধাপ্পা। যাই হোক সাধারণ হাতদেখা গণকের মত মন বুঝিয়া শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না। আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর শ্রদ্ধা হইল। মাঝে মাঝে তার সেখানে যাইতাম, হাত দেখাইতে যে যাইতাম তাহা নয়, প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে। লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধনা করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে সুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোড়দৌড়, ফাট্‌কা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে, বড় বড় মাড়োয়ারীর মটর গাড়ীর ভীড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ীর গলি আটকাইয়া থাকিত। পয়সা আসিতে

সুরু করিল অজস্র। যে পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়া গেল। হাতে একটি পয়সা দাঁড়াইল না। তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল। ঘোড় দৌড়, নারী ও সুরা। এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথা সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ ত সামান্য গনৎকার ব্রাহ্মণ মাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল। এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকার পসার নষ্ট হইল। তবুও ধূর্ত্ততা, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারী প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনটিরই অভাব তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে, সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথের দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই?

আমার মত গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই, একথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার উপর তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য ক'রে রেখে যাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কি না। লোক পাইনি এত কাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল চন্দ্রদর্শন করতে চাও? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতের আঙুলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চেপে চিৎ হয়ে শুয়ে থাক। কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নীচে একটী গাছের দুটী পরী—তুমি যা জানতে চাইবে পরীরা তাই বলে দেবে। ভাল করে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম, লোকটী এমন সব অদ্ভুত কথা বলে, যা পথে-ঘাটে বড় একটা শোনা ত যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে সব ব্যাপার ঘটে তাহাও কোনদিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোট কাগজের পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া

বলিল—চল বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন। দেখা করে আসি। খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি।

তারানাথের স্বভাবই ভাল সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি আবার তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে। গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম, তিনি আমাকে যে কোন একটী গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম করিতে তিনি বলিলেন—পকেটে রুমাল আছে? বার করে দেখ। রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুর-ভুর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুমালখানাতে আমার নামও লেখা—সুতরাং হাত সাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই। কিছু যে আশ্চর্য্য না হইলাম এমন নয় কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তান্ত্রিক-শক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সায় আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোন মূল্য দিই না। আতর ত বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়। ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ লোকটা নিম্ন শ্রেণীর তন্ত্রসাধনা করেছে, তারই ফলে দু'একটী সামান্য শক্তি পেয়েছে।

তাই বা পায় কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেও ত অনেক তোড় জোড়ের দরকার হয়, মুহূর্ত্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার রুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনেও ত একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে। Contract at a distance-এর মোটা সমস্যাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপনটিজম্‌, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার উপর ততক্ষণ কার্যকারী হইতে পারে, যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরেও আমার উপর যে হিপনটিজমের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সে প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও তো আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য্য হয়ে পড়লে, তবুও ত সত্যিকার তান্ত্রিক দেখনি। নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র এক ধরনের জাদু, যাকে তোমারা বল ব্ল্যাক ম্যাজিক। এক সময় আমিও ও জিনিষের চর্চ্চা যে না করিছি, তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন

একটা কি। এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি, শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। একজনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এধরনের লোক দেখেছ। স্যালফিউরীক এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিবে একটু দাগও লাগল না! এসব নিম্ন ধরণের তন্ত্রচর্চা শক্তি, ব্ল্যাকম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। এর চেয়ে অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি।

কি হ'লো জানো? ছেলেবেলায় আমাদের দেশে বাঁকুড়াতে এক নাম করা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়িমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন, আমাদের বাড়ী এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায় বলতেন—দুই চোখের মাঝখানে ভ্রূ থেকে একটী জ্যোতি আছে, ভাল করে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি, খুব একমনে চেয়ে দেখিস, মাস দু'ই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হল।

মনে ভাবলাম—চন্দ্রদর্শনের মত নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ধরণের জ্যোতি?

—ঠিক নীল বিদ্যুৎ শিখার মত প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ী পিছনে পেয়ারাতলায় বসে সাধুর কথা মত নাকের উপর দিকে ঘণ্টা খানেক চেয়ে থাকতুম,—সবদিন ঘটে উঠত না, হপ্তার মধ্যে দু'তিন দিন বসতাম। মাস তিন পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হ'ল, নীল লিকলিকে একটী শিখা, আমার কপালের মাঝখানে ঠিক সামনে, খুব স্থির, মিনিট খানেক ছিল প্রথম দিন।

এই ভাবে ছেলেবেলাতে সাধু সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়ীতে আর মন টেকে না, ঠাকুরমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে বসে আছি। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়নি, মন্দিরে মন্দিরে আরতি চলেছে, এমন সময় এক জন লম্বা চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমণ্ডলু হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তার সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না, সাধু ত কতই দেখি। চুপ ক'রে আছি, সাধুবাবাজী জল ভরে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন—বাবাজীর বাড়ী কোথায়?

আমি বললাম বাঁকুড়া জেলায়, মালিয়াড়া রুদ্রপুর। সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া রুদ্রপুর? তারপর কি যেন একটা ভাবলেন খুব অল্পক্ষণ, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, তারপর বল্‌লেন—রুদ্রপুরের রামরূপ সান্ন্যালের নাম শুনেছ? তারপর বললেন, তাদের বংশে এখন কে আছে জান? আমাদের গ্রামে সান্ন্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ী ঘর। দরজায় হাতী বাঁধা থাকতে শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু রামরূপ সান্ন্যালের নাম ত কখন শুনি নি। সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন—তোমার বয়েস আর কতটুকু। তুমি জানবে কি করে! খেয়া ঘাটের কাছে শিবমন্দিরটী আছে ত?

খেয়াঘাট! রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজে গিয়েছে কোন্‌কালে, এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ গরু হেঁটে চলে যায়। তবে পুরনো নদীর ঘাটের ধারে একটী বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে, শুনেছি সান্ন্যালদেরই কোন পূর্ব্বপুরুষ ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি করে জানলেন? বিস্ময়ের সুরে বল্‌লাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা অনেক জানেন দেখছি?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধপিতামহের মুখে দেখা যায়, তার অতি তরুণ অবোধ পৌত্রের কোন ছেলেমানুষি কথার জন্য। সত্যি বলছি, সে হাসির স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারি নি, খুব উঁচু না হ'লে অমন হাসি মানুষ হাসতে পারে না। তারপর খুব শান্ত, সস্নেহ কৌতুকের সুরে বল্‌লেন—বাড়ী থেকে বেরিয়েছিস্ কেন? ধর্ম্ম কর্ম্ম করবি বলে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন—বাড়ী ফিরে যা, সংসার ধর্ম্ম করগে যা। এপথ তোর নয়, আমার কথা শোন।

বললাম এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না, কিছু হবে না কেন? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িস্ নি, ছাড়তে পারবিও নি। তুই ছেলেমানুষ, নির্ব্বোধ, কিছু বোঝবার বয়েস হয়নি। যা বাড়ী যা। মা বাপের মনে কষ্ট দিস্‌নে।

কথা শেষ করে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কি করে জানলেন বলবেন না, দয়া করে বলুন—

তিনি কোন কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে

লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খানিক দূর গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন আসছিস্?

—আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই। তিনি সস্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোন লাভ হবে না, তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে যা, তোকে আশীর্ব্বাদ করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে। কি একটা শক্তি আমার ইচ্ছাসত্ত্বেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন। বা কোন দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে ব'লে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকেদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্ন্যালের কোন হদিস মেলাতে পারলাম না। সান্ন্যালদের বাড়ীর ছেলেছোকরার দল ত কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক সরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন। তিনি পেন্সন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ী এলেন। কথায় কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটী করতে তিনি বলিলেন—দেখ, আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি, তাতে আমাদের বংশের অনেক কথা লেখা ছিল।

বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব সখ ছিল, অনেক কষ্ট করে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি ক'রে বংশের কুলজী যোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি চার পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্ন্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন। ছেলেমেয়েও হয়েছিল কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না। রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামসিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেন নি। অন্ততঃ দেড়শ বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম ঐ শিব মন্দিরটা ওরকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্পা জায়গায় কেন?

—তা নয়। ওখানে তখন বহতা নদী ছিল। খুব স্রোত ছিল, বড় বড় কিস্তী চলতো, কোন নৌকা একবার ওই মন্দিরের নীচের ঘাটে মারা পড়ে বলে ওর নাম—লা-ভাঙার খেয়াঘাট।

প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলুম, খেয়াখাট !

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি, বাবার মুখে শুনেছি, তা ছাড়া আমাদের পুরোনো কাগজ পত্রে আছে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল না-ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বলত ত' এসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হ'ল ? বই টই লিখছ না কি ?

ওদের কাছে কোন কথা বলিনি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই। কোন অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়শ বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ী থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরই। বীরভূমে এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারে শ্মশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়চোপড় পরনে। তেমনই মলিন জট পাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো এখান থেকে, কে বলেছে তোকে এখানে আসতে ?

ওর আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল—সেটাকে অতি কষ্টে চেপে বললাম—মা, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন্, অনেক দূর থেকে এসেছি। দয়া করুন আমার ওপর।

পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বল্‌লে—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি—আঙ্গুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জ্জন শ্মশান, ভয় হ'ল ওর মূর্ত্তি দেখে, কি জানি মারবে-টারবে নাকি—পাগল মানুষকে বিশ্বাস নেই। সে দিন চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পর দিন।

পাগলী বল্‌লে—আবার কেন এলি ? বল্‌লাম—মা আমাকে দয়া কর—

পাগলী বল্‌লে—দূর হ—দূর হ, বেরো এখান থেকে—তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাথি। বল্‌লে—ফের যদি আসিস্, তবে বিপদে পড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না, এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। কি পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি কোনদিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখ। আমায় যেন বল্‌ছে—লাথিটা খুব লেগেছে না রে, তা রাগ করিস নে, কাল যাস্ আমার ওখানে। সকালে উঠেই

আবার গেলাম। ও মা, স্বপ্ন-টপ্ন সব মিথ্যে, পাগলী আমায় দেখে মারমূর্ত্তি হয়ে শ্মশানের একখানা পোড়া-কাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরিয়া হয়েছি, বল্‌লাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে? তুমিই ত আসতে বল্‌লে তাই এলাম।

পাগলী খিল খিল করে হেসে উঠল—তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে! তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম, হি-হি-হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকৃষ্ট করেছে, আমি বুঝলাম তখনই সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক, আমার মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে টানছে।

হঠাৎ সে বললে—বোস্ এখানে।

আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিল, তার আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন খুব রাজা-জমিদারের ঘরের কর্ত্রীর মত—তার সে হুকুম পালন না ক'রে যেন উপায় নেই। কাজেই বসতে হল।

সে বললে—কেন এখানে এসে এসে বিরক্ত করিস্ বল ত? তোর দ্বারা কি হবে, কিছু হবে না। তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে।

আমি চুপ করেই থাকি, খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা কিছু খাবি? আমায় এখানে যখন এসেছিস্, তার ওপর আবার বামুন, তখন কিছু খাওয়ানো দরকার। বল কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্য বড় কৌতূহল হল। এর আগে লোকের মুখে শুনে এসেছি—যা চাওয়া যায় সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে। কলকাতায় গন্ধ বাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য্য বলে মনে হয় নি। বললাম—খাব অমৃতি জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্ত্তমান কলা।

পাগলী এক আশ্চর্য্য ব্যাপার করলে, একটা মড়াপোড়া কয়লা তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে—এই নে খা, ক্ষীরের বরফি—

আমি ত অবাক্। ইতস্ততঃ করছি দেখে সে পাগলের মত খিল্ খিল করে কি এক রকম অসম্বদ্ধ হাসি হেসে বললে—খা—খা—ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হ'ল এ ত দেখছি পুরো পাগল। কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এর কথায় মড়া-পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ! কিন্তু আমার তখন আর

ফেরবার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েছি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা থাকে কপালে। পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার করে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে। কি বোকামি করেছি এখানে এসে—এ পাগলই। পাগল ছাড়া আর কিছু নয়। বদ্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েচে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বল্‌লে—খেলি রাবড়ি, মর্তমান কলা, পেটুক কোথাকার! পেটের জন্যে এসেছ শ্মশানে আমার কাছে? দূর-হ জানোয়ার দূর হ।

আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ মুখের ওপর বলে নি। একটিও কথা না বলে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবে না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে স্বপ্ন দেখলাম, আমার শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে বলছে—রাগ করিস নে। আসিস্ আজ, রাগ করে না ছিঃ—

এখনও পর্য্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম। যা হোক জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমার যাদু করলে না কি?

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্ত্তি ভারী প্রসন্ন! বললে—আবার এসেছিস দেখছি। আচ্ছা নাছোড়বান্দা ত তুই? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি?

বললাম—আছে। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা ক'রে।

সে অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল্, গলা টিপে মেরে ফেল্, তারপর আমার মৃতদেহের ওপর বসে সাধনা করতে হবে। নিয়ম বলে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ ক'রে বিকট চীৎকার করে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোঁক মদ আর দুটো চালভাজা দিবি। ভোর-রাত পর্য্যন্ত এমনি মড়ার ওপর বসে মন্ত্র জপ করতে হবে। রাত্রে হয়ত অনেক রকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় করিস্ নি। ভয় পেলে সাধনা ত মিথ্যা হবেই, প্রাণ পর্য্যন্ত হারাতে পারিস্। কেমন রাজী?

ও যে এমন কথা বলবে তা বুঝতে পারি নি। কথা শুনে তো অবাক হয়ে গেলাম, বললাম, সব পারব কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না, আর তুমিই বা আমার জন্যে মরবে কেন ?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখপোড়া, বেরো দূর হ—

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগালি দিলে। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ। আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখি নে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বললাম রাগ করছ কেন। একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা ? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে ?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত করে বললে—ভদ্দরলোকের ছেলে। ভদ্দর-লোকের ছেলে তবে এপথে এসেছিস কেনরে, ও অলপ্পেয়ে ঘাটের মড়া ? তন্ত্র মন্ত্রের সাধনা ভদ্দরলোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর পরে হৌসে চাকরি কর গিয়ে—বেরো—

বললাম তুমি শুধু রাগই করো। পুলিসের হাঙ্গামার কথাটাও ভাবছ না, আমি যখন ফাঁসি যাব তখন ঠেকাবে কে ?

মনে মনে আবার সন্দেহ হল, না এ নিতান্তই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। এর কাছে শুধু এতদিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া আর কিছু না। তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি, তন্ত্রের কথা শুনেছি। সময়ে সময়ে—সত্যই এমন কথা বলে যে, ওকে বিদুষী বলে সন্দেহ হয়।

সেই দিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হল। বিকেলে যখন গেলাম, তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হলে আর জ্ঞান থাকে না, তোকে ওবেলা গালাগালি দিয়েছি কিছু মনে করিস্ নে। ভালই হয়েছে, তুই সাধনা করতে চাসনি। ওসব নিম্ন তন্ত্রের সাধনা, ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তি লাভ হয় তাছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয় !

পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ মরে দেহশূন্য হ'লে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশী। এদেরও দেখা যায় না। তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাঁখিনী এই সব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ মরে যেখানে যায়, এরা

সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন্ বলে। এদের মধ্যে ভাল মন্দ দুই-ই আছে ! তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না করে উপায় নেই। কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েছে, তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এসব কথা আর কখনও শুনি নি। এর মত পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনছি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম্য শ্মশান, একটা বড় তেঁতুলগাছ আর এক দিকে কতকগুলো শিমুল গাছ। দু' চার দিন আগের একটা চিতার কাঠ কয়লা আর একটী কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েছে। কোনদিকে লোকজন নেই। অজ্ঞাতসারে আমার গা যেন শিউরে উঠল। পাগলী তখনও বলে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরণের কথা।

—এক ধরণের অপদেবতা আছে, তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া মায়া বলে পদার্থ নেই তাদের। পশুর মত মন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশী। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। এদের দিয়ে কাজ বেশী হয় বলে যাদের বেশী দুঃসাহস, এমন তান্ত্রিকেরা হাঁকিনী মন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হলে খুবই ভাল, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস্ নে তাই রাগ করিস।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস্ করলাম—তুমি তাহ'লে হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না, ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না। বুঝলাম পাগলী এ কথা কিছুতেই বলবে না। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে—আপনি ওখানে যাবেন না ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্ব্বনাশ করে দিতে পারে। ওকে বেশী ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের কোন লোক ওর কাছে ঘেঁষে না। বিদেশী লোক মারা পড়বেন শেষে ?

মনে ভাবলাম, কি আর আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তার পরে একদিন যা হ'ল তা বিশ্বাস করবে না। একদিন সন্ধ্যার পরে পাগলীর কাছে গিয়েছি। কিন্তু এমন ভাবে গিয়েছি পাগলী না টের পায়। পাগলীর সেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ষোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভুল নয় মশায়। আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপসা দেখবার কথা নয়। স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই ত! এ আবার কে এলো! যাই কি না যাই!

এক পা এগিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস্ করলাম্, মা, তিনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটী হেসে বল্‌লে, কে?

—সেই তিনি, এখানে থাকতেন।

মেয়েটি খিল্ খিল্ করে হেসে বললে—আ মরণ, কে তার নামটাই বল্ না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি!

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলীই ত! সেই হাসি, সেই কথা বলবার ভঙ্গী। এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েছে লুকিয়ে।

সে এক অদ্ভুত আকৃতি। ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী বালিকা।

মেয়েটী হেসে ঢ'লে পড়ে আর কি। বল্‌লে—এসো না, ব'স না এসে পাশে—লজ্জা কি? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই, এস—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হ'ল। মেয়েটীর রকম সকম আমার ভাল ব'লে মনে হ'ল না, তাছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এ পাগলী আমায় কোন বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে। ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম। দেখি, বটতলায় পাগলী বসে আছে আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায়নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বল্‌লে—এস, ব'স।

ব'ল্‌লাম—তুমি ওরকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলব খানা কি?

পাগলী বল্‌লে—আ…মরণ, ঘাটের মড়া, আবল-তাবল বক্‌চে।

বল্‌লাম—না, সত্যি কথা ব'ল্‌ছি, আমায় কোন ভয় দেখিও না। যখন তোমায় মা ব'লে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন্ তবে। তুই সে রকম নস্! তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক্ তোকে ছু-একটা কিছু দেবো, তাতেই তুই ক'রে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগগীর অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা কর। কিন্তু যা ব'লে দেবো, তাই করবি। রাজী আছিস্? শব-সাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোন কালেই, তবুও কখনও মড়ার উপরে বসে সাধনা করব একথা কল্পনাও করিনি। কিন্তু রাজী হ'লাম পাগলীর প্রস্তাবে। বলল্‌াম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিসের হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে গিয়েছি। সেই দিন দেখলাম পাগলীর ভাবটা যেন কেমন কেমন, ও আমায় ব'ললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চুপি চুপি এসো।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেক খানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়ানো পাকানো জলমগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটী ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে মড়া বেধে আছে। কোন ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধ হয়।

ও ব'ললে, তো'ল্ মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হালকা হবে। ওকে তুলে শেকড়ে রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কি করছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পড়নে তখনও কাপড়; সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে। আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না, অল্প চেষ্টাতেই সেটা টেনে তুলে ফেলি। পাগলী বললে—মড়ার ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাবিনে ত? ভয় পেয়েছ কি মরেছ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে চীৎকার করে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে। সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, কোন তফাৎ নেই।

পাগলী বল্‌লে—চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন ও আপদ!

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন। পাগলীকে

দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল। মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি, গাঁয়ের লোকে ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে সন্ধ্যা থেকে আমাকে তা করতে হ'ল।

শব সাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবার নয়। সন্ধ্যার পর থেকেই আমি শবের ওপর আসন করে বসলাম। পাগলী একটা অর্থ-শূন্য মন্ত্র আমাকে বল্‌লে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয় নি যে, এতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে যদি কোন বিভীষিকা দেখ তবে ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই মরবে।—তখন আমার মনে বিশ্বাস হয় নি।

রাত্রি দুপুর হ'ল ক্রমে। নির্জন শ্মশান, কেউ কোন দিকে নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকারে দিক্‌বিদিক্ লুকিয়েছে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখি নি।

হঠাৎ একপাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা কষাড় ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক ত কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শ্মশানে একা টাট্‌কা মড়ার ওপর বসে সে শেয়ালের ডাকে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা না-করা তোমারই ইচ্ছে কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে ব'লে আমার কোন স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না, সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হ'ল শ্মশানের নীচে নদীর জল থেকে দলে দলে সব বৌ-মানুষরা উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ মুখে ঘোমটা টানা, জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে দলে—একটা, দুটো, পাঁচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি যা হয় হবে।

একটু পরে ভাল করে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চার পাশে একটাও বৌ নয় সব কররা পাখী, বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়। দু-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মত।

এক মুহূর্ত্তে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেল—তাই বল! হরি হরি! পাখী!

চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষ হয় নি—পরক্ষণেই আমার চার পাশে মেয়ে গলায় কারা খল খল ক'রে হেসে উঠল।

বললে—তোমার বেলা এসেছি সম্প্রদায় রক্ষার জন্যে···অত ভয় কিসের! আমি না তোকে লাথি মেরেছি? শ্মশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেছি। তোকে পরীক্ষা না করে কি সাধনার নিয়ম বলে দিয়েছি তোকে?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি। বলে কি?

মেয়েটী আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোর যেমন ভয়, সে তুই পারবি নে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

ঠিক কথা দিলে?

—দিলাম। এ সময় যে শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার নজর পড়ল। পড়তেই ভয় ও বিস্ময়ে আমার সর্ব্বশরীর কেমন হয়ে গেল। শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোন তফাৎ নেই।

একই মুখ, একই রং, একই বয়স।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখছিস কি?

আমি কথার উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল সেটা মুখেই প্রকাশ করে বললাম—কে আপনি? আপনি কি সেই শ্মশানের পাগলী না কি?

একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেঁড়ে চৌচির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরকঙ্কালগুলো হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকে বেঁকে উদ্দাম নৃত্য সুরু করলে। আর এমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে পড়তে লাগল। কোন কঙ্কালের হাত খসে গেল। কোনটীর মেরুদণ্ড, কোনটীর কপালের হাড়, কোনটীর বুকের পাঁজরাগুলো —তবুও তাদের নৃত্য সমানেই চলেছে—এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল, আর হাড়ে হাড়ে লেগে কি বীভৎস ঠক্ ঠক্ শব্দ। হঠাৎ আকাশের একপ্রান্তে যেন জড়িয়ে গুটিয়ে গেল কাগজের মত, আর সেই ছিদ্র পথে যেন একটা বিকটমূর্ত্তি নারী উন্মাদিনীর মত আলু থালু বেশে নেমে আসছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চার পাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল, বিশ্রী মড়া পচার দুর্গন্ধে চারিদিক পূর্ণ হ'ল। পেছনের আকাশটা আগুনের মত রাঙা মেঘে ছেয়ে গেল, তার নীচে চিল, শকুনি উড়ছে সেই গভীর রাত্রে! শেয়ালের

চীৎকার ও নরকঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকী সব জগৎ নিস্তব্ধ, সৃষ্টি নিঝুম।

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুটে আসছে। তার আগুনের ভাঁটার মত জ্বলন্ত দু-চোখে ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ মিশ্রিত, সেকি ভীষণ ক্রূর দৃষ্টি! সে পূতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন-রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিলে গিয়েছে একই উদ্দেশ্যে —সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে চায়।

যে শবটার ওপর বসে আছি—সে শবটা চীৎকার করে কেঁদে উঠে বললে—আমায় উদ্ধার কর, রোজ রাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন করে মেরে ফেলেছে ব'লে আমার গতি হয় নি—আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি এই শ্মশানে! ছাপ্পান্ন বছর···কাকেই বা বলি? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশাহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পূবে ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী বসে মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে···সেই বটতলায় আমি আর পাগলী দু'জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে। আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না?

আমার শরীর তখন ঝিম ঝিম করছে।

বললুম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ ছেড়ে দিলি, দূর, ওসব হাঁকিণীদের মায়া। ওরা সাধনার বাধা, তুই ষোড়শীকে চিনিস না, শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম শক্তি।

এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি তুষ্ট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা! তুই তার জানিস কি? ওসব মায়া।

আমি সন্দিগ্ধস্বরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে! আর এক বিকটমূর্ত্তি পিশাচীর মত চেহারার নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না ; তারপরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল—কি সেটা ?

পাগলী বললে, তোর ভাগ্য ভাল। শেষকালে যে বিকট মূর্ত্তি মেয়ে দেখেছিস, তিনি মহাডামরী মহাভৈরবী—তুই তাঁর তেজ সহ্য করতে পারলি নে —আসন ছেড়ে ভাগলি কেন ?

তারপরে সে হঠাৎ হি-হি ক'রে হেসে উঠে বললে—মুখ পোড়া বাঁদর কোথাকার ! উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের ! আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করিনে—হাঁকিনীদের নিয়ে কারবার করি। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেল্কি দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে ব'সে আছিস বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই ; সকাল কোথায়, এখন যে সারারাত সাধনা ক'রে আসন ছেড়ে এলি ! এই ত সবে সন্ধ্যে—!

—অ্যাঁ !

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক ! সত্যিই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা হয় হয়। আমার সবকথা মনে পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল ছটায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙায় তোলা, শবসাধনা, নর কঙ্কাল, ষোড়শী, উড়ন্ত চিল শকুনির ঝাঁক,—সব আমার ভ্রম !

হতভম্বের মত বললাম—কেন এমন ভোলালে ! আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে !

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিচ্ছিলাম, তোর মধ্যে সে জিনিষ নেই, তোর কর্ম্ম নয় তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোনদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে, এলেও আর দেখা পাবি নে।

বললাম একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি ত অসাধারণ শক্তি ধরো। তুমি ভেল্কি নিয়ে থাক কেন ? উর্দ্ধতন্ত্রের সাধনা কর না কেন ?

পাগলী এবার একটু গম্ভীর হ'ল। বললে—তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামরী, ত্রিপুরা, এঁরা মহাবিদ্যা। ব্রহ্মশক্তির নানারূপ। এদের সাধনা এক জন্মে হয় না—আমার পূর্ব্বজন্মও এমনি কেটেছে—এ জন্মও গেল। গুরুর দেখা পেলাম না—যা—তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব ব'কে কি করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশী দিন। যা—পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাইনি, ভয়েই যাইনি। পাগলীর দেখাও পাই নি আর কোনদিন।

তখন চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে, পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারের কেউ ছিল না সে, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত—তুমি আমি সামান্য মানুষে তার কি বুঝব? যাক্ সে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারিনি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্র দর্শন এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও? এস্ চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙ্‌ল দিয়ে—

আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাততঃ দন্দ্রদর্শন অপেক্ষাও গুরুতর কাজ বাকী। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহার আমি কোনো জবাব দিব না।

ভণ্ডুলমামার বাড়ী

পাড়াগাঁয়ের মাইনার স্কুল। মাঝে মাঝে ভিজিট্ করতে আসি, আর কোথাও থাকবার যায়গা নেই, হেড্ মাষ্টার অবিনাশবাবুর ওখানেই উঠতে হয়। অবিনাশবাবুকে লাগেও ভাল, বছর বিয়াল্লিশ বয়েস, একহারা চেহারা, বেশ ভাবুক লোক। বেশী গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, কাজেই জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না হ'তে পেরে দেবলহাটি মাইনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন এবং বাকী পনেরোটা বছর যে এখানেই কাটাবেন তার সম্ভাবনা ষোলআনার ওপর সতেরো আনা।

কার্ত্তিক মাসের শেষে হেমন্ত সন্ধ্যা। স্কুলের বারান্দাতে ক্লাস-রুমের দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। সামনে একটা ছোট মাঠ, একপাশে একটা বড় তুঁত গাছ, একপাশে একটা মজা পুকুর। সামনের কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের বাজারের দিকে গিয়েচে, স্থানটা নির্জ্জন।

চায়ের কোন ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয়, তা জানি। একটি গরিব ছাত্র হেডমাষ্টারের বাসায় থেকে পড়ে আর তাঁর হাটবাজার করে। সে এসে দুটো রেকাবিতে ঘি-মাখানো রুটি, আলুচচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল। আমি বল্লুম—অবিনাশবাবু, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—বেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সার্টেন্‌লি—ওরে ও কানাই, শোন্, শোন্, যা দিকি একবার গঙ্গার বৌয়ের বাড়ি, আমার নাম ক'রে বলগে দুটি গরম মুড়ি ভেজে দ্যায় —এক্ষুনি···

আমি বল্লুম অভাবে চাল ভাজা···

তারপর গল্পগুজবে আধঘণ্টা কেটে গেল। অবিনাশবাবু কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে বাঁ-ধারের মজা পুকুরটার দিকে চাইছিলেন। হঠাৎ বললেন—মুড়ি আসুক্, একটা গল্প বলি ততক্ষণ। শুনুন, ইন্সেপেক্টারবাবু। এই রকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনে পড়ে। আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয়!···এখানকার লোকজন দেখচেন তো? সব দোকানদার, লেখাপড়ার কোন চর্চ্চা নেই, ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শেখায় এইজন্যে যে কোনো রকমে ধারাপাত আর শুভঙ্করীটা শেষ করাতে পারলেই দাঁড়ি ধরাবে। কারুর সঙ্গে কথা ব'লে সুখ পাইনে, ঝালমসলার দরের কথা কাঁহাতক আলোচনা করি বলুন। ভদ্রঘরের ছেলে, না হয় এসে পড়েচি পেটের দায়ে এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে, কিন্তু তা বলে মনটা তো—কলেজের দু চার ক্লাস চোখে দেখেছিলামও তো—পড়াশুনো না-হয় নাই করেচি···

দেখলাম অবিনাশবাবু কলেজের দিনগুলোর কথা এখনও ভুলতে পারেন নি। বেচারীর জীবনে জাঁক্‌জমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সে সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা-কিছু কর্ম্মনৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবনধারাকে আশ্রয় ক'রে। কলেজের দিনগুলোতেই শহরের মুখ দেখেছিলেন, আড়ম্বর বা বিলাসিতা—মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন—ঐ কলেজের ক'টা বছরেই তার আরম্ভ ও শেষ। সে দিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়চে, রঙীন স্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মোহময় হয়ে পড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে।

অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বল্‌তে সুরু করলেন।

—হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ছিল কেন? এখন নেই?

সে কথা পরে বল্‌চি। না, এখন নেই ধরে নিতে পারেন। কেন যে নেই, তার সঙ্গে এই গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে, গল্পটা শুনলেই বুঝবেন।

হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে আমার মামার বাড়ি ছিল। ছেলেবেলায় যখন সর্ব্বপ্রথম মায়ের সঙ্গে সেখানে যাই, তখন আমার বয়েস বছর পাঁচেক। আমাদের মামার বাড়ির পাড়ায় আট নয় ঘর ব্রাহ্মণের বাস, ঘেঁষাঘেঁষি বসতি, এক চালে আগুন লাগলে পাড়াসুদ্ধ পুড়ে যায়, এমন অবস্থা। কোঠাবাড়ি ছিল কেবল আমার মামাদের, আর সব খড়ের ছাউনি, ছোট-বড় আটচালা ঘর, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাবার পথে একটা বড় আম কাঁটালের বাগান, বনজঙ্গল, সজনে গাছ ও দু-একটা ডোবা। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকদূর গেলে তবে ও-পাড়ার প্রথম বাড়িটা। সেই বনজঙ্গলের মধ্যে কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা হচ্চে।

সে-বার কিছুদিন থেকে চলে আসবার পর আবার যখন মামার বাড়ি গেলুম, তখন আমার বয়স আট বছর। গ্রামটা অনেক দিন পরে দেখতে বেরিয়ে চোখে পড়ল, এ-পাড়া ও ও-পাড়ার মধ্যে বাঁ-দিকে ডোবার ধারের একটা জায়গা। একটু অবাক হয়ে গেলাম। ডোবার পাড়ের জঙ্গল অনেকটা কাটানো, কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা অবস্থায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু মনে হল অনেক দিন গাঁথুনির কাজ বন্ধ আছে, যে-জন্যই হোক, কারণ, ভিতের গায়ে ও ঘরের মেজেতে ছোট-বড় ভঁট্‌শেওড়ার গাছ গজিয়েচে, চুণ-সুরকী মাখার ছোট খানাতে পর্য্যন্ত বনমুলোর চারা। মনে পড়ল, সে-বার এসে বাড়িটা গাঁথা হচ্চে দেখেছিলুম। এখনও গাঁথা শেষ হয়নি তো? কারা বাড়ি তুলচে?

ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলুম।

...কারা ওখানে বাড়ি করচে দিদিমা, সে-বার এসে দেখে গিইচি, এখনও শেষ হয়নি?

...তোর এত কথাও মনে আছে।...ও তোর ভণ্ডুলমামা বাড়ি করচে। এখানে তো থাকে না, তাই দেখাশোনার অভাবে গাঁথুনি এগুচ্চে না।

আমার ভারী কৌতূহল হ'ল, সাগ্রহে বললুম—ভণ্ডুলমামা কোথায় থাকে দিদিমা? ভণ্ডুলমামা কে?...

—ভণ্ডুল রেলে চাকরি করে, লালমণিরহাটে না কোথায়। আমাদের গাঁয়েই ছেলেবেলায় থাকৃত, বাড়িঘর তো ছিল না। ও-পাড়ার মুখুয্যেবাড়ির ভাগ্নে, এখন চাকরিবাকরি করচে, ছেলেপুলে হয়েচে, একটা আস্তানা তো চাই? তাই টাকা পাঠিয়ে ছায়, মুখুয্যেরা মিস্ত্রী লাগিয়ে ঘরদোর স্থরু ক'রে দিয়েচে, নিজে ছুটিতে এসে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করে···

আমি ছাড়বার পাত্র নই, বল্লুম—তবে বাড়ি গাঁথা হচ্ছে না কেন? মুখুয্যেরা তো দেখলেই পারে?

তা নয়, সব সময় তো টাকা পাঠাতে পারে না? যখন পাঠায়, তখন মিস্ত্রী লাগানো হয়।

কি জানি কেন সেই থেকে এই ভণ্ডুলমামা ও তাঁর আধ-গাঁথা বাড়িটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে রইল। রূপকথার রাজপুত্রের মতই এই ভণ্ডুলমামা হয়ে রইলেন অবাস্তব, স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত, এক মানস-রাজ্যের অধিবাসী, তাঁর চাকরীর স্থান লালমণিরহাট, মায় তাঁর ছেলেমেয়েসুদ্ধ। তাঁর টাকা পাঠাবার ক্ষমতা বা অক্ষমতাও যেন কোথায় আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির বিষয়ীভুত হয়ে দাঁড়াল, অথচ কেন এসব হ'ল তার কোন হ্যায় সঙ্গত কারণ আজও মনের মধ্যে খুঁজে পাই না।

কতবার দিদিমাদের চিলেকোঠার ছাদে শুয়ে দিদিমার মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক মনে ভেবেচি—লালমণিরহাট থেকে ভণ্ডুলমামা আবার কবে টাকা পাঠাবে বাড়ি গাঁথার জন্যে?...না, এবার বোধ হয় নিজে আস্‌বে। মুখুয্যেরা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার টাকা চুরি করে, তাই ওদের হাতে আর টাকা দেবে না। বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্পের ফাঁকে দিদিমাকে কখনো বা জিগ্যেস্ করি —লালমণিরহাট কোথায় দিদিমা? দিদিমা অবাক হয়ে বলেন—লালমণিরহাট! কেন, তাতে তোর হঠাৎ কি দরকার পড়ল?···তা, কি জানি বাপু কোথায় লালমণিরহাট? নে নে, ঘুমুস্ তো আমায় রেহাই দে,—রাত্তিরে এখন গিয়ে আমায় দুটো মোচা কুটে রাখতে হবে, ঠাকুরঘরের বাসন বের করতে হবে, ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েচে—তোমায় নিয়ে সারা রাত গল্প করলে তো চলবে না আমার?

আমি অপ্রতিভের সুরে বলতুম—না দিদিমা, গল্প বল, যেও না, আচ্ছা মন দিয়ে শুন্‌চি।

এর পরে আবার মামার বাড়ি গেলুম বছর দুই পরে। এই দু-বছরের মধ্যে

আমি কিন্তু ভণ্ডুলমামার বাড়ির কথা ভুলে যাইনি। শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে সাঁজালের ধোঁয়ায় আমাদের পুকুর পাড়টা ভরে কুয়াসা হয়েচে বুঝি আজ, সেই দিকে চাইলেই আমার অমনি মনে পড়তো ভণ্ডুলমামার সেই আধ-তৈরি কোঠা-বাড়িটার কথা—এমনি শেওড়াবনে ঘেরা পুকুর পাড়ে—এতদিনে কতটা গাঁথা হ'ল কে জানে? এতদিন নিশ্চয় ভণ্ডুলমামা মুখুয্যেবাড়ি টাকা পাঠিয়েচে!

মামার বাড়িতে রাতে এসে পৌছলাম। সকালে ঐ পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি—ও মা, এ কি, ভণ্ডুলমামার বাড়িটা যেমন তেমনি পড়ে আছে! চার-পাঁচ বছর আগে যতটা গাঁথা দেখে গিয়েছিলুম, গাঁথুনির কাজ তার বেশী আর একটুও এগোয়নি, বনে জঙ্গলে একেবারে ভর্ত্তি, ইটের গাঁথুনির ফাঁকে বট-অশথের বড় বড় চারা! আহা, ভণ্ডুলমামা বোধ হয় টাকা পাঠাতে পারেনি আর!

ভণ্ডুলমামার সম্বন্ধে সে-বার অনেক কথা শুনলুম। ভণ্ডুলমামা লালমণির-হাটে নেই, সান্তাহারে বদলি হয়েচে। 'তার এখন দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলেটি আমারই বয়সী, ভণ্ডুলমামার মা সম্প্রতি মারা গিয়েচে। বড় ছেলেটির পৈতে হবে সামনের চৈত্র মাসে। সেই সময়ে ওরা দেশে আসতে পারে।

কিন্তু সে-বার চৈত্রমাসের অনেক আগেই দেশে ফিরলুম, ভণ্ডুলমামার সঙ্গে দেখার যোগাযোগ হয়ে উঠল না।

বছর তিনেক পরে। দোলের সময়। মামার বাড়ি দোলের মেলা খুব বিখ্যাত, নানা জায়গা থেকে দোকানপসারের আমদানি হয়। আমি মায়ের কাছে আবদার স্থরু করলুম, এবার আমি একা রেলে চড়ে মেলা দেখতে যাব মামার বাড়ি। আমায় একা ছেড়ে দিতে বাবার ভয়ানক আপত্তি, অবশেষে অনেক কান্নাকাটির পরে তাঁকে রাজি করানো গেল। সারাপথ সে কি আনন্দ! একা টিকিট ক'রে, রেলে চড়ে, মামার বাড়ি চলেচি। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম একা বাড়ির বার হয়েচি সেই আনন্দেই সারাপথ আত্মহারা!

কিন্তু এ সুখ সইল না। মামার বাড়ির ষ্টেশনে নেমেই কি রকমে হোঁচট খেয়ে প্লাটফর্ম্মের কাঁকরের উপর পড়ে গিয়ে আমার হাঁটু ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। অতি কষ্টে মামার বাড়ি পৌছে বিছানা নিলুম। পরদিন সকালে উঠতে গিয়ে দেখি আর উঠতে পারিনে—দুই হাঁটুই বেজায় টাটিয়েচে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। কোথা দিয়ে দোল কেটে গেল টেরও পেলুম না। দিদিমাকে অনুরোধ করলুম, বাড়িতে যেন তাঁরা চিঠি না লেখেন যে আমি আসবার সময় ষ্টেশনে পড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছি।

সেরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন দেখি ভণ্ডুলমামার বাড়িটা অনেক দূর গাঁথা হয়ে গেছে। কাঠ-থামাল পর্য্যন্ত গাঁথা হয়েছে, কিন্তু কড়ি এখনও বসানো হয়নি।

হঠাৎ এত খুশী হয়ে উঠলুম যে আছাড় খেয়ে হাঁটু কাটার কথা টের পেলে বাবা কি বল্‌বেন, তখনকার মত সে দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে গেল। উৎসাহে ও কৌতূহলে এক দৌড়ে ভণ্ডুলমামার বাড়িতে গিয়ে হাজির। গাঁথুনি অনেক দিন বন্ধ আছে মনে হ'ল, গত বর্ষার পরে বোধ হয় আর মিস্ত্রি আসে নি। ঘরের মেজেতে খুব জঙ্গল গজিয়েচে, গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে আমরুল শাকের গাছ; বাড়ির উঠোনে বড় একটা সজনে গাছে প্রথম ফাগুনে ফুলের খই ফুটেচে। ঘুরে ঘুরে দেখলুম, ভণ্ডুলমামার বাড়িতে তিনটে ঘর, একটা ছোট দালান, মাঝে একটা সিঁড়ির ঘর, আট-দশ ধাপ সিঁড়ি গাঁথা হয়ে গেছে। ওদিকের বড় ঘরটা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার, মাঝের ঘরটাতে ছেলেমেয়েরা থাক্‌বে। ভণ্ডুলমামার বাপ আছে? কে জানে? তিনি বোধ হয় থাক্‌বেন সিঁড়ির এপাশের ঘরটাতে। রান্নাঘর কোথায় হবে? বোধ হয় উঠোনের এক পাশে ওই সজনে গাছটার তলায়। ভণ্ডুলমামা ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন এসে বাস করবে, তখন এদের উঠোনে কি আর এমন জঙ্গল থাকবে? ছেলে-মেয়েরা ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি ক'রে খেলবে, হয়ত বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে পূর্ণিমায় কি সংক্রান্তিতে সংক্রান্তিতে। পুকুর পাড়ের এ জংলী চেহারা তখন একেবারে বদলে যাবে যে! আমার মামার বাড়ির এ পাড়াতে এক ঘর লোক বাড়বে...ও-পাড়া থেকে খেলা ক'রে ফেরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে গেলেও আর ভাবনা থাকবে না...ওদের বাড়িতে আলো জ্বলবে, ছেলেমেয়েরা কথা বল্‌বে, কিসে আর তখন ভয়? দিব্যি চলে যাব।

আরও বছর দুই কেটে গেল। থার্ড ক্লাসে পড়ি। মামার বাড়ি একাই গেলুম। একাই এখন সব জায়গায় যাই। ভণ্ডুলমামার বাড়ির ছাদ-পেটানো হয়ে গিয়েছে, সিমেণ্টের মেজে, দালানের বাইরে রোয়াক্ হয়েছে কবে আমি দেখিনি তো? রোয়াকের ওপর কেমন টিনের ঢালু ছাদ! কেবল একটুখানি এখনও বাকী, দরজা জানালায় এখনও কপাট বসানো হয়নি। বাঃ, ভণ্ডুল-মামার বাড়ি তাহলে হয়ে গেল!

ভণ্ডুলমামা নাকি আজকাল বড় সুদখোর হয়ে উঠেছেন, মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসেন, চড়া সুদে লোকজনকে টাকা ধার দেন, বাড়ি দেখাশুনো করেন,

আবার চলে যান। মাস-কতক পরে আবার এসে কাবুলীওয়ালার মত চড়াও হয়ে সুদ আদায় করেন। গাঁয়ের লোক তাঁর নাম রেখেচে রত্নদত্ত।

তারপর এল একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান। ছেলেবেলার মত মামার বাড়িতে আর তত যাইনে, গেলেও এক-আধ দিন থাকি। সেই এক-আধ দিনের মধ্যে পথে যেতে যেতে হয়ত দেখি, জঙ্গলের মধ্যে ভণ্ডুলমামার বাড়িটা তেমনি জনহীন পড়ে আছে···বনজঙ্গল চারিপাশে আরও গভীরতর, কেউ কোনদিন ও-বাড়িতে পা দিয়েচে ব'লে মনে হয় না···একটা ছন্নছাড়া লক্ষীছাড়া চেহারা, শীতের সন্ধ্যায়, বর্ষার দিনে, চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে কত বার ও-বাড়িটা দেখেচি, সেই একই মূর্ত্তি···

এম্‌নি ক'রে বছর কয়েক কেটে গেল।

ক্রমে এণ্ট্রেন্স পাস দিয়ে কলকাতায় এসে কলেজে ঢুকলুম। সেবার সেকেণ্ড ইয়ারের শেষ, এফ-এ দেব, কি একটা দরকারে মামার বাড়ি গিয়েচি।

বোধ করি মাঘ মাসের শেষ। দুপুরে পূবের ঘরে জানালার ধারে খাটে শুয়ে আছি, বোধ হয় একখানা লজিকের বই পড়চি। এমন সময়ে একজন কালো, শীর্ণকায় প্রৌঢ় লোক ঘরে ঢুকলেন। বড় মামীমা বললেন···এই তোর ভণ্ডুলমামা, প্রণাম কর্।

আমার সে ছেলেবেলাকার মনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল—বয়স হয়েছে, কলেজে পড়ি; নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশেছি, সুরেন বাঁড়ুয্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশী মিটিঙে ভলাণ্টিয়ারী করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীই গেছে বদ্‌লে—তখন মনের কোন্ গভীর তলদেশে আরও পাঁচটা পুরোনো দিনের আদর্শের ও কৌতূহলের বস্তুর স্তূপের সঙ্গে ভণ্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা পড়ে গিয়েছে। তাই ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র—ভণ্ডুলমামার বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, টিকিতে একটা মাদুলী বাঁধা, গলায় কিসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। এই সেই ছেলেবেলাকার ভণ্ডুলমামা! উদাসীন ভাবে প্রণামটা সেরে ফেললুম।

ভণ্ডুলমামা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন, একটু গায়ে পড়েই যেন। আমি কোন্ কলেজে পড়ি, কোন্ মেসে থাকি, কবে আমার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আমায় জ্বালাতন ক'রে তুললেন। আজকাল তিনি

কল্‌কাতায় চাকরি করেন, বাগবাজারে বাসা, তাঁর বড়ছেলেও এবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ছে—এ-সব খবরও দিলেন।

আমি জিগ্যেস্ করলুম,—আপনাদের এখানকার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আন্‌বেন না ?

ভণ্ডুলমামা বল্‌লেন—আন্‌ব, শিগ্‌গীরই আন্‌ব বাবা। এখনও একটু বাকী আছে, একটা রান্নাঘর আর একটা কূয়ো করতে পারলেই সব এনে ফেলি। কল্‌কাতায় বাসাভাড়া আর দুধের খরচ যোগাতেই···সেইজন্যেই তো খেয়ে-না-খেয়ে দেশে বাড়িটা করলুম, তবে ঐ একটুখানি যা বাকী আছে···তা ছাড়া চিলেকোঠার ছাদটা এখনও···এইবারেই ভাবছি শ্রাবণ মাসের দিকে ওটাও শেষ করব।

বলে কি ! এখনও বাকী ! জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখে আস্‌ছি ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে! এ তাজমহল নির্ম্মাণের শেষ বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারব তো !

ভণ্ডুলমামা আপন মনেই ব'লে যেতে লাগলেন—সামান্য চাকরি, ছা-পোষা মানুষ বাবা, কাচ্চাবাচ্চা খাইয়ে যা থাকে তাতেই তো বাড়ি হবে ? এখন ত বাসায় বাসায় কাটচে, আজ যদি চাকরি যায় তবে ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব, তাই ভেবে আজ চোদ্দ-পনেরো বছর ধ'রে একটু একটু ক'রে বাড়িটা তুলচি। তা এইবার আর দেরি হবে না, আস্‌ছে বছর সব এনে ফেল্‌ব। জায়গাটা বড় ভালবাসি।

ভণ্ডুলমামা বল্‌লেন ত চোদ্দ-পনেরো বছর, কিন্তু আমার মনে হ'ল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধ'রে···যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধ'রে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠছে···শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে···ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।

পরের বছর আবার ভণ্ডুলমামার সঙ্গে কল্‌কাতাতেই দেখা। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। ভণ্ডুলমামা বল্‌লেন—এস একবার আমাদের বাসায়। তোমার মামী তোমায় দেখলে খুশী হবে। সাম্‌নের রবিবার তোমার নেমন্তন্ন রইল, অবিশ্যি যাবে।

গেলুম, ভণ্ডুলমামার ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। ভণ্ডুলমামা অনুযোগের সুরে বললেন,—ওদের বলি, যা একবার এই সময়ে। আষাঢ় মাসে দেশে গিয়ে উঠোনে খাসা বরবটি আর সিম লাগিয়ে রেখে এসেছি, মাচাও বেঁধে রেখে এসেছি, তা কেউ কি কথা শোনে?

মামীমা ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন,—যাবে সেখানে কেমন ক'রে শুনি? কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই, ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে। জলের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে, শুধু সিম আর বরবটির পাতা চিবিয়ে ত মানুষে···তাতে বাড়ি হাট আলগা, পাঁচিল নেই।

ভণ্ডুলমামা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ভয়ে ভয়ে যা বললেন তার মর্ম্ম এই যে, মানুষ বাস না করলেই বাড়িতে বটঅশথের গাছ হয়, ছাদ আঁটা হয়ে গেছে আজ অনেক দিন, কিন্তু কেউ বাস ত করে না। বাড়ি কাজেই খারাপ হয়ে থাকে। তবুও তিনি বছরে দু-তিনবার যান ব'লে এখনও ঘরদোর টিকে আছে। পাতকুয়োর আর কত খরচ? চৈত্র মাসের দিকে না হয় ক'রে দেওয়া যাবে। আর তোমরা সবাই যদি যাও, পাঁচিল আষাঢ় মাসেই ক'রে দেওয়া যাবে।

বুঝলুম পাতকুয়া এখনও বাকী। ভণ্ডুলমামার বাড়ি এখনও শেষ হয়নি, এখনও কিছু বাকী আছে। কিন্তু এতদিন ধ'রে ব্যাপারটা চলচে যে এক দিক গড়ে উঠতে অন্য দিকে ধরেছে ভাঙন।

এর পরে মামার বাড়ি গিয়ে দু-একবার দেখেছি ভণ্ডুলমামা দু-পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন। এটা সারাচ্ছেন, ওটাতে বেড়া বাঁধছেন, এ-গাছটা খুঁড়ছেন, ও-গাছটা কাটচেন। ছেলেরা আসতে চায় না কল্‌কাতা ছেড়ে। নিজেকেই আস্‌তে হয়, দেখাশুনো করতে হয় ব'লে একদিন সলজ্জ কৈফিয়ৎও দিলেন।···পাঁচিল? হ্যাঁ তা পাঁচিল—সম্প্রতি একটু টানাটানি যাচ্ছে···সাম্‌নের বর্ষায়···ঘরদোর বেঁধেছি সারাজীবন খেটে, ওই আমার বড় আদরের জায়গা—তোরা না থাকিস, আমিই গিয়ে থাকি।

আমি বল্‌লুম,—ওখানে কেমন ক'রে থাকেন? সারা গাঁয়েই ত মানুষ নেই, মামার বাড়ির পাড়া ত একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে।

—কি করি বাবা, ওই বাড়িখানার ওপর বড় দম আমার যে। দেখ, চিরকাল পরের বাসায়, পরের বাড়িতে মানুষ হয়ে ঘরের কষ্ট বড় পেয়েছিলুম— তাই ঠিক করি বাড়ি একখানা করবই। ছেলেবেলা থেকে ওই গাঁয়েই কাটিয়েছি, ওখানটা ছাড়া আর কোথাও মন বসে না। চিরকাল ভাবতুম

রিটায়ার ক'রে ওখানেই বাস করব। একটা আস্তানা ত চাই, এখন না হয় ছেলেপিলে নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরছি কিন্তু এর পরে দাঁড়াব কোথায়? তাই জলাহার ক'রেও সারাজীবন কিছু কিছু সঞ্চয় ক'রে ওই বাড়িখানা করেছিলুম। তা ওরা তো কেউ এল না—আমি নিজেই থাকি। না থাক্‌লে বাড়িখানা ত থাক্‌বে না—আর এককালে না এককালে ছেলেদের ত এসে বস্‌তেই হবে বাড়িতে। কল্‌কাতার বাসায় বাসায় ত চিরকাল কাটবে না।

তারপর মামাদের মুখে ভণ্ডুলমামার কথা আরও সব জানা গেল। ভণ্ডুলমামা একা বিজন বনের মধ্যে নিজের বাড়িখানায় থাকেন। তাঁর এখনও দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর ছেলেরা শেষ পর্য্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে। তিনি এখনও এ-জায়গাটা ভাঙছেন, ওটা গড়ছেন, নিজের হাতে দা দিয়ে জঙ্গল সাফ করছেন। ছেলেদের সঙ্গে বনে না—ওই বাড়ির দরুণই মনান্তর, স্ত্রীও ছেলেদের দিকে। ছেলেরা বাপকে সাহায্যও করে না। ভণ্ডুলমামা গাঁয়ে একখানা ছোট মুদির দোকান করেছিলেন—লোক নেই তার কিনবে কে? যা দু-একঘর খদ্দের জুটেছিল—ধার নিয়েই দোকান উঠিয়ে দিলে। এখন ভণ্ডুলমামা এ-গাঁ ও-গাঁ বেড়িয়ে কোনো চাষার বাড়ি থেকে দু-কাঠা চাল, কারুর বাড়ি পাঁচটা বেগুন—এই রকম ক'রে চেয়েচিন্তে এনে বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়ে দুটো ফুটিয়ে খান।

তারপর ধীরে ধীরে অনেক বছর কেটে গেল। আমি ক্রমে বি·এ পাস করে চাকরিতে ঢুকলুম। মামার বাড়ি আর যাইনে, কারণ সে-গ্রাম আর যাবার যোগ্য নেই। মামার বাড়ির পাড়ায় গাঙ্গুলীরা রায়েরা, ভড়েরা সব একে একে মরে হেজে গেল, যারা অবশিষ্ট রইল তারা বিদেশে চাকরি করে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। ও-পাড়াতেও তাই জীবন মজুমদারের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি ছাদ ভেঙে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে, শুধু এক দিকের দোতলাসমান দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। যে পূজোর দালানে ছেলেবেলায় কত উৎসব দেখেছি, এখন সেখানে বড় বড় জগডুমুরের গাছ, দিনেই বোধ হয় বাঘ লুকিয়ে থাকে। বিখ্যাত রায়দীঘি মজে গিয়েছে, দামে বোঝাই, জল দেখা যায় না, গরুবাছুর কচুরীপানার দামের ওপর দিয়ে হেঁটে দিব্যি পার হ'তে পারে।

সন্ধ্যা রাতেই গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। দু-এক ঘর নিরুপায় গৃহস্থ যারা নিতান্ত অর্থাভাবে এখনও পৈতৃক ভিটেতে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ হাতে সন্ধ্যাদীপ

জ্বালাচ্ছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'তে-না-হতেই তারা প্রদীপ নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করে —তারপর সারারাত ধ'রে চারিধারে শুধু প্রহরে প্রহরে শৃগালের রব ও নৈশ-পাখীর ডানা ঝটাপটি!

আমার মামারাও গ্রামের ঘর-বাড়ি ছেড়ে শহরে বাসা করেছেন। ছোট-মামার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সেখানে একবার গিয়েছি। ব্রাহ্মণভোজনের কিছু আগে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা পুঁটুলি হাতে বাড়িতে ঢুকলেন। এক পা ধুলো, বগলে একটা ময়লা সাদা কাপড়বসানো বাঁশের বাঁটের ছাতা। প্রথমটা চিনতে পারিনি। পরে বুঝলুম ভণ্ডুলমামা। এত বুড়ো হয়ে পড়েছেন এর মধ্যে!...শহরে এসে মামাদের নতুন সভ্য, সৌখীন, আলাপী বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদের ধরণে ও কথাবার্ত্তার সুরে ভণ্ডুলমামা কেমন ভয় খেয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের সতরঞ্চির এককোণে বসলেন। তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মামারা তখন শহুরে বন্ধুদের আদর-অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত; তাঁর আগমন কেউ বিশেষ লক্ষ্য করেছে এমন মনে হ'ল না।

আমি গিয়ে ভণ্ডুলমামার কাছে বসলুম। চারিধারে অচেনা মুখের মধ্যে আমায় দেখে ভণ্ডুলমামা খুব খুশী হলেন। আমি জিগ্যেস করলুম—আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

ভণ্ডুলমামা বললেন,—না বাবা, আমি রিটায়ার করেছি আজ বছরপাঁচেক হবে। গাঁয়ের বাড়িতেই আছি। ছেলেরা কেউ আসতে চায় না।

অন্নপ্রাশন শেষ হয়ে গেল। ভণ্ডুলমামা কিন্তু মামার বাড়ি থেকে আর নড়তে চান না। চার-পাঁচ দিন পরে কিছু চাল-ডাল ও বাসি সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দেশে রওনা হলেন। পায়ে দেখি কটক থেকে কিনে-আনা বড় মামার সেই পুরোনো চটি জুতো জোড়া। আমায় দেখিয়ে বললেন,—নবীন কটক থেকে এনেছে, দেখে বড় সখ হ'ল, বয়েস হয়েছে, কবে মরে যাব, বললুম তা দাও নবীন, জুতোজোড়াটা পুরোণো হ'লেও এখনও দু-তিন মাস যাবে। বাড়িতে একজোড়া রয়েছে, আঙুলে বড় লাগে ব'লে খালি পায়েই—

তিনি বাড়ির বার হয়ে গেলেন। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলুম শীর্ণকায় ভণ্ডুলমামা ভারী চাল ডালের মোটের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চটিজুতোর ফটাং ফটাং শব্দ করতে করতে ষ্টেশনের পথে চলেছেন। হঠাৎ আমার মনে তাঁর উপরে আমার বাল্যের সেই রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার

অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন ফিরে এল। আমি চেঁচিয়ে বললুম—একটু দাঁড়ান মামা, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি। ভণ্ডুলমামার পুঁটুলিটা নিজের হাতে নিলুম, টিকিট করে তাঁকে গাড়ীতে তুলেও দিলুম। ট্রেনে ওঠবার সময় একমুখ হেসে বললেন—যেও না হে একদিন, বাড়িটা দেখে এস আমার—খাসা করেছি—কেবল পাঁচিলটা এখনও যা বাকি। কি করি, আমার হাতে আজকাল আর ত কিছু নেই, ছেলেরা নিজেদের বাসার খরচই চালিয়ে উঠতে পারে না—অবিশ্যি ওদের জন্যেই ত সব, দেখি, চেষ্টায় আছি—সামনের বছরে যদি...

ভণ্ডুলমামার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। কিন্তু এর মাস-কতক পরে তাঁর বড়ছেলে হরিসাধনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। ম্যাকমিলান কোম্পানীর বাড়িতে চাকরি করে, জিনের কোট গায়ে, হাতে বইয়ের আকারের খাবারের কৌটা, মুখে একগাল পান—বৌবাজারের ফুটপাত দিয়ে বেলা দশটার সময় আপিসে যাচ্ছে। আমিই ভণ্ডুলমামার কথা তুললাম। হরিসাধন বললে—বাবা দেশের বাড়িতেই আছেন—আমরা বলি আমাদের সংসারে এসে থাকুন, তাতে রাজি নন। বুদ্ধিশুদ্ধি ত কিছু ছিল না বাবার, নেইও—সারা জীবন যা রোজগার করেছেন ওই জঙ্গলের মধ্যে এক বাড়ি করতে গিয়ে সব নষ্ট করেছেন, নইলে আজ হাজার চার-পাঁচ টাকা হাতে জমতো। ও-গাঁয়ে যাবেই বা কে? রামোঃ, যেমন জঙ্গল তেম্‌নি ম্যালেরিয়া—তাছাড়া লোকজন নেই, অসুখ হ'লে একটা ডাক্তার নেই—চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে বাড়ির পিছনে, বেচতে গেলে এখন ইট কাঠের দরেও বিক্রী হবে ভেবেছেন? কে নিতে যাবে, পাগল আপনি?

আমি বললুম—কথাটা ঠিক্‌ বটে। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার বাবা যখন বাড়িটা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, তখন জাজ্বল্যমান গ্রাম। বাড়িটা তৈরী করতে এত দেরি হয়ে গেল যে ইতিমধ্যে গাঁ হয়ে গেল শ্মশান, লোকজন উঠে অন্যত্র চলে গেল, আর সেই সময় তোমাদের বাড়ির গাঁথুনিও শেষ হ'ল। কার দোষ দেবে?

তারপরে ভণ্ডুলমামার আর কোন সংবাদ রাখিনি অনেক কাল। বছর-তিনেক আগে একবার মেজমামা চেঞ্জে গিয়েছিলেন দেওঘরে। পূজোর ছুটিতে আমিও সেখানে যাই। তাঁর মুখেই শুনলাম ভণ্ডুলমামা সেই শ্রাবণেই মারা গিয়েছেন। অসুখ-বিসুখ হয়ে ক'দিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কেউ

বিশেষ দেখাশুনা করেনি, আর আছেই বা কে গাঁয়ে যে দেখবে? এ অবস্থায় ঘরের মধ্যে ম'রে পড়েছিলেন, দু-তিন দিন পরে সবাই টের পায়, তখন ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হ'ল। ভণ্ডুলমামার এইখানেই শেষ।

এর পর আমি আর কখনও মামার বাড়ির গ্রামে যাইনি, হয়ত আর কোন দিন যাবও না, বাড়িটাও আর দেখিনি, কিন্তু জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত যে বাড়িটা গাঁথা হ'তে দেখেছি, সেটা আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে আছে। আমার কল্পনায় দেশের মামার বাড়ির গ্রামের, একগলা বনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভণ্ডুলমামার বাড়িটা একটা কায়াহীন, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে...সেই গাছ-গজানো উঠোনটাতে ঢোক্‌বার পথ বনে ঢাকা, দরজা জানালার কপাট নেই, থামে থামে কাঠ-থামাল পর্য্যন্ত গাঁথা হয়েছে!...

আমার জীবনের সঙ্গে ভণ্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কি ক'রে ঘটল, সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা সাধারণ জিনিষ কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড় বড় ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েছে!

বিশেষ ক'রে এই সব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়ে এইজন্যে, যে পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি।

* * * *

অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এল।

কনেদেখা

সকাল বেলা বৈঠকখানার গাছপালার হাটে ঘুরছিলাম।

গতমাসে হাটে কতকগুলি গোলাপের কলম কিনেছিলাম, তার মধ্যে বেশীর ভাগ পোকা লেগে নষ্ট হয়ে গেছে। নার্সারির লোক আমার জানাশুনো, তাদের বল্লাম,—কি রকম কলম দিয়েছিলে হে! সে যে টবে বসাতে দেরী সইল না! তা ছাড়া আবদুল কাদের বলে বিক্রী করলে, এখন সবাই বল্‌চে

আবহুল কাদের নয়, ও অত্যন্ত মামুলি জাতের টী রোজ্। ব্যাপার কি তোমাদের?

নার্সারির পুরোনো লোকটাই আজ আছে। সেদিন এ ছিল না, তাই ঠকেছিলাম। এই লোকটা খুব অপ্রতিভ হলো। বল্লে—বাবু, এই হয়েছে কি জানেন? বাগানের মালিকেরা আজকাল আছেন কল্‌কাতায়। আমি একা সবদিক দেখ্‌তে পারিনে, ঠিকে উড়ে মালী নিয়ে হয়েচে কাজ। তাদের বিশ্বাস কল্লে চলে না, আবার না কল্লেও চলে না। আমি তো সবদিন হাট সাম্‌লাতে পারিনে বাবু! ওদেরই ধরে পাঠাতে হয়, আমি শুনেছিলাম টী রোজ তিন ডজন, আমি তো তার কাছ থেকে টী রোজেরই দাম নোবো? এখানে এসে যদি আবহুল কাদের বলে বিক্রী করে, তো তারই লাভ। বাড়তি পয়সা আমার নয়, তার। বুঝ্‌লেন না বাবু?

বাজার খুব জেঁকেছে। বর্ষার নওয়ালির মুখ, নানা ধরণের গাছের আমদানী হয়েচে। বড় বড় বিলিতি দোপাটি, মতিয়া, বেল, অতশীলতা, রাস্তার ধারের সারিতে নানা ধরণের পাম্, ছোট ছোট পাম্ থেকে ফ্যান্ পাম্ ও বড় টবে ভাল এরিকা পামও আছে। সূর্য্যমুখীর যদিও এ সময় নয়, কিন্তু সূর্য্যমুখী এসেছে অনেক। তা ছাড়া কল্‌কাতার রাস্তায় অনভিজ্ঞ লোকদের কাছে অর্কিড্ বলে যা বিক্রী হয়, সেই নারকোলের ছোব্‌ড়া ও তার বাঁধা ফার্ন ও রঙীন আগাছা যথেষ্ট বিক্রী হচ্চে। লোকের ভিড়ও বেশ।

হঠাৎ দেখি আমার অনেকদিন আগেকার পুরোনো রুমমেট্ হিমাংশু। ৭।৩ নং কানাই সরকারের লেনের মেসে তার সঙ্গে অনেকদিন একঘরে কাটিয়েছি। সে আজ সাত আট বছর আগেকার কথা—তারপর সে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আর তার কোনো খবর রাখিনি আজকাল।

—এই যে হিমাংশু? চিন্‌তে পারো?

হিমাংশু চম্‌কে পেছন ফিরে চাইলে এবং কয়েক সেকেণ্ড সবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌বার পরে সে আমায় চিন্‌লে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল হাসিমুখে।

—আরে জগদীশবাবু যে! তারপর! ওঃ আপনার সঙ্গে একযুগ পরে—ওঃ! তারপর আছেন কেমন বলুন!

আমি বল্লাম—তোমার গাছপালার সখ দেখচি আছে হিমাংশু, সেই মনে আছে দুজনে কতদিন এখানে হাটে আস্‌তাম?

হিমাংশু হেসে বল্লে—তা আর মনে নেই? সেই আপনি দার্জ্জিলিংয়ের লিলি কিন্‌লেন? আপনার তো খুব সখ ছিল লিলির। এখনও আছে? আসুন, আসুন, অন্য কোথাও গিয়ে একটু বসি। ও মেসটার কোনো খবর আর রাখেন নাকি? আচ্ছা সেই অনাদিবাবু কোথায় গেল খোঁজ রাখেন? আর সেই যে মেয়েটী ষ্টোভ জ্বালাতে গিয়ে গা হাত পা পুড়িয়ে ফেল্লে মনে আছে? তার বিয়ে হয়েচে?

দুজনে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। এ গল্প ও গল্প—নানা পুরোনো দিনের কথা। তার কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝলাম সে কলকাতায় এসেচে অনেক দিন পরে।

জিজ্ঞেস কল্লাম—আজকাল কোথায় থাকো হিমাংশু?

সে বল্লে—বি, এন আর-এর একটি ষ্টেশনে বুকিং ক্লার্ক ছিলাম। টাটা নগরের ও দিকে কিছু দিন থাকবার পর দেখলাম জায়গাটার মাটীতে ভারী চমৎকার ফুল জন্মায়, জমিও সস্তা। সেখানে এখন আছি—ফুলের বাগান করেচি—তুমি তো জানো বাগানের সখ আমার চিরকাল। কিছু চাষ বাসের জমি নিয়েচি—তাতেই চলে যায়। কিন্তু সে সব কথা থাক—আজ এখন একটা গল্প করি শোনো। গল্পের মত শোনাবে, কিন্তু আসলে সত্যি ঘটনা। আর আশ্চর্য্য এই, দশবছর আগে যখন তোমাদের মেসে থাকতাম তখন এ গল্পের সুরু, এবং এর সমাপ্তি ঘটেচে গতকাল। আমি বল্লাম—ব্যাপার কি, তোমার কথা শুনে মনে হচ্চে নিশ্চয়ই প্রেমের কাহিনী জড়ানো আছে এর সঙ্গে। বলো বলো—সে বল্লে—না, সে সব নয়। অন্য এক ব্যাপার, কিন্তু আমার পক্ষে কোনও প্রণয়কাহিনীর চেয়ে তা কম মধুর নয়। শোনো বলি। আচ্ছা তোমার মনে আছে—মেসে থাকৃতে আমি একটা এরিকা পাম্‌ কিনেছিলাম, আমাদের ঘরের সাম্‌নে টবে বসানো ছিল মনে আছে? আচ্ছা তা হোলে শোনো।

তারপর আধঘণ্টা বসে হিমাংশু তার গল্পটা বলে গেল। আমরা আরও দুবার চা খেলাম, এক বাক্স সিগারেট্‌ পোড়ালাম। বৌবাজারের মোড়ে গির্জ্জার ঘড়িটায় সাড়ে নটা যখন বাজ্‌ল, তখন হিমাংশু গল্প শেষ করে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

তার গল্পটা আমি আমার নিজের কথায় বল্‌বো, কেননা হিমাংশু সম্বন্ধে

কিছু জানা থাকা দরকার, গল্পটা ঠিক বুঝ্‌তে হোলে সেটা আমাকে গোড়াতেই বলে দিতে হবে।

হিমাংশু যখন আমার সঙ্গে থাকতো, তখন তার চালচলন দেখলে মনে হবার কথা যে, সে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। সে যে আহার বিহারে বা 'বেশভূষায় খুব বেশী সৌখীন ছিল তা নয়, তার সখ ছিল নানা ধরণের এবং এই সখের পেছনে সে পয়সা ব্যয় করতো নিতান্তই বে-আন্দাজী।

তার প্রধান সখ ছিল গাছপালার ও ফুলের। আমার ফুলের সখটা হিমাংশুর কাছ থেকেই পাওয়া একথা বল্‌তে আমার কোনো লজ্জা নেই। কারণ যত তুচ্ছ, যত অকিঞ্চিৎকর জিনিসই হোক না কেন, যেখানে সত্যি কোনো আগ্রহ বা ভালবাসার সন্ধান পাওয়া যায়—তাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

হিমাংশুর গাছপালার ওপর ভালবাসা ছিল সত্যিকার জিনিস। সে ভালো খেতো না, ভাল কাপড় জামা কখনো দেখিনি তার গায়ে—কিন্তু এ ধরণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তার কাম্যও ছিল না। তার পয়সার .সচ্ছলতা ছিল না কখনো, টুইশানি করে দিন চালাতো, তাও আবার সব সময় জুট্‌তো না, তখন বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার করতো। যখন ধারও মিল্‌তো না তখন দিনকতক চন্দননগরে এক মাসীর বাড়ি গিয়ে মাস খানেক, মাস দুই কাটিয়ে আস্‌তো। কিন্তু পয়সা হাতে হোলে কাপড় জামা না কিনুক্, খাওয়া দাওয়ায় ব্যয় করুক্ না করুক্, ভালো গাছপালা দেখলে কিন্‌বেই।

মেসে আমাদের ঘরের সাম্‌নে ছোট একটা অপরিসর বারান্দাতে সে তার গাছপালার টবগুলো রাখতো। গোলাপের ওপর তার তত ঝোঁক ছিল না, সে ভালবাসতো নানা জাতীয় পাম্—বিশেষ করে বড় জাতীয় পাম্—আর ভালবাসতো দেশী বিদেশী লতা—উইস্টারিয়া, অতসী, মাধবীলতা, বোগেন্‌ভিলিয়া ইত্যাদি। কত পয়সাই যে এদের পেছনে খরচ করেছে!

সকালে উঠে ওর কাজই ছিল গাছের পাট করতে বসা। শুক্‌নো ডালপালা ভেঙ্গে দিচ্ছে, গাছ ছেঁটে দিচ্ছে, এ টবের্ মাটি ও টবে ঢাল্‌চে। পুরোনো টব ফেলে দিয়ে নতুন টবে গাছ বসাচ্চে, মাটী বদ্‌লাচ্চে। আবার মাঝে মাঝে মাটীর সঙ্গে নানা রকমের সার মিশিয়ে পরীক্ষা করত। এ সব সম্বন্ধে ইংরিজি বাংলা নানা বই কিন্‌তো—একবার কি একটা উপায়ে ও একই লতায় নীল-কলমী ও শাদাকলমী ফোটালে। ভায়োলেটের ছিট্ ছিট্ দেওয়া অতসী অনেক

কষ্টে তৈরী করেছিল। বেগুণী রংএর ক্রাইসেন্থিমামের জন্যে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছিল, সুবিধে হয়নি।

তাছাড়া ও ধরণের মানুষ আমি খুব বেশী দেখিনি, যে একটা খেয়াল বা সখের পেছনে সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিতে পারে। মানুষের মনের শক্তির সে একটা বড় পরিচয়। হিমাংশু বল্‌তো—সেদিন একটা পাড়াগাঁয়ে একজনদের বাড়ি গিয়েচি, বুঝলেন?...তাদের গোলার কাছে তিন বছরের পুরোনো নারকেল গাছ হয়ে আছে। সে যে কি সুন্দর দেখাচ্চে! একটা প্রকাণ্ড তাজা, সতেজ, সবুজ পাম্। সমুদ্রের ধারে নাকি নারকেলের বন আছে—পাম্-এর সৌন্দর্য্য দেখতে হোলে সেখানে যেতে হয়।

হিমাংশু প্রায়ই পাম্ আর অর্কিড দেখতে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতো। আর এসে তাদের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করতো।

একবার সে একটা এরিকা পাম্ কিনে আন্‌লে। খুব ছোট নয়, মাঝারী গোছের মাটীর টবে বসানো—কিন্তু এমন সুন্দর, এমন সতেজ গাছ বাজারে সাধারণতঃ দেখা যায় না। সে সন্ধান করে করে দম্‌দমায় কোন বাগানের মালীকে ঘুস্ দিয়ে সেখান থেকে কেনে। কল্‌কাতার মেসের বারান্দায় গাছ বাঁচিয়ে রাখা যে কত শক্ত কাজ, যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সহজেই বুঝতে পার্‌বেন। গোবি মরুভূমিতে গাছ বাঁচিয়ে রাখা এর চেয়ে সহজ। একবার সে আর আমি দিন কুড়ি বাইশের জন্যে কল্‌কাতার বাইরে যাই, চাকরকে আগাম পর্য্যন্ত হিমাংশু দিয়ে গেল গাছে জল দেওয়ার জন্যে, ফিরে এসে দেখা গেল ছ'সাতটা ফ্যান পাম্ শুকিয়ে পাখা হয়ে গেছে।

সকালে বিকালে হিমাংশু বাল্‌তি বাল্‌তি জল টান্‌তো একতালা থেকে তেতলায় টবে দেবার জন্যে। গাছ বাড়চে না কেন এর কারণ অনুসন্ধান করতে তার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। অন্য সব গাছের চেয়ে কিন্তু ওই এরিকা পাম্ গাছটার ওপর তার মায়া ছিল বেশী, তার খাতা ছিল—তাতে লেখা থাক্‌তো কোন্ কোন্ মাসে কত তারিখে গাছটা নতুন ডাল ছাড়লে। গাছটাও হয়ে পড়ল প্রকাণ্ড, মাটির টব বদলে তাকে পিপেকাটা কাঠের টবে বসাতে হোল। মেসের বারান্দা থেকে নামিয়ে একতালায় উঠোনে বসাতে হোল। এ সবে লাগলো বছর পাঁচ ছয়।

সেবার বাড়ীওয়ালার সঙ্গে বনিবনাও না হোতে আমাদের মেস্ ভেঙে গেল।

দুজনে আর একত্র থাকবার সুবিধে হোল না, আমি চলে গেলাম ভবানীপুরে। হিমাংশু গিয়ে উঠ্‌ল শ্যামবাজারে আর একটা মেসে। একদিন আমায় এসে বিমর্ষ মুখে বল্লে—কি করি জগদীশবাবু, ও মেসে আমার টবগুলো রাখবার জায়গা হচ্ছে না—অন্য অন্য টবের না হয় কিনারা করতে পারি, কিন্তু সেই এরিকা পামটা সেখানে রাখা একেবারে অসম্ভব। একটা পরামর্শ দিতে পারেন? অনেকগুলো মেস্ দেখ্‌লাম, অত বড় গাছ রাখার সুবিধে কোথাও হয় না। আর টানাটানির খরচাও বড় বেশী।

আমি তাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারিনি বা তারপর থেকে আমার সঙ্গে সেই থেকে আজকার দিনটি ছাড়া আর কোনোদিন দেখাও হয় নি।

বাকীটা হিমাংশুর মুখে আজই শুনেচি।

কোনো উপায় না দেখে হিমাংশু শেষে কোন্ বন্ধুর পরামর্শে ধর্ম্মতলার এক নীলামওয়ালার কাছে এরিকা পামের টবটা রেখে দেয়। রোজ একবার করে গিয়ে দেখে আস্‌তো, খদ্দের পাওয়া গেল কিনা। শুধু যে খদ্দেরের সন্ধানে যেতো তা নয়, ওটা তার একটা ওজুহাত মাত্র—আসলে যেত গাছটা দেখ্‌তে।

হিমাংশু কিন্তু নিজের কাছে সেটা স্বীকার করতে চাইত না। দু'দিন পরে যা পরের হয়ে যাবে তার জন্যে মায়া কিসের?

তবুও একদিন যখন গিয়ে দেখ্‌লে, গাছটার সে নধর, সতেজ শ্রী যেন ম্লান হয়ে এসেচে, নীলামওয়ালারা গাছে জল দেয় নি, তেমন যত্ন করে নি—সে লজ্জিত মুখে দোকানের মালিক একজন ফিরিঙ্গি ছোক্‌রাকে বল্লে—গাছটার তেমন তেজ নেই—এই গরমে জল না পেলে, দেখ্‌তে ভাল না দেখালে বিক্রী হবে কেন? জল কোথায় আছে আমি নিজে না হয়—কারণ দু'পয়সা আসে, আমারই তো আসবে—

তারপর থেকে যেন পয়সার জন্যেই করচে, এই অছিলায় রোজ বিকেলে নীলামওয়ালার দোকানে গিয়ে গাছে জল দিত। এক একদিন দেখ্‌তো দোকানের চাকরেরা আগে থেকেই জল দিয়েচে।

রোজ নীলামের ডাকের সময় সে সেখানে উপস্থিত থাকতো। তার গাছটার দিকে চেয়েও দেখে না—লোকে চেয়ার, টেবিল সোফা, আলমারী কিনচে, ভাঙ্গা পুরোণো ক্লক্ ঘড়ী পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল, কিন্তু গাছের সখ খুব বেশী লোকের নেই, গাছটা আর বিক্রী হয় না। একদিন নীলামওয়ালা বল্লে—বাবু, গাছটার তো সুবিধে হচ্ছে না, তুমি ফেরৎ নিয়ে যাবে?

কিন্তু ফেরৎ নিয়ে গিয়ে তার রাখ্‌বার জায়গা নেই, থাক্‌লে এখানে সে বিক্রীর জন্যে দিয়েই বা যাবে কেন? সে সময় তার অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্চে, চাকুরীর চেষ্টায় আকাশ পাতাল হাতড়েও কোথাও কিছু মিল্‌চে না— নিজের থাকবার জায়গা নেই তো পিপে-কাটা কাঠের টবে বসানো অত বড় গাছ রাখে কোথায়?

মাস খানেক পরে হিমাংশুর অবস্থা এমন হোল যে আর কল্‌কাতায় থাকাই চলে না। কল্‌কাতার বাইরে যাবার আগে গাছটার একটা কিনারা হ'য়ে গেলে ও মনে শান্তি পেত। কিন্তু আজও যা, কালও তাই—নীলামওয়ালাকে কমিশনের রেট্ আরও বাড়িয়ে দিতে হয়েচে গাছটা রাখ্‌বার জন্য, নৈলে সে দোকানে রাখ্‌তে চায় না। কিন্তু হিমাংশুর দুর্ভাবনা এই যে, ও কল্‌কাতা ছেড়ে চলে গেলে গাছটার আর যত্ন হবে না, নীলামওয়ালার দায় পড়েচে, কোথাকার একটা এরিকা পাম্ গাছ বাঁচ্‌ল কি মোলো—অত তদারক করবার তার গরজ নেই।

কিন্তু শেষে বাধ্য হয়ে কল্‌কাতা ছাড়তে হোল হিমাংশুকে।

অনেকদিন পরে সে আবার এল কল্‌কাতায়। নীলামওয়ালার দোকানে বিকেলে গেল গাছ দেখ্‌তে। গাছটা নেই, বিক্রী হয়ে গিয়েচে সাড়ে সাত টাকায়। কমিশন বাদ দিয়ে হিমাংশুর বিশেষ কিছু রৈল না। কিন্তু টাকার জন্যে ওর তত দুঃখ নেই, এত দিন পরে সত্যি সত্যিই গাছটা পরের হয়ে গেল।

তার প্রবল আগ্রহ হোল গাছটা একবার সে দেখে আসে। নীলামওয়ালা সাহেব প্রথমে ঠিকানা দিতে রাজী নয়, নানা আপত্তি তুল্‌লে—বহু কষ্টে তাকে বুঝিয়ে ঠিকানা যোগাড় করলে। সার্কুলার রোডের এক সাহেবের বাড়ীতে গাছটা বিক্রী হয়েচে, হিমাংশু পরদিন সকালে সেখানে গেল। সার্কুলার রোডের ধারেই বাড়ী, ছোট গেট্‌ওয়ালা কম্পাউণ্ড, উঠোনের একধারে একটী বাতাবী নেবু গাছ, গেটের কাছে একটা চারা পাকুড় গাছ। সাহেবের গাছপালার সখ আছে—পাম্ অনেক রকম রেখেছে, তার মধ্যে ওর পাম্‌টাই সকলের বড়। হিমাংশু বলে, সে হাজারটা টবের হাজারটা পামের মধ্যে নিজেরটা চিনে নিতে পারে। কম্পাউণ্ডে ঢুকবার দরকার হোল না, রাস্তার ফুটপাথ থেকেই বেশ দেখা যায়, বারান্দায় উঠ্‌বার পৈঠার ধারেই তার পিপে-কাটা টবশুদ্ধ পাম্‌গাছটা বসানো রয়েচে। গাছের চেহারা ভালো—তবে তার কাছে থাকবার সময় আরও বেশী সতেজ, সবুজ ছিল।

হিমাংশুর মনে পড়ল এই গাছটার কবে কোন্ ডাল গজালো—তার খাতায় নোট করা থাক্‌তো। ও বল্‌তে পারে প্রত্যেকটী ডালের জন্মকাহিনী—একদিন তাই ওর মনে ভারী কষ্ট হোল, যেদিন দেখলে সাহেবের মালী নীচের দিকের ডালগুলো সব কেটে দিয়েচে। মালীকে ডাকিয়ে বল্লে—ডালগুলো ওরকম কেটেচ কেন? মালীটা ভাল মানুষ। বল্লে—আমি কাটিনি বাবু, সাহেব বলে দিল নীচের ডাল না কাট্‌লে ওপরে কচি ডাল জোর পাবে না। বল্লে, টবের গাছ না হোলে ও ডালগুলো আপনা থেকেই ঝরে পড়ে যেতো।

হিমাংশু বল্লে—তোমার সাহেব কিছু জানে না। যা ঝরে যাবার তা তো গিয়েচে, অত বড় গুঁড়িটা বার হয়েচে তবে কি করে? আর ভেঙো না।

বছর তিন চার কেটে গেল। হিমাংশু গাছের কথা ভুলেচে। সে গালুডি না ঘাটশিলা ওদিকে কোথায় জমি নিয়ে বসবাস করে ফেলেচে ইতিমধ্যে।

গাছপালার মধ্যে দিয়েই ভগবান্ তার উপজীবিকার উপায় করে দিলেন। এখানে হিমাংশু ফুলের চাষ আরম্ভ করে দিলে সুবর্ণরেখার তীরে। মাটীর দেওয়াল তুলে খড়ের বাংলা বাঁধলে। একদিকে দূরে অনুচ্চ পাহাড়, নিকটে, দূরে শালবন, কাঁকর মাটীর লাল রাস্তা, অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত।

ফুলের চাষে সে উন্নতি করে ফেল্লে শীগ্‌গীর। ফুলের চেয়েও বেশী উন্নতি করেচে চীনা ঘাস ও ল্যাভেণ্ডার ঘাসের চাষে। এই জীবনই তার চিরদিনের কাম্য ছিল, ও জায়গা ছাড়া সহরে আসতে ইচ্ছেও হোত না। বছর দুই কাট্‌লো আরও, ইতিমধ্যে সে বিবাহ করেচে, সস্ত্রীক ওখানেই থাকে।

আজ তিন দিন হোল সে কল্‌কাতায় এসেচে প্রায় পাঁচ ছ' বছর পরে।

কাজকর্ম্ম সেরে কেমন একটা ইচ্ছে হোল, ভাবলে—দেখি তো সেই সাহেবের বাড়ীতে আমার সেই গাছটা আছে কি না?

বাড়ীটা চিনে নিতে কষ্ট হোল না কিন্তু অবাক্ হয়ে গেল, বাড়ীর সে শ্রী আর নেই। বাড়ীটাতে বোধ হয় মানুষ বাস করেনি বছর দুই—কি তারও বেশী। উঠোনে বন হয়ে গিয়েচে। পৈঠাগুলো ভাঙা, বাতাবী নেবু গাছে মাকড়সার জাল, বারান্দার রেলিংগুলো খসে পড়চে। তার সেই এরিকা পাম্‌টা আছে, কিন্তু কি চেহারাই হয়েচে। আরও বড় হয়েচে বটে কিন্তু সে তেজ নেই, শ্রী নেই, নীচের ডালগুলো শুকিয়ে পাখা হয়ে আছে, ধুলো আর মাকড়সার জালে ভর্ত্তি। যায় যায় অবস্থা। টবও বদ্‌লানো হয়নি আর।

হিমাংশু বল্লে—ভাই সত্যি সত্যি তোমায় বল্‌চি, গাছটা যেন আমায় চিন্‌তে পার্‌লে। আমার মনে হলো ও যেন বল্‌চে, আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে গেলে হয় তো এখনও বাঁচ্‌বো। ছেড়ে যেও না এবার। আমায় বাঁচাও।

রাত্রে হিমাংশুর ভালো ঘুম হল না। আবার সার্কুলার রোডে গেল, সন্ধান নিয়ে জানলে সাহেব মারা গিয়েচে। বুড়ী মেম আছে ইলিয়ট রোডে, পয়সার অভাবে বাড়ী সারাতে পারে না, তাই ভাড়াও হচ্চে না। এই বাজারে ভাঙা বাড়ী কেনার খদ্দেরও নেই।

মেমকে টাকা দিয়ে গাছটা ও কিনে নিলে। গাছটা এখনও সারকুলার রোডের বাড়ীটাতেই আছে, কাল ও গালুডিতে ফিরে যাবে, গাছটাকে নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে করে।

বিদায় নেবার সময় হিমাংশু বল্লে—বৈঠকখানা বাজারে এসেছিলাম কেন জানো? আমার সাধ হয়েছে ওর বিয়ে দেবো। তাই একটা ছোট খাটো, অল্প বয়সের, দেখ্‌তে ভালো পাম্ খুঁজছিলাম। হি—হি—পাগল নয়, ভালবাসার জিনিষ হোত তো বুঝতে।

মেঘ-মল্লার

দশ পারমিতার মন্দিরে সেদিন যখন সাপুড়ের খেলা দেখবার জন্য অনেক মেয়েপুরুষ মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল, তারই মধ্যে প্রদ্যুম্ন প্রথমে লোকটিকে দেখে।

সেদিন ছিল জৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। চারি পাশের গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছিল দশ পারমিতার পূজা দিতে। সেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে গায়ক বাজিকর মন্দিরে একত্র হয়েছিল; অনেক মালাকর নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ফুলের গহনা গ'ড়ে মেয়েদের কাছে বেচবার জন্য এনেছিল; একজন শ্রেষ্ঠী মগধ থেকে দামী দামী রেশমী শাড়ী বেচবার জন্য এনেছিল। তারই দোকানে ছিল সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। প্রদ্যুম্ন শুনেছিল, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির উৎসব

উপলক্ষে পারমিতার মন্দিরে একজন বিখ্যাত গায়ক ও বীণ্‌ বাজিয়ে আসবেন। সে মন্দিরে গিয়েছিল তাঁরই সন্ধানে। সমস্ত দিন ধ'রে খুঁজেও কিন্তু প্রদ্যুম্ন তাঁকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার করতে পারেনি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মন্দিরের উঠানে একজন সাপুড়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ করলে, আর তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয়া মেয়ে জমে গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হয়ে উঠল। প্রদ্যুম্নও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মন সাপখেলার দিকে আদৌ ছিল না। সে ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক পুরুষমানুষকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল যদি চেহারায় ও হাবভাবে বীণ্‌-বাজিয়ে ধরা পড়েন। অনেকক্ষণ ধ'রে দেখবার পর তার চোখে পড়ল একজন প্রৌঢ় ভিড়ের মধ্যে তার দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরণে অতি মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ। কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের মনে হল, এই সেই গায়ক। প্রদ্যুম্ন লোক ঠেলে তাঁর কাছে যাবার উদ্যোগ করতে তিনি হাত উঁচু ক'রে প্রদ্যুম্নকে ভিড়ের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

বাইরে আসতে প্রৌঢ় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন...আমি অবন্তীর গাইয়ে সুরদাস, তুমি আমাকে খুঁজছিলে না?

প্রদ্যুম্ন একটু আশ্চর্য্য হল। তার মনের কথা ইনি জানলেন কি ক'রে?

প্রদ্যুম্ন সসম্ভ্রমে জানালে, হ্যাঁ, সে তাঁকেই খুঁজছিল বটে।

প্রৌঢ় বললেন—তুমি আমার অপরিচিত নও। তোমার পিতার সঙ্গে একসময় আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। আমি কাশী গেলেই তোমার পিতার সঙ্গে দেখা না ক'রে আসতাম না। তোমাকেও ছেলেবেলায় দেখেছি, তোমার বয়স তখন খুব কম।

—আপনি এখানে এসে কোথায় আছেন?

—নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে, জান?

—হ্যাঁ, জানি। ওখানে একজন সন্ন্যাসী পূর্ব্বে থাকতেন না?

—তিনি এখনও ওখানেই আছেন। তুমি যে-কোন একদিন গিয়ে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করো। তুমি এখানে কোথায় থাক?

—এখানকার বিহারে পড়ি, তিন বছর আছি। আপনি মন্দিরে কতদিন থাকবেন?

—সে তোমাকে বলব। তুমি এরই মধ্যে একদিন যেও।

প্রদ্যুম্ন প্রণাম করে বিদায় নিল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি; মন্দিরটা যে ছোট পাহাড়ের উপর ছিল, তারই দুপাশের ঢালু রাস্তা বেয়ে মেয়েরা উৎসব থেকে বাড়ী ফিরছিল। প্রদ্যুম্নের চোখ যেন কার সন্ধানে একবার মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ইতস্ততঃ ধাবিত হল, পরেই সে আবার তাদের পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল। আচার্য্য শীলব্রত অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ, একেই তিনি প্রদ্যুম্নের মধ্যে অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে বেশী চঞ্চলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে তাকে একটু বেশী শাসনের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেন—তার উপরে সে রাত ক'রে বিহারে ফিরলে কি আর রক্ষা থাকবে?

বাঁক ফিরতেই বাঁ পাশের পাহাড়ের আড়ালটা সরে গেল। সেখানে সেদিকটা ছিল খোলা। প্রদ্যুম্ন দেখলে দূরে নদীর ধারে মন্দিরটার চূড়া দেখা যাচ্ছে। চূড়ার মাথার উপরকার ছায়াচ্ছন্ন আকাশ বেয়ে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা পাখীর দল ডানা মেলে বাসায় ফিরছিল। আরও দূরে একখানা শাদা মেঘের প্রান্ত পশ্চিমদিকের পড়ন্ত রোদে সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে আসছিল, চারিধারে তার শীতোজ্জ্বল মেঘের কাঁচুলি হাল্‌কা করে টানা।

হঠাৎ পিছন থেকে প্রদ্যুম্নের কাপড় ধ'রে কে ঈষৎ টানলে।

প্রদ্যুম্ন পিছন ফিরে চাইতেই যে কাপড় ধ'রে টেনেছিল তার চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে কিশোরী, তার দোলন-চাঁপা রংএর ছিপ-ছিপে দেহটি বেড়ে' নীল শাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা। নতুন কেনা একছড়া ফুলের মালা তার খোঁপাটিতে জড়ান।

প্রদ্যুম্ন বিস্ময়ের সুরে ব'লে উঠল—কখন তুমি এসেছিলে, সুনন্দা! আমি তোমাকে এত খুঁজলাম, কৈ দেখতে পেলাম না ত?

প্রথমটা কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তারপর সে একটু অভিমানের সুরে বললে—আমাকেই খুঁজতে যেন এখানে এসেছিলে আর কি? যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকরদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরছিলে, সে আর আমি দেখিনি?

—সত্যি বলছি সুনন্দা, তোমাকেও খুঁজেছি। নামবার সময় খুঁজেছি, এর আগেও খুঁজেছি; তুমি কাদের সঙ্গে এলে?

এমন সময় দেখা গেল একদল মেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে সেই পথে নেমে

আস্‌ছে। সুনন্দার সেদিকে চোখ পড়তেই সে তখনি হঠাৎ প্রদ্যুম্নকে পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল।

পিছনেই একদল অপরিচিতা মেয়ে, এ অবস্থায় আর সুনন্দার অনুসরণ করা সঙ্গত হবে না ভেবে সে প্রথমটা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর হতাশা মেশানো ক্রোধে ঘাড় উঁচু ক'রে সে সদর্পে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলতে লাগল।

সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারটাই তরল হতে তরলতর হতে হতে হঠাৎ কখন জ্যোৎস্নায় পরিণত হয়েছে, অন্যমনস্ক প্রদ্যুম্ন তা মোটেই লক্ষ্য করেনি। যখন তার চমক ভাঙল, তখন পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্না পথ-ঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। দূর মাঠের গাছপালা জোৎস্নায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছিল। পড়াশুনা তার হয় কি করে? আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধন ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে তাকে ভৎর্সনা করলেই বা কি করা যাবে? এ রকম রাত্রে যে যুগেযুগের বিরহীদের মনোবেদনা তার প্রাণের মধ্যে জমে উঠে, তার অবাধ্য মন যে এই সব পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না রাত্রে মহাকোটঠি বিহারের পাষাণ অলিন্দে মানস সুন্দরীদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায় এর জন্যে সেই কি দায়ী!

দশপারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধ্বনি তখনও মিলিয়ে যায়নি, দূরে নদীর বাঁকের ভাঙা মন্দিরে ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল, উৎসব প্রত্যাগত নর-নারীর দল জ্যোৎস্না ভরা মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রদ্যুম্নের গতি আরো দ্রুত হল।

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে প্রদ্যুম্নের মনে হল গাছের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে—আর একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের হাল্কা মিষ্টি হাসির ঢেউয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল,—দেখলে গাছতলায় সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিকে জ্যোৎস্নার আলো প'ড়ে তার সর্ব্বাঙ্গে আলো আঁধারের জাল বুনেছে। প্রদ্যুম্ন চাইতেই সুনন্দা ঘাড় দুলিয়ে ব'লে উঠল—আর একটু হলেই বেশ হত! গাছের তলা দিয়ে চ'লে যেতে অথচ আমায় দেখতে পেতে না!

সুনন্দাকে দেখে প্রদ্যুম্ন মনে মনে ভারি খুসী হল, মুখে বললে—নাঃ তা আর দেখব কেন? ভারি ব্যাপারটা হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে! আর না দেখতে পেলেই বা কি? আমি তোমার ওপর ভারি রাগ করেছি, সুনন্দা, সত্যি বল্‌ছি।

সুনন্দা বললে—দোষ করলেন নিজে আবার রাগও করলেন নিজে। সেদিন কি কথা বলেছিলে মনে আছে? তা না যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকর —মাগো! ওদের কাছে যাও কি করে? এমন ময়লা কাপড় পরে! আমি ওদের ত্রিসীমানায় যাইনে।

প্রদ্যুম্ন বল্‌লে—তুমি বড় মানুষের মেয়ে—তোমার কথাই আলাদা—কিন্তু কথাটা কি ছিল বলছিলে?

সুনন্দা বললে—যাও! আর মিথ্যে ভাণে দরকার নেই। কি কথা মনে করে দেখ। সেই সেদিন বললে না?

প্রদ্যুম্ন একটুখানি ভেবে ব'লে উঠল—বুঝতে পেরেছি. সেই বাঁশী?

সুনন্দা অভিমানের সুরে বললে—ভেবে দেখ বলেছিলে কি না। আমি দুপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে ব'সে আছি! একে ত এলেন বেলা ক'রে, তার ওপর—যাও।

প্রদ্যুম্ন এবার হেসে উঠল। বললে—আচ্ছা সুনন্দা, যদি তুমি আমায় দেখতেই পেয়েছিলে ত আমায় ডাকলে না কেন?

সুনন্দা বললে—আমি কি একা ছিলাম? দুপুর বেলায় আমি একা এসেছিলাম বটে, কিন্তু তখন ত আর তুমি আসনি? তার পর আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা সব যে এল। কি ক'রে ডাকব?

প্রদ্যুম্ন বললে—আচ্ছা ধ'রে নিলাম আমার দোষ হয়েছে, তবে তুমি যে বার বার সাপুড়ে আর বাজিকরদের কথা বলচ সুনন্দা,—সাপুড়ে আর বাজিকরদের আমি খুঁজিনি। শুনেছিলাম অবন্তী থেকে একজন বড় বীণ বাজিয়ে আসবেন; তুমি ত জানো, আমার অনেক দিন থেকে বীণ শেখবার বড় ইচ্ছা। তাই তাঁর সন্ধানে ঘুরছিলাম, তাঁর দেখাও পেয়েছি। তিনি এখানকার নদীর ধারের দেউলে থাকেন। ভালো কথা—তোমার বাবা কোথায়?

সুনন্দা বললে—বাবা তিন চার দিন হল কৌশাম্বী গিয়েছেন মহারাজের ডাকে।

প্রদ্যুম্ন হঠাৎ খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বললে—ওহো তাই! নইলে আমি ভাবচি এত রাত পর্য্যন্ত সুনন্দা কি—

সুনন্দা তাড়াতাড়ি প্রদ্যুম্নের মুখে নিজের হাতদুটি চাপা দিয়ে লজ্জিত মুখে বললে—চুপ চুপ তোমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? এখুনি যে সব আরতি দেখে লোক ফিরবে!

প্রদ্যুম্ন হাসি থামিয়ে বললে—এবার কিন্তু তোমার বাবা এলে ব'লে দেব নিশ্চয়—

সুনন্দা রাগের সুরে বললে—দিও ব'লে। এমনি আমি মন্দিরে আরতি পর্যন্ত থাকি, তিনি জানেন।

প্রদ্যুম্ন সুনন্দার সুগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহুটি নিজের হাতের মধ্যে বেষ্টন করে নিলে, তার পর বললে—আচ্ছা থাক, বলে দেব না। চল সুনন্দা, তোমায় বাঁশী শোনাই, আমার সঙ্গেই আছে—সত্যি বলচি, তোমায় শোনাবার জন্যেই এনেছিলাম। তবে ওঁকে খুঁজছিলাম, বীণটা ভাল ক'রে শিখব ব'লে।

নদীর ধারে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্ন বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। সে বাঁশী বাজালে বটে কিন্তু সে যেন ভাসা ভাসা। সুরের সঙ্গে তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না। তারা দুজনে নির্জ্জনে আরও কতবার বসেছে, প্রদ্যুম্নের বাঁশী শুনতে সুনন্দা ভালবাসত ব'লে প্রদ্যুম্ন যখনই বিহার থেকে বাইরে আসত, বাঁশীটি সঙ্গে আনত। প্রদ্যুম্নের বাঁশীর অলস স্বপ্নময় সুরের মধ্য দিয়ে কতদিন উভয়ের অজ্ঞাতে রোদভরা মধ্যাহ্ন গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক হ'লে প্রদ্যুম্নের এ রকম নিরুৎসাহ ভাব তো সুনন্দা আর কখনো লক্ষ্য করেনি।

কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের বার বার মনে আসছিল সেই জীর্ণ পরিচ্ছদপরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক সুরদাসের কথা! তাদের বিহারের কলাবিৎ ভিক্ষু বসুব্রতের আঁকা জরার চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম্ম শীর্ণদর্শন! পুরাতন পুঁথির ভূর্জ্জপত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন একটা অপ্রীতিকর মেটে লাল রং!

তার পরদিন সকালে প্রদ্যুম্ন নদীর ধারের ভাঙা মন্দিরে গেল। সেটার দেব-মূর্ত্তি বহুদিন অন্তর্হিত। সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপখোপের বাস। নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা সেদিকে বড়-একটা কেউ আস্‌ত না। একজন আজীবক সন্ন্যাসী আজ প্রায় সাত আট মাস হল সেখানে বাস করছেন। তাঁরই দু'চার জন অনুগত ভক্ত মাঝে মাঝে আসত যেত ব'লে মন্দিরের পথ আজকাল অপেক্ষাকৃত ভাল আছে।

অর্দ্ধ অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে সুরদাসের সাক্ষাৎ হল। সুরদাস প্রদ্যুম্নকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন—চল বাইরে গিয়ে বসি, এখানে বড় অন্ধকার।

বাইরে গিয়ে সুরদাস আলোতে প্রদ্যুম্নের মুখ ভাল ক'রে দেখলেন, তার পর যেন আপন মনে বলতে লাগলেন—হবে, তোমার দ্বারাই হবে! আমি তা জান্‌তাম।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের মূর্ত্তি দূর থেকে দেখে যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিল, তাঁর নিকটে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্নের সে ভাব কেটে গেল। সে লক্ষ্য করলে সুরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হলেও প্রতিভাব্যঞ্জক।

সুরদাস বললে—আমি ভাবছিলাম তুমি আজ আসবে। হাঁ তোমার পিতা ত একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ?

প্রদ্যুম্ন লজ্জিত-মুখে উত্তর দিলে—একটু-আধটু বাঁশী বাজাতে পারি।

সুরদাস উৎসাহের সুরে বললেন—পারা ত উচিত। তোমার বাবাকে জান্‌ত না এমন লোক এদেশে খুব কম আছে। প্রতি উৎসবেই কৌশাম্বী থেকে তোমার বাবার নিমন্ত্রণ পত্র আস্‌ত। হাঁ, আমি শুনেছি তুমি নাকি বাঁশীতে বেশ মেঘ-মল্লার আলাপ করতে পার?

প্রদ্যুম্ন বিনীতভাবে উত্তর দিলে—বিশেষ যে কিছু জানি তা নয়, যা মনে আসে তাই বাজাই, তবে মেঘ-মল্লার মাঝে মাঝে বাজিয়েছি।

সুরদাস বললেন—কই দেখি তুমি কেমন শিখেছ?

বাঁশী সব সময়েই প্রদ্যুম্নের কাছে থাকত। কখন কোন্ সময় সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে বলা যায় না।

প্রদ্যুম্ন বাঁশী বাজাতে লাগল। তার পিতা তাকে বাল্যকালে যত্ন ক'রে রাগ রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া সঙ্গীতে প্রদ্যুম্নের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল। তার আলাপ অতি মধুর হোল। লতাপাতা ফুল ফলের মাঝখান বেয়ে উদার নীল আকাশ আর জ্যোৎস্নারাতের মর্ম্ম ফেটে যে রসধারা বিশ্বে সব সময় ঝরে পড়ছে, তার বাঁশীর গানে সে রস যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠল; সুরদাস বোধ হয় এতটা আশা করেননি, তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—ইন্দ্রদ্যুম্নের ছেলে যে এমন হবে, সেটা বেশী কথা নয়। বুঝতে পেরেছি, তুমিই পারবে, এ আমি আগেও জানতাম।

নিজের প্রশংসাবাদে প্রদ্যুম্নের তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

অন্যান্য দু'এক কথার পর, প্রদ্যুম্ন বিদায় নিতে উদ্যত হ'লে, সুরদাস তাকে বললেন—শোন প্রদ্যুম্ন একটা গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে। তোমাকে একথা বলব ব'লে পূর্ব্বেও আমি তোমাকে খোঁজ করেছিলাম; তোমাকে পে

খুব ভালই হয়েছে। কথাটা তোমাকে বলি, কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, একথা তুমি কারুর কাছে প্রকাশ করবে না;

প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্মিত হল। এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে তার মোটে এক দিনের আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথা ইনি তাকে বলবেন?

সে বললে—কি কথা না শুনে কি ক'রে—

সুরদাস বললে—তুমি ভেবো না, কোনো অনিষ্টজনক ব্যাপার হ'লে আমি তোমাকে বলতাম না।

কি কথা জানবার জন্যে প্রদ্যুম্নের অত্যন্ত কৌতূহলও হল, সে প্রতিজ্ঞা করলে, সুরদাসের কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

সুরদাস গলার স্বর নামিয়ে বলতে লাগলেন—নদীর ঐ বড় বাঁকে যে ঢিবিটা আছে জানো? তার সামনেই বড় মাঠ? ওই ঢিবিটায় বহু প্রাচীন কালে সরস্বতী দেবীর মন্দির ছিল; শুনেছি এদেশের যত বড় বড় গায়ক ছিলেন, শিক্ষা শেষ ক'রে সকলেই ওই মন্দিরে আগে এসে দেবীর পূজা দিয়ে তুষ্ট না ক'রে ব্যবসা আরম্ভ করতেন না। সে অনেক দিনের কথা; তার পর মন্দির ভেঙে চুরে ওই দাঁড়িয়েছে। ঐ ঢিবিতে ব'সে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে মেঘ-মল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ করলে সরস্বতী দেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবির্ভূতা হন। এ সংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবার যদি তাঁকে আনতে পারা যায়, তবে তাঁর বরে গায়ক সঙ্গীতে সিদ্ধ হয়। তাঁর বরে সঙ্গীত সংক্রান্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একটা কথা আছে, যে গায়ক বর প্রার্থনা করবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই। তা আমি বলছিলাম, সামনের পূর্ণিমায় তুমি আর আমি এই বিষয়টা চেষ্টা ক'রে দেখব, তুমি কি বল?

সুরদাসের কথা শুনে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গেল। তা কি ক'রে হয়? আচার্য্য বসুব্রত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অনেক বার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে মূর্ত্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা নিছক কল্পনাই, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্য সত্য তাঁকে দেখতে পাওয়া—একি সম্ভব?

প্রদ্যুম্ন চুপ ক'রে রইল।

সুরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—এতে কি তোমার অমত আছে?

প্রদ্যুম্ন বললে—সে জন্যে না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এটা কি ক'রে সম্ভব যে—

সুরদাস বললেন—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো। তোমার অমত না থাকলে আমি সাম্‌নের পূর্ণিমায় সব ব্যবস্থা ক'রে রাখি।

সুরদাসের কথার পর থেকেই প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতূহলে কেমন এক রকম হয়ে গিয়েছিল। সে ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা রাখবেন, আমি আসব।

সুরদাস বললেন—বেশ, বড় আনন্দিত হলাম। তুমি মাঝে মাঝে একবার ক'রে এখানে এস, তোমাকেও তৈরী হতে হ'লে দু-একটা কাজ করতে হবে, সে ব'লে দেব।

প্রদ্যুম্ন আর একবার সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়াবার পর সুরদাসের কাছে বিদায় চাইলে।

তারপর সে চিন্তিতভাবে বিহারের পথ ধরলে।

তার মনে হচ্ছিল—দেবী সরস্বতী স্বয়ং! শ্বেতপদ্মের মত নাকি রংটি তাঁর, না জানি কত সুন্দর তাঁর মুখশ্রী! আচার্য্য বসুব্রত বলেন বটে···

ভদ্রাবতী নদীর ধারে শাল-পিয়াল-তমাল বনে সে-বার ঘনঘোর বর্ষা নাম্‌ল। সারা আকাশ জুড়ে কোন্ বিরহিণী পুরসুন্দরীর অযত্নবিন্যস্ত মেঘ বরণ চুলের রাশ এলিয়ে দেওয়া, প্রাবৃট-রজনীর ঘনান্ধকার তার প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জ্জনতা, দূর বনের ঝোড়ো হাওয়ায় তার আকুল দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশ্রান্ত আঁখি-দুটির অশ্রুভারে ঝরঝর অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ, মেঘমেদুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎচমক তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক আশার মেঘদূত!

আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে প্রদ্যুম্ন সুরদাসের সঙ্গে নদীর মাঠে গেল। তারা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন মেঘ নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, চারিদিক তরল অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান ক'রে এসে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করলে। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রদ্যুম্ন বুঝতে পারলে তিনি একজন তান্ত্রিক। তাদের বিহারে একজন ভিক্ষু ছিলেন, তিনি যোগাচার্য্য পদ্মসম্ভবের শিষ্য। সেই ভিক্ষুর কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু সে শুনেছিল। সুরদাস

অনেকগুলা রক্তজবার মালা সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে পরলেন, কতকগুলো প্রদ্যুম্নকে পরতে বললেন। ছোট মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্‌তে দিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন। তাঁর পূজার আয়োজনে সাহায্য করতে করতে প্রদ্যুম্ন হাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখবার জন্যে তার মনে এত কৌতূহল হচ্ছিল যে, অন্ধকার রাতে একজন প্রায়-অপরিচিত তান্ত্রিকের সঙ্গে একা থাকবার ভয়ের দিকটা তার একেবারেই চোখে পড়ল না। অনেক রাত্রে হোম শেষ হোল।

সুরদাস বললেন—প্রদ্যুম্ন তুমি এবার তোমার কাজ আরম্ভ করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খুব সাবধান, তোমার কৃতিত্বের ওপর এর সাফল্য নির্ভর করছে।

তাঁর চোখের কেমন একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন প্রদ্যুম্নের ভাল লাগল না। তার পর সে ব'সে একমনে বাঁশীতে মেঘ-মল্লার আলাপ আরম্ভ করলে।

তখন আকাশ বাতাস নীরব। অন্ধকারে সাম্‌নের মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নেই। শাল-বনের ডাল পালায় বাতাস লেগে এক রকম অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। বড় মাঠের পারে শাল বনের কাছে দিক্‌চক্রবালের ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার শষ্পশয্যায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে। শুধু বিশ্রাম ছিল না ভদ্রাবতীর, সে কোন অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু গুঞ্জনে আনন্দ সঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে দিতে। হঠাৎ সাম্‌নের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে সারা মাঠটা তরল আলোকে প্লাবিত হয়ে গেল! প্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখলে—মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী! তাঁর নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্নবিন্যস্ত ভাবে তাঁর অপূর্ব্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর আয়ত নয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ্ম কোন স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা, তাঁর তুষার-ধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণ মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্দ্ধ লুক্কায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্যে মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটে উঠেছে…হাঁ, এই তো দেবী বাণী! এঁর বীণার মঙ্গল ঝঙ্কারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা সৃষ্টিমুখী হয়ে উঠছে, এঁর আশীর্ব্বাদে দিকে দিকে সত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এঁরই প্রাণের ভাণ্ডারে বিশ্বের সৌন্দর্য্য সম্ভার নিত্য অফুরন্ত রয়েছে, শাশ্বত এঁর মহিমা, অক্ষয় এঁর দান, চিরনূতন এঁর বাণী!

প্রদ্যুম্ন চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে দেবীর মূর্ত্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে গেল। জ্যোৎস্না আবার ম্লান হয়ে পড়ল, বাতাস আবার নিস্তেজ হয়ে বইতে লাগল।

অনেকক্ষণ প্রদ্যুম্নের কেমন একটা মোহের ভাব দূর হল না। সে যা দেখলে এ স্বপ্ন না সত্য? অবশেষে সুরদাসের কথায় তার চমক ভাঙল। সুরদাস বললে—আমার এখনও কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পার—কেমন, আমার কথা মিথ্যা নয় দেখলে ত?

সুরদাসের কথা কেমন অসংলগ্ন হতে লাগল, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রদ্যুম্ন দেখলে তাঁর চোখ দুটো যেন অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের দিকে রওনা হল, পূর্ণিমার চাঁদকে তখন মেঘে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। একটু একটু জ্যোৎস্না যা আছে, তা কেমন হল্‌দে রংএর; গ্রহণের সময় জ্যোৎস্নার এ রকম রং সে কয়েকবার দেখেছে।

মাঠ খুব বড়, পার হতে অনকটা সময় লাগল। তারপর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনটা আরম্ভ হল। খুব ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ডালপালা নিবিড় হয়ে জড়াজড়ি ক'রে আছে, মধ্যে অন্ধকারও খুব। পাছে রাত ভোর হয়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব দ্রুতপদে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে এক স্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথমে সে ভাবলে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে থাকবে, কিন্তু ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখে সে বুঝলে যে, সে আলো জ্যোৎস্নার আলোর মতন নয় বরং···কৌতূহল অত্যন্ত হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যে পিপ্পল গাছের সারির ফাঁক দিয়ে আলো আসছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একি! এঁকেই ত সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, এই সেই অপরূপ সুন্দরী নারী ত!

অদ্ভুত! সে দেখলে যাঁকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে সেই অপরূপ দ্যুতিশালিনী নারী বনের মধ্যে চারিধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জোনাকী পোকার হুল থেকে যেমন আলো বার হয় তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেম্‌নি একরকম স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে, অনেকদূর পর্য্যন্ত বন সে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর একটু নিকটে গিয়ে সে লক্ষ্য করলে, তার আয়ত চক্ষু দুটি অর্দ্ধ-নিমীলিত, যেন কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাতড়ে পার হবার পথ

খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তা না পেয়ে পিপ্পল গাছগুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছেন, তাঁর মুখশ্রী অত্যন্ত বিপন্নার মত!

প্রদ্যুম্নের হঠাৎ বড় ভয় হল। সে ভাবলে মাঠে সরস্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া ভৌতিক, এই নিশীথ রাত্রে শালের বনে নইলে একি কাণ্ড?

সে আর সেখানে মোটেই দাঁড়াল না। বন থেকে বার হয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে যখন সে বিহারের উদ্যানে এসে পৌঁছল, ম্লান চাঁদ তখন কুমাপশ্রেণীর পাহাড়ের পিছনে অস্ত যাচ্ছে।

ভোর রাত্রে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে সে স্বপ্ন দেখলে—ভদ্রাবতীর গভীর কালো জলের তলায় রাতের অন্ধকারে কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন; তিনি যতই উপরে উঠবার চেষ্টা পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাঁকে ততই বাধা দিচ্ছে, নদীর জলে তাঁর অঙ্গের জ্যোতিঃ ততই নিবে আসছে, অন্ধকার ততই তাঁর চারিপাশে গাঢ় হয়ে আসছে, নদীর মাছগুলো তাঁর কোমল পা দুখানি ঠুক্‌রে রক্তাক্ত ক'রে দিচ্ছে···ব্যথিতদেহা, বিপন্না বেপথুমতী দেবীর দুঃখ দেখে একটা বড় মাছ দাঁত বার ক'রে হিংস্র হাসি হাসছে, মাছটার মুখ গায়ক সুরদাসের মত!

প্রদ্যুম্ন ভোরে উঠেই আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধনের কাছে গিয়ে সুরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে গত রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে। আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধন বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মঠের ভিক্ষুদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি সব শুনে বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন—একথা আগে জানাওনি কেন?

—তিনি নিষেধ করেছিলেন। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা—

—বুঝেছি। তবে এখন বলতে এসেছ কেন?

—এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি কার যেন কি অনিষ্ট করেছি।

পূর্ণবর্দ্ধন একটুখানি কি ভাবলেন তার পর বললেন—এই রকম একটা কিছু ঘটবে তা আমি জানতাম। পদ্মসম্ভব আর তার কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন তান্ত্রিক শিষ্য দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ করতে বসেছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এরা না করতে পারে এমন কোনো কাজই নেই—আর আমি বেশ দেখছি প্রদ্যুম্ন

যে, তোমার এই অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়তাই তোমার সর্ব্বনাশের মূল হবে। তুমি কাল রাত্রে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ, তুমি দেবী সরস্বতীকে বন্দিনী করবার সহায়তা করেছ।

এবার প্রদ্যুম্নের বিস্মিত হবার পালা। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হল না। পূর্ণবর্দ্ধন বললেন—এই সব কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখবার জন্যই আমি বিহারের কোনও ছাত্রকে বিহারের বাইরে যাবার অনুমতি দিইনে, কিন্তু যাক্ তুমি ছেলেমানুষ, তোমারই বা দোষ কি? আচ্ছা, এই সুরদাসকে দেখতে কি রকম বল দেখি?'

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের আকৃতি বর্ণনা করলে।

পূর্ণবর্দ্ধন বললেন—আমি জানি। তুমি যাকে সুরদাস বলছ, তার নাম সুরদাসও নয় বা তার বাড়ী অবন্তীতেও নয়। সে হ'চ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্য। কার্য্যসিদ্ধির জন্যে তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে।

প্রদ্যুম্ন অধীরভাবে বলে উঠল কিন্তু আপনি যে বলেছেন—

পূর্ণবর্দ্ধন বললেন সে ইতিহাস বলছি শোন। নদীর ধারে যে সরস্বতী-মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে, ওটা হিন্দুদের একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রায় দু' শত বৎসর পূর্ব্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকৃত। তখন মন্দিরের খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রবাদ এই যে, সে গায়কটি মেঘ-মল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল যে, আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে তার আলাপে মুগ্ধা হ'য়ে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তার কাছে আবির্ভূতা হ'তেন। সেই থেকে ওই মন্দির এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হ'য়ে উঠে। সে গায়ক মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়কে মল্লার আলাপ করলেই দেবী যেন কোন্ টানে তার কাছে এসে পড়েন। এই গুণাঢ্য একবার অবন্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক সুরদাসের সঙ্গে ওই ঢিবিতে উপস্থিত ছিল। সুরদাস মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গানে নাকি সরস্বতী দেবী তাঁর সম্মুখে আভির্ভূতা হ'য়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। সুরদাস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরস্বতী দেবী তাঁকে সেই বরই দেন। তার পর দেবী যখন গুণাঢ্যকে বর প্রার্থনার কথা বলেন, তখন সে দেবীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকেই প্রার্থনা ক'রে বসে। সরস্বতী দেবী বলেছিলেন, তাঁকে পাওয়া নির্গুণের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢ্য হ'লেও কার্য্যতঃ তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা নেই যে তাঁকে পেতে পারে, কিন্তু সেজন্য অনেক জীবন

ধ'রে সাধনার প্রয়োজন। সরস্বতী দেবী অন্তর্হিতা হওয়ার পর মূর্খ গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায় আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবলে দেবীকে বন্দিনী করবার জন্যে উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে। আমি জানি সে এক সন্ন্যাসীর কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ নিত। সন্ন্যাসী কিছুদিন পরে তার তন্ত্রসাধনার হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে দূর করে দেন। এসব কথা এদেশের সকল প্রাচীন লোকেও জানেন। আমি অনেকদিন তারপর গুণাঢ্যের আর কোনও সংবাদ জানতাম না। ভেবেছিলাম সে এদেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে সে কৃতকার্য্য হয়েছে বোধ হয়। এতদিন ঐ উদ্দেশ্যেই সে কোথাও তন্ত্রসাধনা করছিল। যাক্ তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে আছে কি না, থাকে যদি আমায় সংবাদ দিও।

প্রদ্যুম্ন সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াল না। সে ছুটে গিয়ে বিহারের উদ্যানে পড়ল। তখন রোদ বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠার্থীদের সমবেত কণ্ঠের স্তোত্রগান তার কানে আসছিল ঃ—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
তেসং হেতুং তথাগতো আহ
তেসঞ্চ যে নিরোধো
এবং বাদী মহাসমনো।

যেতে যেতে সে দেখলে উদ্যানের এক প্রান্তে একটা বড় জামগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু বসুব্রত হরিণচর্ম্মের আসনে ব'সে বোধ হয় কি আঁকছেন, কিন্তু তাঁর মুখে অতৃপ্তি ও অসাফল্যের একটা চিহ্ন আঁকা।

প্রদ্যুম্ন যা ভেবেছিল তাই ঘটল। মন্দিরে গিয়ে সে দেখলে—সেখানে কেউ নেই, গুণাঢ্য তো নেইই, সেই আজীবক সন্ন্যাসী পর্য্যন্তও নেই। দু'একটা যবাগূ পানের ঘট, আগুন জ্বালাবার জন্যে সংগৃহীত কিছু শুক্‌নো কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিক ওদিক ছড়ান প'ড়ে আছে।

সেই দিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন কাউকে কিছু না ব'লে চুপি চুপি বিহার পরিত্যাগ করলে।

তার পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে।

বিহার পরিত্যাগ করবার পর প্রদ্যুম্ন একবার কেবল সুনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ

ক'রে বলেছিল, সে বিশেষ কোন কাজে বিদেশে যাচ্ছে, শীঘ্রই ফিরে আসবে। এই এক বৎসর সে কাঞ্চী, উত্তর কোশল ও মগধের সমস্ত স্থান খুঁজেছে, কোথাও গুণাঢ্যের সন্ধান পায়নি।

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতূহলজনক কথা তার কানে গিয়েছে।

মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজার আদেশমত ভগবান্ তথাগতের মূর্ত্তি তৈরী করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম ক'রে তিনি যে মূর্ত্তি গড়ে তুলেছেন, তার মুখশ্রী এমন রূঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে যে তা বুদ্ধের মূর্ত্তি কি মগধের দুর্দ্দান্ত দস্যু দমনকের মূর্ত্তি, তা সেদেশের লোক ঠিক বুঝতে পারছে না।

তক্ষশীলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্য্য মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নাকি এমন দুর্দ্দশা ঘটেছে যে তিনি আর সূত্রের অর্থ ক'রে উঠতে না পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের সুবন্ত প্রকরণ থেকে পড়তে আরম্ভ করেছেন।

মহাকোট্‌ঠী বিহারের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বসুব্রত "বুদ্ধ ও সুজাতা" নামক তাঁর চিত্রখানা বৎসরাবধি চেষ্টা করেও মনের মত ক'রে এঁকে উঠতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ওদিক একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি শাকুনশাস্ত্রের চর্চ্চায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

একদিন প্রদ্যুম্ন সন্ধান পেলে উরুবিল্ব গ্রামের কাছে একটা নির্জ্জন স্থানে একজন গো চিকিৎসক এসে বাস করছেন। তাঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সুরদাসের আকৃতির অনেকটা মিল হ'ল। তখনি সে গ্রামে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু গো চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে পারলে না।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে অবসন্ন অবস্থায় উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তের একটা বড় বট গাছের ছায়ায় সে বসেছে। সন্ধ্যা তখনও নামেনি, ঝিরঝিরে বাতাসে গাছের পাতাগুলো নাচছে, পাশে মাঠে পাকা শস্যের শীষগুলো সোনার মত চিক্‌মিক্ করছে, একটু দূরে একটা ডোবার মতো জলাশয়ে বিস্তর কুমুদ ফুল ফুটে আছে, অনেক বন্যহংস তার জলে খেলা করছে।

সাম্‌নে একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরণা। পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় ঝরণার জল খানিকটা আটুকে গিয়ে ওই ডোবার

মতো জলাশয়টা তৈরী করেছে। প্রদ্যুম্নের হঠাৎ চোখ পড়ল, পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘট কক্ষে এক স্ত্রীলোক নেমে আসছেন।

দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে গেল। ডোবার এদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখেই তার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল—এই ত! এই ত তিনি! ভদ্রাবতীর তীরের শালবনে ইনিই ত পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন, মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্নারাতে এঁকেই ত সে দেখেছিল—তবে তাঁর অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও আর নেই, পরণে অতি মলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এই তিনি। তার মধ্যে গোলমাল বেঁধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে সুরদাসের খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলে কি করবে তা সে ভাবেনি। কাজেই সে একরকম লুকিয়েই সেখান থেকে চ'লে এল।

রোজ রোজ সন্ধ্যায় প্রদ্যুম্ন এসে বটগাছটার তলায় বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের পথ বেয়ে নেমে আসেন আবার সন্ধ্যার সময় ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে চ'লে যান —সে রোজ ব'সে দেখে।

এই রকম কিছু দিন কেটে গেল। একদিন প্রদ্যুম্ন মাঠের গাছতলায় চুপ ক'রে ব'সে আছে, সেই সময়ে দেবী জলাশয়ে নাম্‌লেন। সেও কি ভেবে ডোবার এদিকের পাড়ের দিকে দাঁড়াল—দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে কুমুদ ফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত। একটা বড় ফুল জলাশয়ের এপারের দিকে এগিয়ে বেশী জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা সংগ্রহের জন্য খানিকটা বৃথা চেষ্টা করবার পর চোখ তুলে অপর পারে প্রদ্যুম্নকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন—তার পর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন—ফুলটা আমায় তুলে দেবে?

—দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।

—কি বলো?

—আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি।

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিলে। বললেন—আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন?—এপারে এস, থাক্‌গে ফুল।

প্রদ্যুম্ন জলে নেমে ফুলটা সংগ্রহ ক'রে ওপারে গেল।

দেবী বললেন তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার তলায় রোজ ব'সে থাক, না ?

প্রদ্যুম্ন তাঁর হাতে ফুলটা দিয়ে বললে—হাঁ, আমিও দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল আনতে আসেন।

দেবী হাসিমুখে বললেন ওই পাহাড়ের ওপরই আমাদের ঘর—এস তুমি আমার সঙ্গে—তোমায় খেতে দিইগে।

হঠাৎ দেবী যেন কেমন একপ্রকার বিহ্বল-চোখে চারিদিকে চাইলেন। তারপর পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রদ্যুম্ন পিছনে পিছনে চল্‌ল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে—একটু দূরে বুনো বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ছোট কুটীর। দেবী বন্ধ দুয়ার খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রদ্যুম্নকে বল্‌লেন—এস।

প্রদ্যুম্ন দেখলে কুটীরে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি এখানে একা থাকেন ?

দেবী বললেন—না। এক সন্ন্যাসী আমায় এখানে সঙ্গে ক'রে এনেছেন, তিনি কি করেন জানিনে, কিন্তু মাঝে মাঝে এখান থেকে চ'লে যান, পাঁচ ছ'দিন পরে আসেন। তুমি এখানে বসো।

দেবী মাটির ঘট পূর্ণ ক'রে তাকে যবাগূ পান করতে দিলেন, স্বাদ অমৃতের মতো, এমন সুস্বাদু যবাগূ সে পূর্ব্বে কখনো পান করেনি।

প্রদ্যুম্নের মনে হল যদি আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধনের কথা সত্য হয়, আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেছে তা ইন্দ্রজাল না হয় তবে এই ত দেবী সরস্বতী তার সাম্‌নে। তার জান্‌বার কৌতূহল হ'ল, ইনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন।

সে জিজ্ঞাসা করলে—আপনারা এর আগে কোথায় ছিলেন ? আপনার দেশ কোথা ?

দেবী কাঠের বড় পাত্রে সযত্নে স্থপ ও অন্ন পরিবেষণে ব্যস্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—আমার কথা বলছ ? আমার দেশ কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় প'ড়ে ছিলাম, সন্ন্যাসী আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন। সেই থেকে এখানেই আছি—তার আগে কোথায় ছিলাম তা' আমার মনে পড়ে না।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বাইরে সাঁঝের রক্তিম আকাশে যেখানে উরুবিল্ব

গ্রামের প্রান্তরে বনরেখার মাথায় সূর্য্য হেলে পড়েছেন, সেই দিকে চেয়ে রইলেন —চেয়ে চেয়ে কি মনে আন্‌বার চেষ্টা করলেন, বোধ হয় মনে এল না। হঠাৎ কি ভেবে তাঁর পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ দু'টি বেয়ে ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল ঝরে পড়ল।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তিনি প্রদ্যুম্নের সামনে অন্নে পূর্ণ কাঠের থালা রাখলেন। বললেন—খাবার জিনিস কিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে থাকো, আমি পদ্মের বীজ শুকিয়ে রেখেছি, তাই দিয়ে রাত্রে পায়স তৈরী ক'রে খেতে দেব। সকালে যেও।

প্রদ্যুম্নের চোখে জল আস্‌ছিল।...ওগো বিশ্বের আত্মবিস্মৃতা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, বিদিশার মহারাজের আর মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত রত্নভাণ্ডার তোমার পায়ের এক কণা ধূলারও যোগ্য নয়, সে-দেশের পথের ধূলো এমন কি পুণ্য করেছে মা, যে তুমি সেখানে প'ড়ে থাকতে যাবে?

খাওয়া শেষ হলে প্রদ্যুম্ন বিদায় চাইলে।

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে উঠল, বললেন—থাকো না কেন রাত্রে? আমি রাত্রে পায়স রেঁধে দেব।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—আপনার এখানে একা রাত্রে থাকতে ভয় করে না?

—খুব ভয় করে। ওই বেতের বনে অন্ধকারে কি যেন নড়ে, ভয়ে আমি দোর খুলতে পারিনে! ঘুম হয় না, সমস্ত রাত ব'সেই থাকি।

প্রদ্যুম্নের হাসি পেল, ভাবলে রাত্রে একা থাকতে ভয় করে ব'লে পায়সের লোভ দেখিয়ে দেবী তাকে সঙ্গে রাখতে চান। সে বললে,

—আচ্ছা রাত্রে থাকব।

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হল।

সমস্ত রাত সে কুটীরের বাইরে খোলা হাওয়ায় ব'সে কাটালে। দেবীও কাছে ব'সে রইলেন। বল্‌লেন—এমন জ্যোৎস্না, আমি কিন্তু ভয়ে বাইরে আস্‌তে পারিনে, ঘরের মধ্যে ব'সে রাত কাটাই।

দেবীর ব্যাপার দেখে প্রদ্যুম্ন অবাক হ'য়ে গিয়েছিল। হলেই বা মন্ত্রশক্তি, কিন্তু এতটা আত্মবিস্মৃত হওয়া, এ যে তার কল্পনার বাইরের জিনিস।

নানা গল্পে সমস্ত রাত কাটল, ভোর হ'লে সে বিদায় চাইলে।

দেবী ব'লে দিলেন—সন্ন্যাসী এলে একদিন আবার এস।

সেইদিন থেকে প্রতিরাত্রে সে দেবীর অলক্ষিতে পাহাড়ের নীচে ব'সে কুটীরের দিকে চেয়ে পাহারা রাখত। তার তরুণ বীর হৃদয় এক ভীরু নারীকে একা বনের মধ্যে ফেলে রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলেছিল।

দশ পনের দিন কেটে গেল।

এক-একদিন প্রদ্যুম্ন শুনত, দেবী অনেক রাতে একা গান করছেন—সে গান পৃথিবীর মানুষের গান নয়, সে গান প্রাণ-ধারায় আদিম ঝর্ণার গান, সৃষ্টি-মুখী নীহারিকাদের গান, অনন্ত আকাশে দিক্‌হারা কোন্ পথিক তারার গান।

একদিন দুপুর বেলা কে তাকে বললে—তুমি যে গো-বৈদ্যের কথা বলছিলে, তাকে এইমাত্র দেখে এলাম, পথের ধারে পুকুরে সে স্নান করছে।

শুনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে সে পুকুরের ধারে উপস্থিত হল। দেখলে সত্যই গুণাঢ্য পুকুরের ধারে বস্ত্রাদির পুঁটুলি নামিয়ে রেখে পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরে গুণাঢ্য বস্ত্র পরিবর্ত্তন ক'রে উপরে উঠে প্রদ্যুম্নকে দেখে কেমন যেন হ'য়ে গেলেন। বললেন—তুমি এখানে?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমি এখানে কেন তা বুঝতে পারেন নি?

গুণাঢ্য বললেন—তুমি এখন বলছ ব'লে নয় প্রদ্যুম্ন, আমি একাজ করবার পর যথেষ্ট অনুতপ্ত আছি। প্রতি রাত্রে ভয়ানক স্বপ্ন দেখি—কারা যেন বলছে, তুই যে কাজ করেছিস এর শাস্তি অনন্ত নরক। আমি এইজন্যেই আজ এক পক্ষের ওপর আমার গুরু সেই আজীবক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরই কাছে এ বশীকরণ মন্ত্র আমি শিক্ষা করি। এর এমনি শক্তি যে ইচ্ছা করলে আমি যাকে ইচ্ছা বাঁধতে পারি, কিন্তু আনতে পারিনে। মন্ত্রের বন্ধনের শক্তি থাকলেও আকর্ষণী শক্তি নেই। এইজন্য আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলুম, আমি নিজে সঙ্গীতের কিছুই জানিনে যে তা নয়, কিন্তু আমি জানতাম যে তুমি মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আসবেনই, এলে তারপর মন্ত্রে বাঁধব। এর আগে আমার বিশ্বাসই ছিল না যে, এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব। অনেকটা মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা করবার কৌতূহলেই আমি এ কাজ করি।

প্রদ্যুম্ন বললে—এখন?

গুণাঢ্য বললেন—এখন আমার গুরুর কাছ থেকেই আসছি। তিনি সব শুনে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, এটা পূর্ব্ব মন্ত্রের বিরোধী শক্তি সম্পন্ন। সেই

মন্ত্রপূত জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তিনি আবার মুক্ত হবেন বটে, কিন্তু তার কোনো উপায় নেই।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—উপায় নেই কেন?

—যে ছিটিয়ে দেবে, সে চিরকালের জন্য পাষাণ হ'য়ে যাবে। আমার পক্ষে দু'দিকই যখন সমান, তখন তাঁকে বন্দিনী রাখাই আমার ভালো। রাগ কোরো না প্রদ্যুম্ন, ভেবে দেখ, মৃত্যুর পর হয় ত পরজগৎ আছে কিন্তু পাষাণ হওয়ার পর? তা' আমি পারব না।

আত্মবিস্মৃতা বন্দিনী দেবীর চোখ দু'টির করুণ অসহায় দৃষ্টি প্রদ্যুম্নের মনে এল। যদি তা না হয় তা হ'লে তাঁকে যে চিরদিন বন্দিনী থাকতে হবে!

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে তরুণদের নির্ম্মল প্রাণে পৌঁছয়, আজও প্রদ্যুম্নের প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল। সে ভাবলে, একটা জীবন তুচ্ছ। তাঁর রাঙা পা-দু'খানিতে একটা কাঁটা ফুটলে তা তুলে দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন দিতে প্রস্তুত।

হঠাৎ গুণাঢ্যের দিকে চেয়ে সে বললে—চলুন আপনার সঙ্গে যাব। আমায় সে মন্ত্রপূত জল দেবেন।

গুণাঢ্য বিস্ময়ে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—বেশ ক'রে ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা নয়। এ কাজ—

প্রদ্যুম্ন বললে—চলুন আপনি।

তারা যখন কুটীরের নিকটবর্ত্তী হ'ল তখন গুণাঢ্য বললে—প্রদ্যুম্ন, আর একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখ, কোনো মিথ্যা আশায় ভুলো না, এ থেকে তোমায় উদ্ধার করবার ক্ষমতা কারুর হবে না—দেবীরও না। মন্ত্রবলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের জন্য জড় হ'য়ে যাবে; বেশ বুঝে দেখ। মন্ত্রশক্তি নির্ম্মম অমোঘ, কাউকে রেহাই দেবে না।

প্রদ্যুম্ন বললে—আপনি কি ভাবেন আমি কিছু গ্রাহ্য করি?—কিছু না, চলুন।

কুটীরে তারা যখন গিয়ে উপস্থিত হল তখন রোদ বেশ প'ড়ে এসেছে। দেবী কুটিরের বাইরে ঘাসের উপর অন্যমনস্কভাবে চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন—প্রদ্যুম্নকে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, হাসিমুখে বললেন—এস, এস। আমি তোমার কথা প্রায়ই ভাবি। তোমায় সেদিন কিছু খেতে

দিতে না পেরে আমার মন খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন তুমি এখানে কিছুদিন থাকো। তারপর তিনি দু'জনকে খেতে দেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে কুটীরের মধ্যে চ'লে গেলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে—কই আমায় সে মন্ত্রপূত জল দিন তবে?

গুণাঢ্য বললেন—সত্যই তা হ'লে তুমি এতে প্রস্তুত?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমায় আর কিছু বলবেন না, জল দিন।

দেবী কুটীরের মধ্যে আহারের স্থান ক'রে দু'জনকে খেতে দিলেন—আহারাদি যখন শেষ হ'ল, তখন সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নেই। বেতসবনে ছায়া নেমে আসছে, রাঙা সূর্য্য আবার উরুবিল্ব গ্রামের উপর ঝুলে পড়েছে।

গোধূলির আলোয় দেবীর মুখপদ্মে অপরূপ শ্রী ফুটে উঠল।

তারপর তিনি ঘট-কক্ষে প্রতিদিনের মত নীচের ঝরণায় জল আনতে নেমে গেলেন।

গুণাঢ্য বললেন—আমি এখান থেকে আগে চ'লে যাই, তার পর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে দিও।

তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। আবেগভরে তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—আমি কাপুরুষ, আমার সে সাহস নেই, নইলে—

তিনি কুটীর মধ্যে তাঁর দ্রব্যাদি সংগ্রহ ক'রে নিলেন। তারপর সরু পথ বেয়ে বেত বনের ধার দিয়ে পাহাড়ের অপর পারে চ'লে গেলেন, তারই নীচে একটু দূরে মগধ থেকে বিদিশা যাওয়ার রাজবর্ত্ম।

প্রদ্যুম্ন চারিদিক চেয়ে ব'সে ব'সে ভাবলে, ঐ নীল আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সে মায়ের কোলে জন্মেছিল, তার সে মা—বারাণসীতে তাদের গৃহটিতে ব'সে বাতায়ন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে হয়ত প্রবাসী পুত্রের কথাই ভাবছেন—মায়ের মুখখানি একবারটি শেষবারের জন্য দেখতে তার প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠল। ঐ পূব আকাশে নবমীর চাঁদ কেন উজ্জ্বল হ'য়েছে? মগধ যাবার রাজপথের গাছের সারির মাথায় একটা তারা ফুটে উঠল। বেত বনের বেতডাঁটাগুলো তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না।

প্রদ্যুম্নের চোখ হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হ'ল।

সেই সময় সে দেখলে—দেবী জল নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছেন। মন্ত্রপূত জলপূর্ণ ঘট সে মাটিতে নামিয়ে রেখেছিল; দেবীকে আসতে দেখে সে তা হাতে তুলে নিলে।

দেবী কুটীরের সামনে এলেন, তাঁর হাতে অনেকগুলো আধ ফোটা কুমুদ ফুল।

প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করলেন—সন্ন্যাসী কোথায়?

প্রদ্যুম্ন বললে—তিনি আবার কোথায় চ'লে গেলেন। আজ আর আসবেন না।

তারপর সে গিয়ে দেবীর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বললে—মা, না জেনে তোমার ওপর অত্যন্ত অন্যায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি আমাকে নিতে হবে। কিন্তু আমি তার জন্য এতটুকু দুঃখিত নই। যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হ'য়ে যায়, ততক্ষণ এই ভেবে আমার সুখ যে, বিশ্বের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে অন্যায় বাঁধন থেকে মুক্ত করার অধিকার আমি পেয়েছি।

দেবী বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে—শুনুন, আপনি বেশ ক'রে মনে ক'রে দেখুন দেখি আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন?

দেবী বললেন—কেন আমি ত বিদিশার পথের ধারে—

প্রদ্যুম্ন এক অঞ্জলি জল তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে।

সদ্যোনিদ্রোত্থিতার মত দেবী যেন চমকে উঠলেন……

প্রদ্যুম্ন দৃঢ় হস্তে আর-এক অঞ্জলি জল দেবীর সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলে। নিমেষের জন্যে তার চোখের সামনে বাতাসে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ প্রসন্ন হিল্লোল ব'য়ে গেল। তার সারা দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এল—বারাণসীতে তাদের গৃহে সন্ধ্যার আকাশে বদ্ধ আঁখি বাতায়ন পথবর্ত্তিনী তার মা!

কুমার শ্রেণীর বিহারে আচার্য্য শীলব্রতের কাছে একটি মেয়ে অল্প বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম সুনন্দা, সে হিরণ্যনগরের ধনবান্ শ্রেষ্ঠী স্যমন্তদাসের মেয়ে। পিতামাতার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মেয়েটি নাকি বিবাহ করতে সম্মত হয়নি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হ'য়ে উঠেছিল। সেখানে কিন্তু কারো সঙ্গে সে তেমন মিশত না, সর্ব্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর সর্ব্বদাই কেমন অন্যমনস্ক থাকত।

জ্যোৎস্নারাত্রে বিহারের নির্জ্জন পাষাণ অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন মনে

প্রায়ই কি ভাব্‌ত, মাঠের জ্যোৎস্নাজাল কাটিয়ে অনেক রাতে কাউকে বিহারের দিকে আসতে দেখলে সে এক দৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকত যেন কতদিন আগে তার প্রিয় আবার আসবে বলে চ'লে গিয়েছিল, তারই আসবার দিন গুণে গুণে এ শ্রান্ত শান্ত ধীর পথ চাওয়া···প্রতি সকালে সে কার প্রতীক্ষায় উন্মুখী হ'য়ে রইত, সকাল কেটে গেলে ভাবত বিকালে আসবে, বিকাল কেটে গেলে ভাবত সন্ধ্যায় আসবে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস· এরকম কত সকাল-সন্ধ্যা কেটে গেল—কেউ এল না···তবু মেয়েটি ভাবত, আসবে···আসবে, কাল আসবে ···পাতার শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখত—এতদিনে বুঝি এল ?

এক এক রাত্রে সে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত। কোথাকার যেন কোন্ এক পাহাড়ের ঘন বেতের জঙ্গল আর বাঁশের বনের মধ্যে লুকান এক অর্দ্ধ ভগ্ন পাষাণ মূর্ত্তি। নিঝুম রাতে সে পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় দুলছে, বাঁশবনে শির্‌শির্ শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতডাঁটার ছায়ায় পাষাণ মূর্ত্তিটার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। সে অন্ধকার অর্দ্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে কেবলই বাজছে মেঘ-মল্লার!···

ভোরে উঠে রাতের স্বপ্ন দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেত—কোথায় পাহাড়, কোথায় বেতবন, কার ভাঙা মূর্ত্তি, কিসের এসব অর্থহীন দুঃস্বপ্ন!···

পুঁই মাচা

সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন—একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকাল বেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙ্গুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমান তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি

ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন কি হয়েছে, ব'সে রইলে যে ?···দাও না একটা ঘটি ? আঃ, ক্ষেন্তি টেন্তি সব কোথায় গেল এরা ? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না ?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার ?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত স্বরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল—ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্ব্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরীয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আমতা আমৃতা করিয়া কহিলেন—কেন...কি আবার...কি...

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বাপেক্ষাও শান্তস্বরে বলিলেন—দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি—ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জান না, কি খোঁজ রাখ না ? অত বড় মেয়ে যার ঘরে সে মাছ ধ'রে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি ক'রে তা বলতে পার ? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান ?

সহায়হরি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন ?···কি গুজব ?

—কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ী। কেবল বাদ্গী দুলে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না।—সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ব্ববৎ স্বরেই পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিলেন—একঘরে করবে গো, তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্ব্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হল না—ও নাকি উচ্ছুগ্গু করা মেয়ে—গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না—যাও, ভালই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী, বাদ্গী-বাড়ী উঠে ব'সে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই ! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে ! সবাই একঘরে করেছেন এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর !—ওঃ !...

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন—কেন, তোমাকে একঘরে করতে

বেশী কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি?—আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল।···হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন—হল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?···পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন—না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?···

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কী দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন—কিন্তু খিড়কী দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দ-পূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—এসব কি রে? ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এযে···

চোদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁই শাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হল্‌দে, হল্‌দে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে—ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই তিন পাকা পুঁইপাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো—বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টা ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলা দু'পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকান। পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর হাত হইতে পুঁই পাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া বুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে—তোমার বাবার কাছে আর দিনকার দরুণ দু'টো পয়সা বাকী আছে, আমি বললাম—দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর এই পুঁই শাকগুলো ঘাটের ধারে রায় কাকা বললে, নিয়ে যা...কেমন মোটা মোটা...

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

নিয়ে যা, আহা কি অমর্ত্তই তোমাকে তারা দিয়েছে...পাকা পুঁইডাঁটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পরে ফেলে দিত...নিয়ে যা আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন—ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে কাটতে হল না...যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে...ধাড়ী মেয়ে, ব'লে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না, এ পাড়া সে পাড়া ক'রে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?...কোথায় শাক, কোথায় বেগুন, আর একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ—ফেল বলছি ওসব...ফেল্।...

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয় মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁই শাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন—যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো...ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো...

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কী অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।...সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন—তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে ব'লে...তুমি আবার...বরং...

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না—মেয়ে মানুষের আবার অত নোলা কিসের? একপাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁই শাক ভিক্ষে ক'রে? যা, যা...তুই যা, দূর ক'রে বনে দিয়ে আয়...

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস হোক, পুঁই শাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুর বেলা স্ত্রীকে

চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না—নিঃশব্দে খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।...

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল—গত অরন্ধনের পূর্ব্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল—মা, অর্দ্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্দ্ধেক সব মিলে তোমাদের ?···

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কী দোরের আশে পাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—বাকীগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপ চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারী রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু'এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁই শাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁই শাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই ? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন—সে সব দিন কি আর আছে ভায়া ? এই ধর, কেষ্ট মুখুয্যে···স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না, স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধ'রে প'ড়ে মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে! তারা কি স্বভাব ? রাম বল, ছ'সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রিয়! পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন—তা সমাজের সে সব শাসনের দিন কি আর আছে ? দিন দিন চ'লে যাচ্ছে। বেশী দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের···

সহায়হরি বাধা দিয়ে বলিতে গেলেন—এই শ্রাবণে তেরোয়···

—আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি ? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎটা কিসের ? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক,

চাই পঞ্চাশই হোক তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগ্গু করা মেয়ে। আশীর্ব্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত-পাকের যা বাকী, এই তো?...সমাজে ব'সে এ সব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি মনে ভেব না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল···পাত্তর পাত্তর, রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে না? গরীব মানুষ, দিতে থুতে পারবে না ব'লেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক ক'রে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলে? জজ মেজেষ্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্—রাজার হাল। দুই ভাইয়ের অভাব কি?...

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্য্যন্ত বাকী—শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি কয়েক মাস পূর্ব্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবী লেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল—বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল...

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন—যা শীগগির সাবলখানা নিয়ে আয় দিকি? কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক

টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটা লোহার সাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল—তৎপরে পিতাপুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল—ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার জোগাড় করিতেছেন—মুখুয্যে বাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল—খুড়ীমা, মা ব'লে দিলে খুড়ীমাকে গিয়ে বল্, মা ছোঁবে না তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে বাড়ী ও পাড়ায়—যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচাল্‌তা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ ঝোলা হল্‌দে পাখী আমড়া গাছের এ ডাল হইতে ও ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—খুড়ীমা খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখিটা! —পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণে খুপ্ খুপ্ করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল··· কে যেন কি খুঁড়িতেছে...দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহারা খানিকদূর যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই যে যাই, মা, এক্ষণি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ও পাড়ার ময়শা চৌকীদার রোজই বলে—কর্ত্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিক তোমাদের পায়ের

ধুলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আস না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু ক'রে রেখেছি তা দাদাঠাকুর বরং...

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বরোজপোতার বনের মধ্যে ব'সে খানিক আগে কি করছিলে শুনি ?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন—আমি! না আমি কখন্? কক্ষনো না, এই ত আমি···সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এই মাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না।···আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি···দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও পাড়ায় যাচ্ছি শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ্ খুপ্ শব্দ···তখনি আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদুর গেলাম আবার দেখি শব্দ···তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে যা ইচ্ছে হয় কর কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে ?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশী কথাও জোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।...

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—ক্ষেন্তি এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা···

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতঃস্ততঃ করিতে করিতে মার নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলে তুলে এনেছিস না ?

ক্ষেন্তি মার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশ ঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া

রইল ; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন—কথা বলছিস নে যে বড়? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কি না?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল—হাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিয়া বলিলেন—পাজী, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছে মেটে আলু চুরি করতে? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই এক গলা বিজন বন, তার মধ্যে দিন ত্বপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে? যদি গোঁসাইরা চৌকীদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব তা ব'লে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব, মা?

ত্ব'তিন দিন পরে একদিন বৈকালে, ধূলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল—মা মা, দেখবে এস···

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন ভাঙা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলা পাথরকুচি ও কণ্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারীর আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্ত্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি বদ্ধ হইয়া ফাঁসী হইয়া যাওয়া আসামীর মতন উর্দ্ধমুখে এক খণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাততঃ তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন দূর পাগলী, এখন পুঁইডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে ম'রে যাবে?

ক্ষেন্তি বলিল—কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখ, হয়ত বেঁচে যেতেও পারে। আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার ত্বই

ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে।…একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুয্যে বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন—হাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায় দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত?

—আচ্ছা দিচ্ছি বাবা, কই শীত, তেমন তো…

—হাঁ, দে মা, এক্ষুনি দে—অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে বুঝলি নে? —সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভাল করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?…

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিতরূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জ্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুণ জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্ত্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না—ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতেছিলেন—একটা ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনীর নীচে একটা কলার পাত পাড়িয়া এক থাল নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড় চোপড় শাস্ত্র-সম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্ত্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে লক্ষ্মী হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল—মা, ঐ একটু…

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু লক্ষ্মীর প্রসারিত

হাতের উপর দিলেন। মেজো মেয়ে পুঁটী অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মার সামনে পাতিয়া বলিল—মা, আমায় একটু···

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল থালাটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি।···ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের থালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশী করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজো মেয়ে পুঁটি বলিল—জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল—এ বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ওবেলা ব্রাহ্মণ নেমতন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও বেলা ত পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি, এই সব হয়েছে।

পুঁটী জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, ক্ষীর নৈলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেঁদী বলছিল, ক্ষীরের পূর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম, কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে!

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল—খেঁদির ওই সব কথা। খেঁদির মা তো ভারি পিঠে করে কিনা? ক্ষীরের পূর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হল? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা ধরা গন্ধ আর পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়!

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, নারকোল কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—নে, কিন্তু এখানে ব'সে খাস্ নে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐ দিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থাবা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে

লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণ স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন—ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি? গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল দেওয়া ভাত আছে ও বেলার, বার ক'রে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে খুব মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটী বলিল—মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই মেজো মেয়ে রাধা খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্ট খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে! সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো উনিশ খানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষেন্তি আর নিবি?...ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মার দিকে চাহিয়া বলিল—বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু...সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালমানুষ, কাজ-কর্ম্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশী কোনো মতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, সহর অঞ্চলে বাড়ী, সীলেট চূণ ও ইটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশী, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন—চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।...তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে ?...

যাইবার সময় ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল---মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো...বাবাকে পাঠিয়ে দিও... দু'টো মাস তো...

ওপাড়ার ঠানদিদি বলিলেন—তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক—তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল—না, যাবে না বৈ কি ?...দেখো তো কেমন না যান্।...

ফাল্গুন চৈত্র মাসের বৈকাল বেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হুহু করিত...তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাত্‌খানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে—মা, বল্‌ব একটা কথা, ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি ?...

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন—ও তুমি ধ'রে

রাখ, ও রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—নাঃ, সব তো আর···তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব।...তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ ছ'টি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন—বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকী ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

—একেবারে চামার···

—তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পূজোর তত্ত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কমে হবে না ভেবে দেখলাম কি না? মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে···ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খায়··· আরও কত কি। পৌষ মাসে দেখতে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?···

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের কোনো কথা শুনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু-সরকার বলিলেন—তারপর?

—আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনে শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে!···পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বলি আমরা ছোট লোক কি বড় লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকী নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে—আজই না হয় আমি প্রাচীন···আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থন সূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বার কতক ঘাড় নাড়িলেন।

—তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হল। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পূজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল—তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে···

—দেখতে পাওনি?

—নাঃ! এমনি চামার—গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে।···যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলা গেল।··· চার কি ঠিক করলে?···পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধা হবে না।···

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্ব্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাকলি পিঠের জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটী ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে—আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন ক'রে ফেললে কেন?

পুঁটী বলিল—আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

—ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধরে উঠবে···

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—স'রে এসে বোস মা, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল···খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন···দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।···

পুঁটী বলিল—মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কাঁনাচে ষাঁড়া ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—একা যাস নে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে।···

পুঁটী ও রাধী খিড়কী-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্

শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটী পিঠেখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জ্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কী-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।···

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—দিলি?

পুঁটী বলিল—হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম···

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে···রাতও তখন খুব বেশী।···জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাটঠোকরা পাখি ঠক্ র্ র্ র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে···দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাব হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালবাসত···

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিন জনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল···সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে···বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে··· সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!···